যাতায়াতের পথের ধারে

শ্রীপদাতিক

নবজাতক প্রকাশন
৬, এ্যাণ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৯।

প্রথম-প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৯

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
৬, এ্যান্টনি বাগান লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর
নির্মল সরকার
নিও প্রিণ্টার্স
৭৬ বৌবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদপট
খালেদ চৌধুরী

অলংকরণ
বাণীকুমার মজুমদার
মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়
রেবতীভূষণ ঘোষ

একমাত্র পরিবেশক
বুকস্ এ্যাণ্ড বুকস্
৪০/১ মহাত্মা গান্ধী
কলিকাতা ৯

ভূমিকা

'যাতায়াতের পথের ধারে'র লেখকের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল একটি মফঃস্বল শহরে। তখন আমি স্থানীয় কলেজের তরুণতম অধ্যাপক এবং তিনি স্কুলের ছাত্র-রূপে শহরের কিশোরতম কবি। যতদূর মনে পড়ে একটি কবিতা প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই এই পরিচয় ঘটে এবং তখনই তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক কাব্যশক্তির সূচনা দেখেছিলাম।

তারপর সুদীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে। সেদিনের কিশোর আজকের বাংলা সাহিত্যে কবি হিসেবে সুপরিচয়ের অধিকারী। রম্য-সাংবাদিকতায়ও তিনি যে কুশলী, তাঁর 'শ্রীপদাতিক' ছদ্ম-নামাঙ্কিত এই বইখানিই তার প্রমাণ। এই লেখক হলেন শক্তিমান কবি ও প্রতিভাধর আবৃত্তিকার শ্রীমান আবুল কাশেম রহিমউদ্‌দীন।

'যাতায়াতের পথের ধারে'র রচনাগুলি দীর্ঘ দু'বছর ধরে 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে পাঠক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল; এই লেখাগুলির নেপথ্যে শ্রীমান রহিমউদ্‌দীনের শ্রম, সততা এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বিস্ময়কর। এদের সব চাইতে বড়ো বিশেষত্ব হলো, আপাত দৃষ্টিতে এরা স্কেচ্‌ জাতীয় বা গল্প-প্রতিম মনে হলেও এদের প্রত্যেকটি সত্যের উপর

আশ্রিত—কোনো কাল্পনিকতার সুযোগ লেখক গ্রহণ করেন নি। লেখকের নিজের কথায়ঃ 'কলকাতার পথঘাট, পার্ক, কবরস্থান, নদীর ধার, বস্তি, সম্ভ্রান্ত বসতি, কলতলা ইত্যাদি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ভীড় লক্ষ্য করে ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, অনুসরণ করতে হয়েছে বিশেষ বিশেষ চরিত্রের লোককে। পথের কোনো অসহায় ব্যক্তি, এবং অপরিণত বয়সের নিরাশ্রয় কোনো ছেলে বা মেয়ের ইতিহাস জানতে হয়েছে। কলকাতার সর্বত্র, সর্ব পর্যায়ের নরনারীর নির্বিকার কথাবার্তা শুনতে হয়েছে ছদ্মবেশে। তা ছাড়া কোনো দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তি এবং কোনো 'অস্বাভাবিক চরিত্রের নারী অথবা পুরুষের আগের ও পরের জীবন বৃত্তান্ত জানতে হয়েছে অন্যের মাধ্যমে।'

বইখানি রচনার নেপথ্যে লেখকের নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমের পরিমাপ এই থেকেই করা যাবে। তাঁর এই প্রয়াস বৃথা হয় নি। বিরাট কলকাতার বিচিত্র জীবন-মর্মর এই বইয়ের পাতায় পাতায় শুনতে পাওয়া যাবে। তাঁর অধ্যবসায় এবং সন্ধিৎসা বিদেশী ঔপন্যাসিকদের নোট বুকের কথা স্মরণ করায়—যেমন ডিকেন্সের, জোলার, সমারসেট মমের।

শ্রীমান রহিমউদ্দীন উপন্যাস লেখেন নি—তাঁর ভূমিকা রিপোর্টারের। সে-কাজে তাঁর সাফল্য কতটা অর্জিত হয়েছে সে-বিচার বাংলা দেশের পাঠকেরাই করবেন। কিন্তু এই লেখাগুলি পড়তে পড়তে তাঁর মানবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনমমতা এবং সর্বাত্মক শুভবোধের উজ্জ্বল পরিচয় নিঃসন্দেহে লাভ

করা যাবে। তাঁর কবিতার বিশিষ্ট সুরটি এই রচনাগুলিতেও অনুপস্থিত নয়।

এই বইয়ের লেখক কখনো উপন্যাস লিখবেন কি না জানি না। যদি কখনো সে-কাজে তিনি হাত দেন, তাহলে আজকের এই শ্রমনিষ্ঠা এবং অভিজ্ঞতার আকৃতি সেদিন তাঁর প্রধান পাথেয় হয়ে দাঁড়াবে।

সুমুদ্রিত ও সচিত্র এই নগর-কথাগুলি আদৃত হোক, এই আমার ঐকান্তিক কামনা। ব্যক্তিগতভাবে লেখক আমার পরম প্রীতিভাজন, তাঁর সাফল্য কামনায় আমি সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ জানালাম।

২২শে বৈশাখ '৬৯ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৯০।১, বৈঠকখানা রোড,

কলিকাতা-৯।

প্রতীক

অতি ব্যস্ত মৌলালীর মোড়। পাঁচ রাস্তা যেন পঞ্চনদীর মুখ। কেবল ঢেউ আর ঢেউ। এ-ঢেউ মানুষের। ওদিকে লাল গীর্জাটার সামনের উঠোনে যেমন ধর্মবিশ্বাসীদের বিচিত্র বাহার, তেমনই এদিকে প্রাচীন দরগাটার আশেপাশে মাহাত্ম্য-বিশ্বাসীদের মেলা—যেন ছেলেখেলাই ভাবছে বিজ্ঞানের যুগটাকে। সমস্ত অংশেই নানান জাতের দোকান, দোকানে দোকানে অজস্র মনের ঘোলা ঢেউ। যেন স্বস্তি নেই, শান্তি নেই, বিরাম নেই। অবিরাম শব্দে স্পন্দমান সমস্ত মোড়টা। যেন সব মিলিয়ে বিরাজ করছে একটা খাই-খাই পরিবেশ।......

তবু এখানেই অর্থাৎ এ-মোড়টার উত্তর-পূর্ব কোণের যে-সামান্য অংশটুকু অনেককাল থেকেই সংস্কারহীন—ঠিক সেখানেই বিজ্ঞের মত মাথা তুলেছে একটি শিশু-বট। বয়স তার বেশি নয়। অথচ এর মধ্যেই ডাল-পালা ছড়িয়ে ছায়া বিস্তার করেছে মাটিতে। যেন অবিরাম বিশৃঙ্খলার মধ্যে আরামের একটু শৃঙ্খলা, নিরস গদ্যের ভীড়ে কবিতার একটি রসঘন পঙ্‌ক্তি। তাই অকারণে অনেকেই এখানে আসে এবং অনেকের মতো আমারও মনে পুলক সঞ্চার করে কচি-বটটার এ-ছায়াটুকু। তাই মাঝে মাঝে আমিও এখানে আসি। নিয়মিত না হলেও, প্রায় এসে দাঁড়িয়ে থাকি অকারণে। আমি ভাবুক নই, কবি নই, বাউল বা দার্শনিকও নই। তবু আসি। হয়তো নেশার ঘোরেই আসতে হয় কিংবা আসতে ভালো লাগে। অথবা নেশা বা ভালো লাগা—কোনোটাই সত্য নয়। আসতে হয় কেবল আসার টানেই, টানটা হয়তো খেয়ালের।

এমনই এক খেয়ালের বশে সেদিনও এসেছিলাম। সূর্যটা তখন গড়াতে গড়াতে মাঝপথে এসে দাঁড়িয়েছে। সামনেই চিং হ[illegible]

শুয়ে আছে সার্কুলার রোডের প্রশস্ত দেহ। এ-দেহে মনুষ্য পায়ের অশান্ত দাপাদাপি খানিকটা কমে গেলেও, ট্রাম-বাসের উচ্ছৃঙ্খল ছুটোছুটি থামেনি। তাই দুপুর হলেও, পরিবেশ তেমন নিরিবিলি

নয়। পাশেই নতুন রাস্তার ওপর নজরে পড়ে দৈত্যরূপ বাড়ীটা। এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। দিনের পর দিন কেবল মাথাই তুলছে ওপরে? আকাশ কাছে নয়, তবু আকাশকে কাছে পাওয়ার নেশা তাকে যেন পেয়ে বসেছে। সেদিকে তাকিয়েই কী যেন ভাবছিলাম। হঠাৎ কচি-বটের একটি শাখা নাচিয়ে দিয়ে দক্ষিণ দিকে উড়ে গেল একটা পাখি। অকারণেই তার গতিপথ লক্ষ্য করতে গিয়ে কিছু-দূরেই দেখতে পেলাম এক বৃদ্ধকে। লাঠিতে ভর দিয়ে তিনি এগিয়ে আসছেন ধীরে ধীরে। তাঁর দিকে তাকিয়ে মনে হলো এককালে তাঁর দেহের গঠন ছিল মজবুত। কিন্তু আজ যেন ভেঙে পড়েছে বয়সের ভারে। দারুণ স্রোতের বিপরীত দিকে যেমন অতিকষ্টে এগিয়ে চলে মালবাহী নৌকো, ঠিক তেমনই, ছেঁড়া চটির দাঁড় ঠেলতে ঠেলতে তিনি ক্রমশঃই এগিয়ে এলেন। যেন উজিয়ে এসে তাঁর মন্থরগতি দেহটা সাময়িক নোঙর তুললো আমারই পাশে, গাছতলায়। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে ধুতি, গায়ে ঢিলা পাঞ্জাবী খদ্দরের এবং গলায় জড়ানো মলিন মুগার চাদর। তাঁর সবকিছুর মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নিদারুণ দীনতা! অথচ কোটরাগত চোখেও দৃঢ়তার শপথ যেন জ্বলছে। গাছতলায় দাঁড়িয়ে আপনমনেই খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে, পা ছড়িয়েই ব'সে পড়লেন মাটিতে। আমি কতক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম জানি না। চমক ভাঙলো তখন, যখন তিনিই আমাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন:

—"বলতে পার বাবা, এখান থেকে পাইকপাড়া আর কতদূর?"

—"পাইকপাড়া? সে তো অনেকদূর—প্রায় মাইলচারেক।"

—"যেতে কত সময় লাগতে পারে ?"

—"সময় বেশি লাগবে না। এখানে ৩৩নং বাসে উঠলে মিনিট পনেরোর মধ্যেই পৌঁছে যাবেন!"......

...আমার এ-কথায় তিনি খানিকটা নির্বিকার হাসলেন এবং উদাস দু'টো চোখ তুলে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন শিশু-বটটার সবুজ পত্রগুচ্ছের দিকে। তারপর একসময় আবার বললেন ঃ

—"বাসে গেলে সময় বেশি লাগবে না—তা' জানি। কিন্তু আমি হেঁটে যাবো। হেঁটে যেতে কতক্ষণ লাগবে ?"

—"হেঁটে যাবেন ? বলেন কি ? সে তো অনেক সময় লাগবে। ট্রাম-বাসের সুবিধে থাকতে অযথা হেঁটে যাবেন কেন ? তাছাড়া এ-বয়সে এত পথ হাঁটা কি সম্ভব ?"

আমার এ-কথার উত্তর তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দিলেন ঃ

—"বাবা, আমি গাঁয়ের শিক্ষক ছিলাম। এক গাঁ থেকে আরেক গাঁয়ের স্কুলে আমাকে রোজ হেঁটে হেঁটেই যাতায়াত করতে হতো। হাঁটতে ভালোবাসি। তাছাড়া এতক্ষণ তো হেঁটেই এলাম।"

—"আপনি কতদূর থেকে হেঁটে আসছেন ?"

—"ঢাকুরিয়া থেকে।"

—"বলেন কি! ঢাকুরিয়া থেকে এতদূর পর্যন্ত হেঁটে এলেন, আবার এখান থেকে পাইকপাড়া পর্যন্ত হেঁটেই যাবেন ?"

—"হ্যাঁ। আবার পাইকপাড়া থেকে হেঁটেই ফিরবো।"

—"এ-বয়স কি আপনাকে এত শক্তি দেয় ?"

—"না দিলেও, তা আদায় করে নিতে হয়। জীবন তো কাজের জন্যেই। দেহ না চললেও তা' করতে হয়—যদি অন্য উপায় না থাকে।"

—"পাইকপাড়া আপনি কেন যাচ্ছেন ?"

—"এক ভদ্রলোক তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্য একজন প্রাইভেট টিউটর চান—কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। আমি যাচ্ছি তারই খোঁজ নিতে।"

—"আপনার এ-বয়স তো বিশ্রামের। টিউশনী করবেন কেন?"

—"না করলে সংসার চলবে কি ক'রে?"

—"আপনার ছেলেরা কেউ চাকুরী করে না?"

—"ছেলে?…হ্যাঁ, একজন ছিল। কিন্তু সে আমার আগেই চলে গেছে পৃথিবী ছেড়ে। যাওয়ার সময় তার বয়স হয়েছিল পনেরো। হয়তো পনেরো বৎসরের মেয়াদ নিয়েই সে এসেছিল। বর্তমানে সংসারের পুরুষ বলতে আমি একা। অবশ্য সংসার আমার বড়ো নয়। আমি, আমার স্ত্রী, আর আইবুড়ো দুটো মেয়ে—এ নিয়েই সংসার। আজকাল মেয়েরাও সেলাইয়ের কাজ ক'রে ত্রিশ-চল্লিশ টাকার মতো রোজগার করে। গাঁয়ের বাড়ী এবং আগেকার দিন হলে হয়তো এতেই কোনোমতে চলে যেতো। কিন্তু আজকাল এবং বিশেষ ক'রে কলকাতার বাজারে তা' দিয়ে চলে না। তাই আমাকেও কিছু না কিছু করতে হয়।"

—"আপনি অন্য আর কি কাজ করেন?"

—"কিছুই না। কাজ করার শক্তি এবং উৎসাহ আমার আজও আছে। কিন্তু কাজ পাই না। কলকাতার বিভিন্ন স্কুল-কর্তৃপক্ষের কাছে প্রত্যহই যাতায়াত করি। কিন্তু কেউই আমাকে শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী নন। তাঁরা বলেন: আমার বয়স বেড়েছে। এ-বয়সে নাকি উৎসাহ নিয়ে ছাত্র পড়াতে পারবো না। তাঁদের মতে তাঁরা হয়তো সত্য কথাই বলেন। তাই দুঃখ করি না। ঢাকুরিয়ার একটি ছেলেকে পড়িয়ে মাসে

টাকা পনেরো পাই ; পাইকপাড়ার এ-টিউশনীটি পেলে মাসে আরও প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ টাকার মতো পাবো। এতেই আমাদের চলে যাবে।”

এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এবার যেন একটু ঝিমিয়ে পড়লেন তিনি। কেন তাঁকে এত প্রশ্ন করলাম, কে আমি প্রশ্ন করার—এ ভেবে নিজের মনেই একটা ধিক্কার এলো এবং লজ্জাও পেলাম যথেষ্ট। আমার সামনে ব'সে আছেন বিংশশতাব্দীর এক বৃদ্ধ। জীবন তাঁর দুঃসহ। অথচ এ-দুঃসহতাকে তিনি মনে করছেন স্বাভাবিক। তাঁর রোজগার বলতে ছেলে-পড়ানোর পনেরোটি টাকা, আর তাঁর মেয়েরা সেলাইয়ের কাজ ক'রে পায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ। সব মিলিয়ে মাসের শেষে পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন মাত্র। এ দিয়েই চলে অনিশ্চিত সংসার। হয়তো চলেই না আদৌ। তাই একটা টিউশনীর খবর পেয়ে ঢাকুরিয়া থেকে তিনি হেঁটেই চলেছেন পাইকপাড়া। আবার হেঁটেই তাঁকে ফিরতে হবে। হয়তো ট্রাম-বাসের সামান্য ভাড়াটাও তাঁর পকেটে নেই, হয়তো কোনোদিন থাকেও না। তাই তাঁকে হাঁটতে হচ্ছে মাইলের পর মাইল। অথচ এজন্য তাঁর দুঃখ নেই, ক্লান্তি নেই, কিংবা থাকলেও তা স্বীকার না ক'রে অম্লান বদনেই বলছেন : হাঁটতে তিনি ভালোবাসেন, হাঁটার তাঁর অভ্যেস আছে।

তাঁর ঝিমিয়ে পড়া দেহটার দিকে তাকিয়ে আছি অপলক নেত্রে। মনে-প্রাণে অনুভব করছি একটা অপরিসীম বেদনা। অথচ বিংশশতাব্দীর এই ঋষিকে সহানুভূতি নিবেদন করার শক্তি থাকলেও, সৎসাহস আমার নেই। যিনি জীবনের কোনো

প্রতিবন্ধক মানেন না, স্বীকার করেন না কঠিন কোনো যন্ত্রনাকে ; অনিশ্চিত একটা টিউশনীর খোঁজে যিনি অথর্ব দেহটাকে টেনে টেনে ঢাকুরিয়া থেকে হেঁটেই চলেছেন পাইকপাড়া—তিনি আজও নিজের ওপরই নির্ভরশীল। অপরের দয়াদাক্ষিণ্যের প্রত্যাশী তিনি নন। হয়তো তাঁর পক্ষে তা অপমানকর। তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কিছু বলতে পারলাম না, পারলাম না নিবেদন করতে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার সামান্য সহানুভূতি। কেবল তাকিয়েই রইলাম নীরবে।

কিছুক্ষণ পর ঝিমানো ভাবটা ঝেড়ে ফেলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং আবার যাত্রা স্বুরু করার আগে একবার বললেন :

—"এখানে এক গ্লাস জল কোথাও পাওয়া যাবে ?"

—"জল ? হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই নিয়ে আসছি।"

—এই ব'লে সার্কুলার রোডের অপর পারের একটা রেস্তোরাঁয় ছুটে গিয়ে, কিছুক্ষণ পর এক গ্লাস জল এনে তাঁর হাতে দিলাম। তিনি জলের গ্লাসটা হাতে নিয়েই চুমুক দিলেন। কিন্তু অনেক পথ হেঁটে হেঁটে গলা তাঁর শুকিয়ে এসেছিল ব'লে প্রথম ঢোক গিলতেই বেশ একটু কষ্ট হলো তাঁর। তাই খানিকক্ষণ থেমে একটু জিরিয়ে নিলেন। তারপর আবার গ্লাসটা মুখের কাছে এনে প্রায় এক নিঃশ্বাসেই সব জলটুকু নিঃশেষ ক'রে বেশ একটু জোরে জোরেই হাঁপাতে লাগলেন। তাঁর পরিচ্ছদ, এমন কি পরিচ্ছদের আড়ালে দেহের চামড়ার আবরণ পর্যন্ত ভেদ ক'রে আমি যেন দেখতে পেলাম : তাঁর হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন। এ-স্পন্দন যেন তাঁর বা তাঁর হৃৎপিণ্ডের নয় ; যেন পৃথিবীর জটিল ও

কুটিল পথ অতিক্রম করতে করতে একসময় হঠাৎ থেমে, কী এক অস্থির জিজ্ঞাসা নিয়ে তুলছে বিংশশতাব্দীর ক্লান্ত সভ্যতা।

খালি গ্লাসটা ফেরৎ নিয়ে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বললাম : "এক কাপ চা খাবেন ?"

—"চা ? না না, চা আমি খাইনা। অভ্যেস নেই। তোমরা শহরের ছেলে খুব চা খাও, তাই না ? বেশি চা খাওয়া ভালো নয়। যদি পার, চা খাওয়া কমিয়ে ফেলো। তাহলে অনেক এনার্জি পাবে, উৎসাহ পাবে এবং পরিশ্রমও করতে পারবে অনেক বয়স পর্যন্ত।"

এই ব'লে তিনি সস্নেহে হাত রাখলেন আমার পিঠে। তারপর অনেক বেলা হলো দেখে, তিনি রাস্তায় নেমে এসে ধীরে ধীরে পা বাড়ালেন উত্তরদিকে, অর্থাৎ পাইকপাড়ার দিকে। তাঁর এভাবে চলে যাওয়া-কে আমি যেন ঠিক সহ্য করতে পারলাম না। তাঁকে একটু সাহায্য করার জন্য অস্থির হয়ে উঠলো আমার সমস্ত মন। পাইকপাড়া যাওয়ার বাসভাড়াটাও যদি কোনোমতে তাঁকে দিতে পারি, তাহলে অন্ততঃ এ-পথটুকু তিনি শান্তিতে না হোক, নিরাপদে যেতে পারবেন। অন্ততঃ হাঁটতে হবে না। তাই পেছন পেছন ছুটে এসে বললাম : "শুনুন" !

তিনি পেছন ফিরে দাঁড়িয়েই বললেন : "কিছু বলবে ?"

কী মধুর তাঁর কণ্ঠস্বর ! এ-কণ্ঠে স্নেহ আছে, ভালোবাসা আছে এবং আছে অশেষ মমতা। কিন্তু লেশমাত্র দুর্বলতা নেই। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে দেহ, অথচ কোটরাগত চোখেও জ্বলছে হার না মানার শপথ। এ-শপথ যেন আমার সাহায্য করার অবুঝ অভিলাষকে বিদ্রুপ ক'রে উঠলো তীব্রভাবে। তাই যে-জন্য

ডাকলাম---তা' আর বলা হলো না। কথা ঘুরিয়ে বলতে হলো ঃ

—"আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে বড়ো ভাল লাগলো। যদি আবার কোনোদিন আপনার সান্নিধ্যে আসতে পারি"...

তিনি আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন ঃ "বেশতো, যেদিন ইচ্ছে তুমি আমার বাসায় এসো। আমিও খুশী হবো

তোমাকে পেলে।” —এই ব’লে ঢাকুরিয়ার একটা ঠিকানা তিনি আমাকে লিখে দিলেন। তারপর আবার পা বাড়ালেন উত্তরমুখো হয়ে। যেন দক্ষিণায়ণের সূর্যটাকে পেছনে ফেলে নূতন জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চললো বিংশশতাব্দীর সেই ক্লান্ত সভ্যতা—যা’ আজও অবিকৃত এবং অপরাজিত। সেইদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শ্রদ্ধাবনত আমি, আমি আবার ফিরে এলাম শিশু-বটের ছায়ায়।

বুড়ো এবং কবরের কাহিনী

ঘাসবাগানের ঘাস মাড়িয়ে, এককালে মাথা তুলেছিল টিন, খোলা ও টালির বস্তি। আজ আবার বস্তি মাড়িয়ে মাথা তুলছে ইঁটের কোঠা। সম্ভ্রান্ত মহলের পদার্পণে রূপ পাল্‌টাচ্ছে ঘাসবাগানের। দিনে দিনে এই সমস্ত অংশেই আত্মপ্রকাশ করছে একটা সুস্থ পরিবর্তন।

…কেবল পরিবর্তন সেই পূর্ব- প্রান্তের সেই অংশটুকুতে— যেখানে আজও জেগে আছে অনেক কালের সেই কবরটা। কবরটার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। সেদিনই এর চারপাশে গেঁথে দেয়া হয়েছিল ইঁটের দেয়াল এবং ঠিক মধ্য-অংশে রোপণ করা হয়েছিল একটি চারাগাছ। আজ পঞ্চাশ বছর পরেও ইঁটের দেয়ালগুলো তেমনই রয়েছে। কেবল চারাগাছটা তার কৈশোর, যৌবন, এমন কি প্রৌঢ়ত্বও অতিক্রম ক'রে বার্ধক্যে এসে দাঁড়িয়েছে। আকাশের অনেক ঊর্ধ্বে হাওয়ায় দোল খায় তার অজস্র শাখা। শাখায় শাখায়, পাতার আড়ালে ব'সে গান গায় শহুরে পাখি। পাখির গানে গানে দিনমান মুখর হয়ে থাকে নির্জন কবরটা।

যখন নিঃশব্দে নেমে আসে সন্ধ্যা, কবরের জীর্ণ দেয়ালগুলো হারিয়ে যায় আবছা অন্ধকারে, থেমে যায় পাখির গান, ঠিক তখনই রেল-লাইনের ওপার থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে একটা সত্তর বছরের বুড়ো। সে এসে কবরটার পাশে দাঁড়ায় এবং দুটো মোমের বাতি জ্বেলে স্থাপন করে কবরটার উত্তর-দেয়ালের মাথায়। তারপর ধ্যানস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

এ-বুড়োকে এ-পাড়ার প্রতিটি লোক চেনে। কেবল যে বুড়োকেই চেনে তা নয়, পঞ্চাশ বছরের ওই কবরটারও ইতিহাস জানে সবাই। বিশেষ ক'রে এ-পাড়ার প্রবীণ ব্যক্তিরা এই বুড়ো

এবং কবরের যে-ইতিহাস বর্ণনা করেন—তার মধ্যে এতটুকুও অতিরঞ্জন নেই। এ-ইতিহাস যে আগা-গোড়াই সত্য এবং বাস্তব—পাড়ার মধ্যেই তার প্রমাণ রয়েছে যথেষ্ট :

আজ থেকে প্রায় অনেক, অনেক বৎসর আগে এই ঘাস-বাগান ছিল ঘাসের এলাকা। এত বাড়ী-ঘর বা ঘন বস্তির সমাবেশ সেদিন ছিল না। কেবল ঘাসের লোভেই সমগ্র অঞ্চল জুড়ে চ'ড়ে বেড়াতো অজস্র গোরু-মহিষ। সম্ভবতঃ এই গোরু-মহিষ প্রতিপালন করায় সুবিধে ছিল বলেই ঘাস-বাগানের কোনো কোনো অংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গুটিকয় সুবৃহৎ খাটাল।

সেকালে এ-অঞ্চলের এমন একটা খাটালেরই মালিক ছিল ওয়াজেদ মুন্সী নামে একজন লোক। দিনে দিনে দুধের ব্যবসা করেই সে বেশ ফেঁপে ওঠে এবং খাটালের পাশেই আরও জমি কিনে সে গ'ড়ে তোলে একটা বস্তি। তারপর বস্তির একাংশ সে নিজেই বসবাস করার জন্য বেছে নেয় এবং অপর অংশগুলোয় ভাড়াটে বসায়। দিনের পর দিন এভাবেই দুধের সঙ্গে বস্তি-ভাড়ার ব্যবসা ক'রেও সে উপার্জন করে অজস্র টাকা। অথচ দুঃখের বিষয়, সে ছিল নিঃসন্তান। তার মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হবে—এ-চিন্তাই তাকে পীড়া দিতো সর্বক্ষণ। তাই তার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর বৃদ্ধ বয়সে আবার এক যৌবনবতী নারীকে সে বিয়ে করে কেবল সন্তানের লোভেই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। আল্লার কাছে সে বারবার প্রার্থনা করে, পীরের দরগায় শিন্নী মানে হাজার বার, এমন কি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ধারণ করে ফকির-দরবেশের তাগা-তাবিজ, তবু বউ তার গর্ভবতী হলো না, ঘরে এলো না সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।...

তাই ধনসম্পত্তির মালিক হয়েও শান্তি ছিল না ওয়াজেদ মুন্সীর মনে। কেবল সন্তানের অভাবেই দিন দিন মন-মরা হয়ে সে যখন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে হতাশায়—ঠিক তখনই একদিন আকস্মিকভাবেই ঘটে একটি অভাবনীয় ঘটনা :

প্রতিদিনের মতো সেদিনও ভোরবেলা সে বেরিয়েছিল গোরু-মহিষের তদারক করতে। খাটালের কাছ-বরাবর আসতে আসতেই পাশের ডাষ্টবিনে হঠাৎ সে দেখতে পায়, কাঁথায় জড়ানো একটি রক্তমাখা শিশু। শিশুটিকে মরা ভেবে সে চিৎকার ক'রে পাড়ার লোকজনকে ডাকে এবং দেখতে-দেখতেই ডাষ্টবিনের চারপাশ ঘিরে জ'মে ওঠে একটা পাতলা ভীড়। সবাই ভাবে : হয়তো অসাধু উপায়ে কোনো কুমারীর গর্ভেই পরিপুষ্ট হয়েছে এ-শিশু। তাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো মান-সম্মানের ভয়েই তার কুমারী মাতা তাকে নিক্ষেপ করেছে ডাষ্টবিনে।...

শিশুটিকে মরাই ভেবেছিল ওয়াজেদ মুন্সী। কিন্তু জনতার মধ্য থেকে হঠাৎ একজন ব'লে ওঠে : "না, শিশুটি মরা নয়। ওর বুকটা ওঠানামা করছে।"

ওঠা-নামা করছে ? লোকটার কথা শুনে চম্‌কে ওঠে ওয়াজেদ মুন্সী। স্থির হয়ে খানিকক্ষণ কী-যেন ভাবে। হয়তো তার হতাশ বুকে শিশুটির মতোই জন্মলাভ করে এক নতুন আশা। তাই সে ছুটে গিয়ে রক্তমাখা শিশুটিকে জড়িয়ে নেয় বুকে। তারপর ওভাবেই ছুটে আসে বাড়ী। হাঁফাতে হাঁফাতে স্ত্রীকে বলে :

'এতদিনে তার মনাজাত কবুল করেছে আল্লা।'

ডাষ্টবিন থেকে কুড়িয়ে আনা রক্তমাখা জারজ শিশুকে দেখে প্রথমতঃ ঘৃণায় কুঁচ্‌কে ওঠে তার স্ত্রীর মুখ। কিন্তু ওয়াজেদ মুন্সীর কড়া শাসন ও দৃঢ় নির্দেশে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই সে গ্রহণ করে শিশুটিকে। তারপর দিনে দিনে তার কোলেই প্রতিপালিত হতে থাকে অবোধ, অপরিচিত শিশু। সেদিকে তাকিয়ে ওয়াজেদ মুন্সীর নিস্তেজ বুক সতেজ হয়ে ফুলে ওঠে পিতৃ-গর্বে, ঠোঁটে ফোটে যৌবনকালের হাসি।

দিনের পর দিন বেড়ে ওঠে শিশু। পাড়ার লোক জানে: এ-ছেলে কুড়িয়ে পাওয়া। তার মা-বাপের কোন পরিচয় নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাকে ওয়াজেদ মুন্সীর ঔরসজাত বলেই তারা গণ্য করে। ওয়াজেদ মুন্সী ছেলেকে বুকে ক'রে আদর করে সারাক্ষণ। নাম রাখে মিয়াবাবু এবং তার সামনে এনে জড়ো করে রাজ্যের খেলনা। কোথাও গেলে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়। যেন এক মুহূর্তও চোখের আড়াল করতে চায় না তার একমাত্র বংশধরকে। স্নেহ-যত্নে বংশধরও ধীরে ধীরে অতিক্রম ক'রে চলে তার শিশুকাল থেকে কৈশোরের সীমা।

ওয়াজেদ মুন্সী ভেবেছিল: ছেলেটার মুখ চেয়েই সে বেঁচে থাকবে অনেক কাল। কিন্তু তা আর হলো না। দেখতে দেখতে ছেলে যেদিন উনিশ কিম্বা কুড়ি বছরের কোঠায় এসে দাঁড়ায়—ঠিক সেদিনই আকস্মিকভাবে দেহান্তর ঘটে ওয়াজেদ মুন্সীর। বাড়ীর পাশে তার নিজের জমিতেই তাকে কবর দেয়া হয়। কবরে মাথা গুঁজে ছেলেটা অনেক কাঁদে। তারপর চারপাশে ইটের দেয়াল তুলে কবরের মধ্য-অংশে সেদিনই রোপণ করে একটি চারাগাছ।

ওয়াজেদ মুন্সীর স্ত্রীর দেহে তখনও জৌলুস ছিল। তাই স্বামীর মৃত্যুর পর বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই পাড়ারই একটা লোকের সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ে। ছেলেটা যখন বাড়ীতে থাকেনা—ঠিক তখনই লোকটা আসে এবং কী-সব পরামর্শ করে। তারপর ছেলেটা এলেই আবার বেরিয়ে যায়। দিনে দিনে ছেলেটা বুঝতে পারে সবই। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করে না। কারণ, প্রতিবাদ

করার কোনো অধিকার তার যে নেই—তা' সে বুঝতে পারে ওয়াজেদ মুন্সীর মৃত্যুর পর। অর্থাৎ পাড়ার লোকের কাছেই সে জানতে পেরেছেঃ সে ওয়াজেদ মুন্সীর ঔরসজাত বা তার স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান নয়। তাকে তারা কুড়িয়ে এনেছিল ডাষ্টবিন থেকে। হয়তো সে-কারণেই যাকে সে মা ডাকে—তার কাছে ছেলের মর্যাদা সে কোনোদিনও পায়নি এবং পায় না আজও। সুতরাং মায়ের কোনো-ব্যাপারেই সে না থেকে, নিজের কাজেই ব্যস্ত থাকে সারাক্ষণ। আর ভাবে ওয়াজেদ মুন্সীর কথা। ওয়াজেদ মুন্সী তাকে যদি ডাষ্টবিন থেকে কুড়িয়ে না আনতো, তাহলে হয়তো ডাষ্টবিনেই মৃত্যু ঘটতো তার এবং হয়তো কুকুরের দাঁতে-দাঁতেই ছিন্ন-ভিন্ন হতো তার অসহায় দেহটা। তাই সে মনে করেঃ ওয়াজেদ মুন্সীই তার একমাত্র পিতা। কারণ সেই তাকে নতুন জন্ম দিয়ে মানুষ করেছে বুকের সমস্ত স্নেহ উজাড় ক'রে।

কিন্তু এদিকে মৃত ওয়াজেদ মুন্সীর স্ত্রীর সঙ্গে পাড়ার সেই লোকটার ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই নিবিড় হয়। তারপর পরিণতিস্বরূপ একদিন উভয়ে উভয়ের সঙ্গে আবদ্ধ হয় বৈবাহিক সূত্রে।

ওয়াজেদ মুন্সীর অর্জিত সম্পত্তি তার স্ত্রীর নতুন স্বামী এসে অধিকার ক'রে বসে এবং ছেলেটা বঞ্চিত হয় সব কিছু থেকেই। শুধু তাই নয়, সে-লোকটা অর্থাৎ মায়ের সেই নতুন স্বামী একদিন ছেলেটাকে ডেকে চড়া গলায় বলে যে, সে একটা জারজ, তার পিতা-মাতা বা বংশপরিচয় অজ্ঞাত। অতএব এ-বাড়ী এবং এই সম্পত্তির ওপর তার কোনো অধিকার নেই। সে যেন তার নিজের পথ দেখে।

লোকটার কথা শুনে ছেলেটা সেদিন নতমুখেই বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ী থেকে। কেবল বাড়ী থেকে নয়, পাড়া থেকেও। তবে প্রতিদিন সন্ধ্যা ঘনালেই সে একবার ফিরে আসতো ওয়াজেদ মুন্সীর কবরটার পাশে। সে নিঃশব্দেই এসে চোখের জল

ফেলতো, বাতি জ্বালতো। তারপর অপলক নেত্রে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকতো তারই রোপণ করা চারাগাছটার দিকে। চারাগাছটা যেন মৃত ওয়াজেদ মুন্সীর বুকের স্নেহেই লালিত হয়ে বেড়ে উঠতো দিনে দিনে।

তারপর অনেক কাল কেটে গেছে। কালের নিয়মেই পরিবর্তন ঘটেছে ঘাস-বাগানের। খাটাল লোপ পেয়েছে। বস্তি ভেঙেছে। বৃদ্ধা হয়ে মারা গেছে ওয়াজেদ মুন্সীর স্ত্রী এবং মরেছে তার নতুন স্বামীও। তাদের সমস্ত সম্পত্তিই আজ ছিন্ন-ভিন্ন। যে-অংশে তাদের বাড়ী ছিল— সে-অংশেও আজ ইঁটের কোঠা উঠেছে অন্য কোনো সম্ভ্রান্ত লোকের। প্রায় সমস্ত অংশেই পরিবর্তন ঘটেছে। কেবল আজও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি পূর্ব-প্রান্তের সেই অংশটুকুতে—যেখানে জেগে আছে ওয়াজেদ মুন্সীর সেই কবরটা। সন্ধ্যা ঘনালেই কবরের পাশে আজও নিয়মিত আসার বিরাম নেই ছেলেটার। ছেলেটা আজ সত্তর বছরের বুড়ো।

———

পার্কে পার্কে সে গল্প শোনায়

শহরে যখন বিকেল নামে, ঠিক তখনই সেই একচোখা লোকটার ছায়া পড়ে মধ্য কলকাতার বিভিন্ন পার্কে। সে আসে কাঠের নকল পায়ে ভর দিয়ে। তার একটা পা প্রায় উরু পর্যন্ত কেটে ফেলা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সে হারিয়েছে একটা চোখ। অবশ্য হারিয়েছে সে অনেক কিছুই। কিন্তু তাতে আজ তার আর দুঃখ নেই। কারণ যা তার ছিল—তার যৎসামান্যও আজ যদি বাকি থাকতো, তাহলে সেই বাকি অংশের দিকে তাকিয়ে হয়তো সে দুঃখ অনুভব করতে পারতো হারিয়ে যাওয়া বিরাট অংশের কথা ভেবে। কিন্তু বাকি তার কিছুই নেই। সবই সে হারিয়েছে এবং হারিয়ে যাওয়ার জগতে নিজেকেও সে হারিয়ে ফেলেছে বর্তমানে। তাই অতীতের কোনো স্মৃতিই তার মনে আজ আর কোনো দাগ কাটে না।··· আজ তার বয়স বেড়েছে। দেহ জরাজীর্ণ। অনেক কালের খাকি পোষাকগুলোও আজ শতছিন্ন। বছর পনেরো ধরে এ-পোষাকেই তাকে দেখে আসছে শহরের সাধারণ লোক।··· যারা প্রত্যহই পার্কে আসে বিকেলের হাওয়ায় মন ভাসিয়ে—তারা প্রায় প্রত্যেকেই তাকে চেনে। ছেলে-বুড়ো, যুবক-যুবতী সকলের কাছেই সে সমানভাবে পরিচিত। কেবল পরিচিত নয়, ঘনিষ্ঠও বলা চলে। তাই যখন সে কাঠের পায়ে ভর দিয়ে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে উপস্থিত হয় পার্কে, তখন সবাই এসে তাকে ঘিরে দাঁড়ায় এবং বলে : 'গল্প শোনাও'। সে'ও অবশ্য গল্প শোনাতেই আসে। তাই দ্বিরুক্তি না ক'রে কাঠের পা'টা পাশে রেখে সে চেপে বসে মাটিতে।

তারপর শুরু করে গল্প। এ ঠিক গল্প নয়, গল্পের মতো সাজানো বিচিত্র অভিজ্ঞতা—যা সে লাভ করেছিল বিগত যুদ্ধে। যুদ্ধের কথাই সে নানাভাবে বর্ণনা করে সকলের সামনে।

সে ছিল বিগত যুদ্ধের একজন পল্টন। যুদ্ধের সময় দেশ থেকে দেশান্তরে সে পাড়ি দিয়েছিল এবং দলের সঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছিল সবরকম বিপজ্জনক এলাকায়। চোখ ভরে সে দেখেছে অনেক রকমের দৃশ্য—করুণ ও ভয়ঙ্কর। দু' হাত নেড়ে এবং অক্ষত চোখটার তারা ঘুরিয়ে সে যখন বিশেষ বিশেষ দৃশ্যের বর্ণনা করে, তখন শ্রোতাদের মনে হয়ঃ যুদ্ধ যেন তাদের সামনেই ঘটছে। বর্ণনা করার ভঙ্গী তার অদ্ভুত। এ-জন্যে অনেকেই তার প্রতি আকৃষ্ট। প্রত্যহ যুদ্ধের কথাই সে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বললেও, তার ভঙ্গী-বৈচিত্র্যের জন্য একঘেয়ে লাগে না। তার কথা শুনতে শুনতে ছোটোরা মাঝে মাঝে ভয় পায়, বড়োরা অবাক হয়। শ্রোতাদের বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে সে'ও ব'লে চলে যতক্ষণ বলা যায়। তারপর ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে সে এক সময় থামে এবং শ্রোতারা প্রত্যেকেই দু' একটি করে মুদ্রা দান করে তার হাতে। মুদ্রাগুলো হাতের মুঠোয় চেপে সে উঠে দাঁড়ায় এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শ্রোতাদের উদ্দেশে সে আরেকবার বলেঃ "আপনারা সবাই কামনা করুন যুদ্ধ যেন আর না বাঁধে। যুদ্ধ বড়ো ভয়ংকর!"

এভাবে প্রত্যহই সে কোনো না কোনো পার্কে এসে যুদ্ধের গল্প বলে। তারপর সন্ধ্যা ঘনালে শ্রোতাদের কাছ থেকে যৎসামান্য পারিশ্রমিক আদায় ক'রে ফিরে যায়। কোথায় ফিরে যায়—কেউ জানেনা। অন্যদের মতো আমিও দিনকয়েক তার

শ্রোতা হয়েছিলাম। তার মুখে যুদ্ধের কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু শুনিনি তার নিজের কথা। যুদ্ধের কথা শুনতে শুনতে, বিশেষ ক'রে আমার মনে তার নিজের জীবনকথা শোনার তীব্র কৌতূহল জেগেছিল বহুবার। কিন্তু সময় বা সুযোগ অভাবে শোনা আর হয়নি।...

একদিন সন্ধ্যার সময় সি আই টি পার্কে পায়চারী করার সময় আবার তাকে পেলাম। সে তখন ফিরে যাচ্ছিল। আমি সুযোগ বুঝে আবার তাকে ডেকে বসাই এবং বলি ঃ

—"তাড়া যখন নেই, তখন এসো আরও কিছুক্ষণ গল্প করাযাক। আজ আর যুদ্ধের গল্প নয়। আজ তোমার নিজের কথা বলো।"

আমার এ-কথার পর সে যেন একটু চমকে ওঠে। তারপর ম্লান হেসে বলে ঃ "নিজের কথা? নিজের কথাতো কিছু নেই বাবু!"

—"নিশ্চয়ই আছে। তোমার জীবনটাতো আর চিরকালই এমন ছিল না। তোমার আগের জীবন নিশ্চয়ই অন্যরকম ছিল। আজ এমন অবস্থা তোমার কেন—সে কথাই শুনতে চাই।"

—"তাতে আপনার লাভ কি? আমার মতো একটা লোকের জীবনবৃত্তান্ত শুনে আপনি কি কোনো আনন্দ পাবেন।"

—"আনন্দ বা লাভ-লোকসানের কথা নয়, তুমি আমার পরিচিত বলেই তোমার জীবন সম্বন্ধে আমার একটা সাধারণ কৌতূহল জেগেছে। সুতরাং আজ তোমাকে কিছু বলতেই হবে। নইলে আমি কিছুতেই ছাড়বো না।"

এবারও সে আপত্তি করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমার জেদের কাছে তার সে আপত্তি বেশিক্ষণ আর টেকেনা। খানিকক্ষণ নীরব থেকে, শেষে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সে বলে ঃ

—"দুঃখের কথা কী আর বলবো বাবু! বাড়ী ছিল আমার বর্ধমান জিলার এক গ্রামে। শিশুকালেই বাপকে হারিয়ে মায়ের কাছে মানুষ হই। মা ছিল আমার জনম-দুখিনী। পরের বাড়ী কাজ করে অনেক কষ্টে সে আমাকে মানুষ করে। তারই আদর-যত্নে দেখতে দেখতে যখন বড় হয়ে উঠি, অর্থাৎ বয়স যখন আমার সতেরো কিংবা আঠারোর কোঠায় এসে দাঁড়ায়, তখন মা'ই আমার জীবনের সঙ্গে এনে জুড়ে দেয় আমারই এক খেলার সাথীকে। অর্থাৎ আমাদেরই গাঁয়ের যে-মেয়েটির সঙ্গে ছোটোবেলায় খেলাধূলা করেছি, তারই সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের পর সংসারের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ে আমার ওপর। আমাদের নিজেদের কোনো জমি-জমা ছিল না। তাই আমাকে সংসার চালাতে হতো মজুরের কাজ ক'রে। মজুরের কাজে মজুরী যা জুটতো, তাতে সংসার ঠিক চলতো না। তবু চালিয়ে যাচ্ছিলাম কোনোমতে। এমন সময় আসে সেই সর্বনাশা যুদ্ধ।" এ-পর্যন্ত বলেই সে থেমে যায়। তারপর মাথা নিচু ক'রে নীরবে খানিকক্ষণ কী যেন ভাবতে থাকে। তাকে দেখে মনে হলো: সে যেন নীরবে সাঁতার কাটতে গিয়ে হাবু-ডুবু খাচ্ছে স্মৃতির কোনো ঘোলা নদীতে। আমি ধীরে ধীরে তাকে ডাকি। সে মাথা তোলে। মাথা তুলতেই দেখতে পাই তার স্পন্দমান অক্ষত চোখটা ভেজা। বারকয়েক নিঃশ্বাস ছেড়ে সে আবার বলতে থাকে:

—"যুদ্ধের বাজারে সংসার আর কিছুতেই চলতে চাইছিল না বাবু। তাই মায়ের বুকফাটা কান্না, বউয়ের হাহাকার উপেক্ষা ক'রে আমি নাম লেখাই যুদ্ধে। বিদায় নেবার সময় বউ বলেছিল: "আবার ঠিক ফিরে আসবে তো?" আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলাম: "ঠিক যেমনটি আমাকে আজ দেখছো, ঠিক তেমনটিই

আবার ফিরে আসবো তোমার কাছে। তুমি চিন্তা ক'রোনা।"

এই ব'লে সে বাঁ-হাত দিয়ে একবার চোখ মোছে। তারপর ঢোক গিলে আবার বলে :

—"কিন্তু বউয়ের কাছে আর ফিরে যেতে পারিনি বাবু। মা'কেও আর চোখে দেখতে পাইনি। আমি ছিলাম সামান্য পল্টন। তাই আমার কোনো ছুটি-ছাটা ছিল না। যেসব জায়গায় কামান ও বোমার তাণ্ডব চলছিল—আমার দিন কাটতে লাগলো সে-সব জায়গাতেই। যুদ্ধে যোগ দেবার বছর দুয়েক পর যেবার সিঙ্গাপুরে আসি, ঠিক সেবারই খবর পাই : মা আমার আসাপথ চেয়ে চেয়ে, শেষে পাড়ি জমিয়েছে পরপারের দিকে।

কেবল শূন্য ভিটেটা আঁকড়ে ধরে এখনো আমার আসা-পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে বউ। এ-সংবাদে আমি সেদিন স্থির থাকতে না পেরে ওপরওয়ালাদের কাছে বার বার আবেদন জানাই ছুটির জন্য। কিন্তু কে কাকে ছুটি দেয়! যুদ্ধের অবস্থা তখন ভয়ংকর। তাই ওপরওয়ালারা আমার কোনো কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না।"

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অবাক হয়ে বলি :

—"ছুটি তাহলে কিছুতেই পেলে না ?"

—"পেলাম না তা নয়, ছুটি একদিন না চাইতেই পাওয়া গেল—যেদিন হঠাৎ একটা বোমার আঘাতে আমি হারিয়ে ফেললাম আমার একখানা পা এবং সেই সঙ্গে একটা চোখ। যুদ্ধের কাজে আমি তখন অকেজো বলে কর্তৃপক্ষ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায়। সেই থেকে কলকাতাতেই আমি আছি।"

—"বউয়ের কাছে যাওনি ?"

—"না। তার কাছে আগে যেমনটি ছিলাম—ঠিক তেমনটি তো আমি আর নেই। তাই তার কাছে আর ফিরে যেতে পারিনি।"

তার এ-কথা শুনে আমি অতিমাত্রায় অবাক হয়ে তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকি। তারপর আবার বলি :

—"বউ এখন কোথায় ? সে কি আজও বেঁচে আছে ?"

—"হ্যাঁ, লোক মারফৎ খবর পেয়েছি সে আমাদের গাঁয়েই বেঁচে আছে। তবে সে জানে আমি মরে গিয়েছি। তাই বর্তমানে সে অন্যের ঘর করছে।"

এই বলে সে কাঠের পায়ে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। তারপর যেতে যেতে একবার বলে যায় :

—"বাবু কামনা করুন, যুদ্ধ যেন আর না বাঁধে। যুদ্ধ বড়ো ভয়ঙ্কর !"

আমার মনে হলো : যে ছিল বিগত যুদ্ধের সৈনিক, কলকাতার কুটিল পথে আজ সে জাগ্রত প্রহরী। প্রহরী সে শান্তির।

ফুটপাথের নাটিকা

অসার হয়ে শুয়ে আছে রাস্তাটা। নগ্নবুক, ঝাঁপিয়ে প'ড়েছে মাতাল রোদ শরতের। রোববারের বিকেল এখনো গড়ায়নি। পাশেই থমকে আছে ঠনঠনের কালীবাড়ী। আবার তার যাত্রা সুরু হবে সন্ধ্যায়।··· কালীবাড়ীর সামনের ফুটপাথে জটলা করছে জনকয়েক ভিখারিণী। ওদের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে ব'সে আছে একটা কঙ্কালসার লোক। ভয়ার্ত চোখ মেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে পাঁচ বছরের ছেলেটা। লোকটা তাকে বকছে বিশ্রী ভাষায়। উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠছে তার পাঁজরের হাড়, চামড়া ঠেলে ছিটকে আসছে কণ্ঠনালীর শিরা; দেহটা কাঁপছে, টগবগিয়ে রক্ত ফুটছে রাহুলগ্ন চোখ দুটোয়, লোকটা যেন পাগল হয়ে গেছে!

বকুনির চোটে ছেলেটা এবার মুখ খোলে। বলে ঃ

—"খেতে দেয় বলেই তো ওখানে যাই। তুমি কি ঠিকমতো খেতে দাও? আমার বুঝি ক্ষিদে পায় না?"

ছেলেটার এ কথার পর লোকটা যেন আরও বেশি ক্ষেপে যায়। চিৎকার করে বলে ঃ —"খেতে দেয়? তাই ব'লে তুই আমার শত্তুরের কাছে গিয়ে খাবি? হাড়হাভাতের বাচ্চা, তোকে আজ মেরেই ফেলবো।"

এই ব'লে সে পাশ থেকে কুড়িয়ে নেয় একখানা জ্বালানি-কাঠের টুকরো। তারপর সজোরে মারে ছেলেটার মাথা লক্ষ্য ক'রে। মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে যায় ছেলেটা। মাথা ফেটে ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে আসে রক্ত, লাল হয়ে ওঠে ফুটপাথের পাথর।

ছেলেটা আর্তনাদ করতেই সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা বাড়ি পড়ে তার দেহে, তারপর আবার একটা মাথায়। ছেলেটা এবার কোনোমতে উঠে দৌড় মারে। কিন্তু কিছুদূরে যেতে-না-যেতেই আবার সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রাস্তার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ভিখারিণীদের মধ্য থেকে চিৎকার ক'রে ওঠে একটা মধ্যবয়সী মেয়েলোক :

—"খুন ক'রে ফেল্লো রে খুন ক'রে ফেল্লো, ডাকাত মিনসেটা খুন করে ফেল্লে ছেলেটাকে।"

অপরদিক থেকে লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার ক'রে ওঠে :

—"আমার ছেলেকে আমি খুন করবো, তাতে তোর কিরে সাত-ভাতারী মাগী ?"

মেয়েলোকটা এবার উঠে দাঁড়ায়। কোমরে জড়িয়ে নেয় শাড়ির শতছিন্ন আঁচলটা। তারপর লোকটার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে :

—"সাবধান, মুখ সামলে কথা কও গোলামের বেটা। নইলে তোমার গলা ছিঁড়ে রক্ত খাবো।"

লোকটাও উঠে দাঁড়ায় লাফ দিয়ে এবং বলে: —"রক্ত খাবি? তবে খা।"— এই ব'লে মেয়েলোকটার দিকে সে সবেগে ছুঁড়ে মারে হাতের জ্বালানি-কাঠের টুকরোটা। মেয়েলোকটার গায়ে তা লাগতেই যেন ক্ষেপে ওঠে ঠনঠনের ভয়ংকরী কালী। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সে ছুটে যায় লোকটার দিকে। তারপর হঠাৎ তার কণ্ঠনালীটা চেপে ধরে। কাণ্ড দেখে আশ-পাশ থেকে ছুটে আসে লোকজন। জন-কয়েক ভদ্রলোকও ছুটে আসেন রাস্তা থেকে। মেয়েলোকটা লোকটার গলা ধ'রে বার-কয়েক সজোরে ঝাঁকানি দেবার পর তাকে ছেড়ে দেয়। তারপর উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ ক'রে বলে:

—"মুখপোড়া মিনসেটা ছেলেটাকে খুন ক'রে ফেলছিল; আমি মানা করছিলাম ব'লে আমাকেও মেরেছে। আমাকে মারার সে কে? আমি কি তার ঘরের বউ?"

লোকটাও তৎক্ষণাৎ ব'লে ওঠে: —"আমার ছেলেকে আমি যাই করি, তাতে তোর কিরে হারামজাদী? তুই কেন নাক গলাতে আসিস?"

এ-কথার উত্তরে মেয়েলোকটা এবার মুখ ভেংচিয়ে বলে:

"আহারে আমার মরদ রে। ছেলেকে খেতে দেবার মুরোদ নেই, বাপ হয়ে শাসন করার সখ আছে। ঢঙ দেখে আর বাঁচি না।"

এই ব'লে, মেয়েলোকটা হঠাৎ ভীড় থেকে স'রে যায়। ছেলেটা এতক্ষণে ভীড়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। রক্তে ভেসে গেছে তার সমস্ত মুখ, সমস্ত দেহ। ওর দিকে চোখ পড়তেই শিউরে ওঠে

জন-কয়েক লোক। কে একজন লোকটাকে উদ্দেশ ক'রে ব'লে ওঠে :

—"ইস্, ছেলেটার এ কি হাল করেছো হে ? তোমার কি দয়া-মায়া নেই ? বলি ছেলেটা তো তোমারই।"

লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে ব'লে ওঠে : —"আমার ছেলে হলেও, ওটা আমার শত্তুর। বার বার মানা করি, তবু রোজ রোজ ওই মেয়েলোকটার কাছে গিয়ে সে খাবার চেয়ে খায়। মাঝে মাঝে মেয়েলোকটাও তাকে ডেকে খাওয়ায়। অথচ ওই মাগীটা আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে রোজ কি বলে জানেন ? বলে : "বাপ হয়ে ছেলেকে খেতে দিতে পারে না, এমন বাপের মরণ হয়না কেন ?"— আরও অনেক কথাই বলে। দিনদিন মাগীটার হাড়-জ্বালানি কথা শুনে জান আমার বেরিয়ে গেল। ছেলেটাকে কতবার বলেছি : ওই দজ্জাল মেয়েলোকটা আমার চিরকালের শত্তুর, ওর কাছে যাসনে। তবু সে যাবেই। আমি আর কাহাতক সহ্য করবো বলুন ?

লোকটার কথা শুনে ভীড়ের একজন ভদ্রলোক বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তাকে জেরা করতে সুরু করে :

—"ছেলেটা খেতে পায়না বলেই তো ওর কাছে যায়। তুমি ওকে খেতে দাও না কেন ?"

—"কে বলে খেতে দিই না ? কোনো কোনোদিন খেতে দিতে পারি না সত্য। কিন্তু সেটা কি আমার দোষ ? রুজি-রোজগার নেই, ভিক্ষাও বিশেষ পাই না। তাইতো এমন হয়। আমি না খেয়ে থাকতে পারি। ও পারে না ?"

—"ছেলেমানুষ না খেয়ে কি থাকতে পারে ? এ-জন্যেই তো মেয়েলোকটা ওকে খেতে দেয়। অথচ ওই মেয়েলোকটাকেই শত্রু ভাবছো তুমি ?"

—"নিশ্চয় শত্তুর ভাববো। ও-মাগীটা সব চাইতে বড়ো শত্তুর। সকাল-সন্ধ্যায় লোকজনেরা কালীবাড়ীতে পূজো দিতে এলে—অন্যদের মতো আমিও তাদের কাছে গিয়ে হাত পাতি দু'একটা পয়সার আশায়। আর ঠিক তক্ষণই ওই মাগীটা ছুটে এসে আমার পাশে দাঁড়ায়! লোকজনেরা মনে করে, ও মাগীটা বুঝি আমারই কেউ। তাই ওর হাতেই তারা পয়সা দেয়, আমাকে দেয় না। দিনের পর দিন এভাবেই আমাকে জ্বালিয়ে আসছে মাগীটা। ও আমার শত্তুর নয়?"

একথা শুনে ভীড়ের কেউ কেউ এবার একটু হাসাহাসি করে। হাসাহাসি লক্ষ্য ক'রে লোকটা আবার বলে: "আপনারা হাসছেন? কিন্তু আমি যে ম'রে গেলাম গো বাবু! ওই ছেলেটার জন্যেই আমার এ-দুর্গতি। ও মরলে আমার হাড় জুড়োয়।"

জনতার মধ্য থেকে এবার একজন ধমক দিয়ে ওঠে:

—"মিছেমিছি ছেলেটাকে মরতে বলছো কেন? নিজে মরতে পার না? নিজেই মরো না গিয়ে।"

লোকটাও তেমনই গলা চড়িয়ে বলে:—"হ্যাঁ-গো বাবু হ্যাঁ, আমিও মরতেই চাই। কিন্তু মরণ যে আসে না। একটা ওষুধ দিতে পারেন—যা' খেলে মরণ হবে?"

ভীড়ের মধ্য থেকে এবার অন্য একটা লোক টিপ্পনি কেটে বলে:

—"মরার জন্য ওষুটের দরকার কি? রাস্তা দিয়ে ট্রাম-বাস চলছেই। ওগুলোরই একটার তলায় পড়ে মরলেই হয়!"

এই কথা শুনে লোকটা হঠাৎ নির্বাক হয়ে যায়। খানিক্ষন সে বোবার মতো তাকিয়ে থাকে তার দিকে, যে এই কথাগুলো বলছিল। চলন্ত ট্রাম-বাসের তলায় পড়েও যে মরা যায়—তা যেন এতদিনেই সে বুঝতে পারে। হয়তো তাই তার সারা মুখে হঠাৎ ঘনিয়ে আসে একটা নিথর কালো ছায়া।

লোকটা আর কোনো কথা বলছে না দেখে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে স'রে পড়ে জনতা। লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কি যেন ভাবে। তারপর হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়ে মাটিতে। হঠাৎ ছেলেটার দিকে চোখ পড়তেই আবার সে উঠে দাঁড়ায়, ছুটে গিয়ে হাত ধরে ছেলেটার। তারপর তাকে টানতে টানতে নিয়ে যায় সেই মেয়ে-লোকটার কাছে। মেয়েলোকটার বুকের কাছে ছেলেটাকে হঠাৎ ঠেলে দিয়ে সে ব'লে ওঠে:

—"নে রে মাগী, ছেলেটাকে তুই নে। আজ থেকে আমি ওর বাপ নই। তুইই ওর মালিক। আমি চল্লাম।"

ছেলেটাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে মেয়েলোকটা এবার মুচকি হেসে বলে:—"কোথায় চললে?"

লোকটা যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়। তারপর বেশ একটু ভগ্নকণ্ঠেই বলে ঃ

—"মরতেই চল্লাম। বাবুরা বলেছে ট্রাম-বাসের তলায় পড়েও মরা যায়। ছেলেটাকে তুই ভালবাসিস। ওকে তাই তোর কাছেই রেখে গেলাম। আমার কথা ওকে তুই ভুলিয়ে দিশ।"

এই ব'লে লোকটা পা বাড়ায় রাস্তার দিকে। মেয়েলোকটা অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

বাপ চ'লে যাচ্ছে দেখে ছেলেটা হঠাৎ কেঁদে ওঠে। কান্নায় চমক ভাঙে মেয়েলোকটার। ছেলেটাকে আস্তে আস্তে সরিয়ে রেখে গা-ঝেড়ে সে উঠে দাঁড়ায় এবং ছুটে গিয়ে হাত ধরে লোকটার। তাবপর তাকে হিড়-হিড় ক'রে টেনে এনে পাশে বসায়। চিৎকার ক'রে বলে ঃ

—"খবরদার, এখান থেকে উঠলে গলা টিপে দেবো মিনসের।"

লোকটা হতভম্ব হয়ে ব'সে থাকে। তারপর কি যেন এক নির্বোধ জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়ে ছাখে মেয়েলোকটার মুখের দিকে। মেয়েলোকটা ওদিকে দৃকপাত না ক'রেই ছেলেটাকে আবার টেনে নেয় কোলের কাছে। তারপর শাড়ির আঁচল দিয়ে সস্নেহে মুছতে থাকে তার সারা মুখের চাপ চাপ রক্ত।

বিকেল গড়িয়ে যায়। আবার যাত্রা সুরু করে ঠনঠনের কালীবাড়ী। কাঁসর বাজে, মন মাতে ধূপের ধোঁয়ায়। রক্ষা-কালীর প্রসন্ন চোখ থেকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে শান্তি।

———

একটি কুঁড়ি

হে পথিক, যেতে যেতে এখানে একবার থামো। চোখ ফেরাও পাশের ফুটপাথে—যেখানে পাথর ফাটিয়ে মাথা তুলেছে একটা গাছ। দেখো ঃ দুটি শীর্ণ হাত শূন্যে পেতে গাছতলায় ব'সে আছে একটি চার বছরের মেয়ে। ওর মুখটি কেবল কচি নয়, মিষ্টিও। কথা বলছে বাঁশির মতো গলায়। ও তোমাকে ডাকছে। কেবল তোমাকে নয়, তোমার মতো সবাইকে ডাকছে—যারা এ-পথ দিয়ে যাতায়াত করে।··· তুমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেই ও হয়তো কিছু চেয়ে বসবে তোমার কাছে। দেবার ইচ্ছে না থাকলে দিও না। তোমার কাছে ও জোর ক'রে কিছু চাইবে না। ও জোর করতে শেখেনি। তুমি শুধু দাঁড়াও। ওর প্রতি নির্দয় হয়ো না। ওকে উপেক্ষা করো না। তুমি স'রে যেও না ঘৃণায়। শুধু দাঁড়াও। শুধু চেয়ে দেখো। একটু হাসো। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু করুণা করো তুমি। পাশে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলো ওর আপনজনের মতো।··· ও বড়ো অসহায়। এই বিশাল পৃথিবীতে আজ ওর কেউ নেই। ও একা একা কাঁদে, কান্নার সঙ্গী নেই। কখনো কখনো গান গায়, গান কেউ শোনে না। ওর পেট জ্বলে ক্ষুধায়, আদর ক'রে কেউ খেতে দেয় না। নিজের ওপর নিজেই অভিমান ক'রে ও শুয়ে থাকে গাছতলায়, কেউ এসে একটু সান্ত্বনা দেয় না। ওর কেউ নেই।

হে পথিক, তুমি ওই মেয়েটিকে চেনো না। কিন্তু ওর

বাপকে তো চিনতে। ওর বাপের নাম ছিল গোরাচাঁদ রিক্সাওয়ালা। দিনমান সে রিক্সাই টানতো। রিক্সায় ক'রে হয়তো সে তোমাকেও এক স্থান থেকে আরেক স্থানে কোনোদিন পৌঁছে দিয়ে থাকবে। তার দিন কাটতো পথে পথে, রাত কাটতো পাশের ওই বস্তির একটা ঘরে। তার ঘরের পাশেই আরেকটা ঘর ছিল। ও-ঘরে বাস করতো একটা আইবুড়ো মেয়ে তার বৃদ্ধ বাপের সঙ্গে। মেয়েটার নাম ছিল হরিমতী।

ঘটনাচক্রে এই হরিমতীকেই একদিন বিয়ে ক'রে বসে গোরাচাঁদ। হরিমতীর এককালে টি-বি হয়েছিল। তবে অনেক চিকিৎসা-আদির পর তার সে রোগ যে একেবারেই সেরে গেছে—

গোরাচাঁদ তা জানতো। তাই সে এ নিয়ে বড়ো একটা মাথা ঘামায়নি বিয়ের আগে। তবে বিয়ের অনেকদিন পর মাথা একদিন ঘামাতে হলো—যেদিন প্রথম গর্ভবতী হয়েই হরিমতী আবার আকস্মিক ভাবেই আক্রান্ত হলো আগের অসুখে। গরীবের পক্ষে

যতদূর সম্ভব, চিকিৎসার কোনো ত্রুটি রাখলো না গোরাচাঁদ। তার ত্রুটিহীন চিকিৎসা এবং ঐকান্তিক শুশ্রূষার ফলেই গর্ভে সন্তান নিয়েও বেশ কিছুদিন বেঁচে রইলো হরিমতী। গোরাচাঁদ ভেবেছিল বেঁচেই যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বাঁচলো না। গাছতলার এই বর্তমান মেয়েটি, অর্থাৎ গোরাচাদ ও হরিমতীর একমাত্র সন্তান প্রসব হওয়ার পরই হঠাৎ একদিন মৃত্যু ঘটলো হরিমতীর।

হরিমতীর মৃত্যু গোরাচাঁদের মনে গভীর দাগ কাটে। যৌবনের প্রথমে একমাত্র হরিমতীকেই সে কাছে পেয়েছিল এবং ভালোবেসেছিল সমস্ত প্রাণ দিয়ে। অতএব এ-মৃত্যু যে স্বাভাবিক কারণেই তার সমস্ত তন্তরে অতি মর্মান্তিক হয়ে বাজবে—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।...

গোরাচাঁদ মনে মনে ঠিক করেঃ আর সে বিয়ে করবে না। বাকি জীবনের সমস্ত সাধনা ও পরিশ্রম দিয়ে হরিমতীর একমাত্র স্মৃতি এই মেয়েটিকেই কেবল সে মানুষ ক'রে তুলবে। সুতরাং মেয়েটিকে তার দাদু অর্থাৎ মৃতা হরিমতীর বৃদ্ধ পিতার হেফাজতে রেখে, আবার আগের মতোই সে রিক্সা টানতে সুরু করে। হরিমতী যখন বেঁচে ছিল—তখন হয়তো তারই আকর্ষণে সন্ধ্যা ঘনালেই মন তার ঘরমুখো হতো। কিন্তু এখন ঘরে তেমন আকর্ষণ নেই। তাই সে এবার সকাল থেকে রাত-ছুপুর পর্যন্ত রিক্সা চালাতে সুরু করে মোটা রোজগারের আশায়। কিন্তু হাজার হোক শরীর তো। শরীর এতো পরিশ্রম সইবে কেন? দিনের পর দিন এ-ধরণের অমানুষিক পরিশ্রমের ফলেই স্বাস্থ্য তার ভেঙে পড়ে। তারপর দেখতে দেখতে মেয়ের বয়স যখন দেড় কিংবা ছুয়ের কাছাকাছি—

তখন একদিন রিক্সা চালাতে চালাতে নিজের কাশির সঙ্গে আকস্মিক ভাবেই কয়েক ফোঁটা রক্ত দেখতে পায় গোরাচাঁদ। মনে মনে সে বুঝতে পারে : হরিমতীর রোগটাই তাকে ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও পায় এই ভেবে যে, এ-খবর যদি জানাজানি হয়, তাহলে তার রিক্সায় আর কেউ উঠবে না। রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে চিরদিনের মতো। তাই সে নিজের মনেই চেপে রাখে কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠার কথা।

কিন্তু গ্রীষ্মের রোদ মাথায় নিয়ে রিক্সা চালাতে চালাতে হঠাৎ যেদিন মাঝ-পথে থেমে যায় এবং কাশতে কাশতেই অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে—সেদিন সেই রক্ত ওঠার কথা আর কারুর কাছেই অজানা থাকে না। আক্রান্ত সে বহু পূর্বেই হয়েছিল। তাই যেদিন জানাজানি হলো—সেদিন আর কোনো চিকিৎসাই তার কাজে এলো না।

ঠিক মাসখানেক পরেই মারা গেল গোরাচাঁদ। পেছনে রেখে গেল তার একমাত্র মেয়ে—যে-মেয়ের অসহায়-অবলম্বন হলো এবার তার বৃদ্ধ দাদু।

শোকে-দুঃখে মেয়েটির বৃদ্ধ দাদু আরও বৃদ্ধ হয়ে ওঠে দিনে দিনে। তার কোনো জীবিকা ছিল না। তাই সে একমাত্র নাতনীটিকে বুকে বেঁধে নেমে আসে পথে। মাসখানেক এপাড়া-ওপাড়া হতাশভাবে ঘুরে, শেষে গ্রহণ করে ভিক্ষাবৃত্তি। দিন চলতে থাকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। পথে পথে বৃদ্ধের জরাজীর্ণ বুকেই বেড়ে উঠতে থাকে মেয়েটি।

কিন্তু দেখতে দেখতে মেয়েটির বয়স যখন বছর-চারের মাথায় এসে দাঁড়ায়—তখন তার বৃদ্ধ দাদু আরও বেশি অথর্ব হয়ে পড়ে।

তার পা যেন আর চলতে চাইছিল না। জোর ক'রে চলতে গেলেই হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছিল। তাই সে পথে পথে, পাড়ায় পাড়ায় এবং দ্বারে দ্বারে ঘোরা বন্ধ ক'রে অবশেষে এসে আশ্রয় নিয়েছিল এই ফুটপাথে—যেখানে পাথর ফাটিয়ে মাথা তুলেছে গাছটা।

গাছতলাতেই দুহাত পেতে ব'সে থাকতো দাদু। মেয়েটি ব'সে থাকতো তার পাশে। মাঝে মাঝে দাদু তাকে গল্প শোনাতো; গল্প শুনে খিলখিলিয়ে হেসে উঠতো মেয়েটি। দাদুর চুপ্‌সে যাওয়া ঠোঁটেও উপ্‌চে উঠতো খুশির ফোয়ারা।...

রাত্রে ওরা ফুটপাথেই ঘুমোতো। প্রত্যহ সকাল হ'লে মেয়েটিই জেগে উঠতো আগে। তারপর দাদুকে জাগিয়ে, তার কাছ থেকে গতদিনের ভিক্ষার পয়সা নিয়ে সে খাবার কিনে আনতো পাশের দোকান থেকে। নিজে খেতো, দাদুকেও খাওয়াতো। ওদের ফুটপাথের দিন চলতো এভাবেই।

অভ্যেস মতো সেদিনও জেগে উঠেছিল মেয়েটি। জেগেই সে দাদুকে জাগাতে চেষ্টা করে। কিন্তু দাদুর ঘুম কিছুতেই ভাঙে না। তাই সে পাশেই ব'সে থাকে চুপচাপ। তারপর ধীরে ধীরে যখন বেলা বাড়তে থাকে, ক্ষুধায় জ্বলতে থাকে পেট—তখন সে আর স্থির থাকতে না পেরে দাদুর গায়ে বার বার নাড়া দেয়। কিন্তু তাতেও যখন দাদু তার জাগতে চায় না—তখন সে কাঁদতে থাকে এবং কাঁদতে কাঁদতেই দাদুকে আবার ডাকতে থাকে বাঁশির মতো গলায়।

তার এ-অবস্থা লক্ষ্য ক'রে রাস্তা থেকে এগিয়ে আসে একটা লোক। লোকটা আসতেই মেয়েটি বলে: 'দাদুকে একটু জাগিয়ে

দিন না! সেই কাল রাত থেকে ঘুমুচ্ছে। আমি কত ডাকলাম, কিছুতেই উঠছে না।'

মেয়েটির করুণ অনুনয়ে লোকটা ওর দাতুকে জাগাবার উদ্দেশ্যেই আরও কাছে এগিয়ে আসে এবং হাত রাখে শুয়ে থাকা

বৃদ্ধের গায়ে। কিন্তু হাত রাখতেই কী এক হিম-স্পর্শে সে চমকে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের মুখের ঢাকা খুলতেই সে দেখতে পায়: দাতু তার সত্যই ঘুমোচ্ছে—যে-ঘুম আর কোনোদিনও ভাঙবে না।

হে পথিক, আজ দিন-কয়েক হলো, কর্পোরেশনের গাড়ী এসে

ওর দাতুকে নিয়ে গেছে। সেই থেকে কেঁদে কেঁদে মেয়েটি এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এখন সে সত্যই বুঝতে পেরেছে: দাতু তার নেই। দাতু আর ফিরবে না। তাই সে দাতুর আসনে ব'সে এবার হাত পেতেছে দাতুর মতোই। ওর ওই শীর্ণ হাত তুটি কোনোদিন পুতুল-খেলা খেলেনি। কোনোদিন আর পুতুল খেলা শিখবে না। ক্ষুধার জ্বালায় কেবল কৃপণ মুদ্রা কুড়াবে ফুটপাথ থেকে।······হে পথিক, মেয়েটি তোমাকে ডাকছে পাখির মতো গলায়। তুমি ওর পাশে একটু দাঁড়াও, তুটো কথা বলো। নির্দয় হয়ো না।

———

এতদিনে সে সম্পূর্ণ বাউল

ট্রাম থেকে নেমেই বন্ধুর বাড়ীর দিকে পা বাড়িয়েছি—এমন সময় গোলমালটা কানে এলো। চোখ ফেরাতেই দেখি: হাত-কয়েক দূরেই একটা বস্তি সংলগ্ন বাড়ীর পাশে ছোট-খাটো একটা ভীড় জমেছে। ভীড়ের মধ্যে একটা স্বাস্থ্যবান লোক অন্য একটা লোককে ধ'রে বেদম মারছে, আর গালাগাল দিচ্ছে অশ্লীল ভাষায়। ওদিকে তাকিয়ে আমি বেশ একটু চমকেই উঠি। চমকে ওঠার কারণ আছে। যে-লোকটা অন্যকে ধ'রে মারছে এবং যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে—ভিন্ন পাড়া বলেই তারা কেউ আমার পরিচিত নয়, কিন্তু যে-ব্যক্তি মার খাচ্ছে—তাকে আমি চিনি। কেবল যে চিনিই তা নয়, সে আমার একরকম ঘনিষ্ঠও বলা চলে। ······সে একজন বাউল। নাম তার নকুলদাস। পায়ে পায়ে সারা কলকাতা সে চষে বেড়ায়, আর গান গায় তার জীর্ণ এক-তারাটা বাজিয়ে। আমাদের পাড়ায় তার যাতায়াতটা একটু বেশি। বিশেষ ক'রে যে-রেস্তোরাঁয় ব'সে আসন্ধ্যা-সকাল আমরা আড্ডা দিই, সেখানে সে'ও গিয়ে চা খায়, গান গায়। তার দৈনন্দিন খরচ মাত্র পাঁচসিকে পয়সা। এই পাঁচসিকে পয়সাই সে প্রত্যহ গান গেয়ে রোজগার করে। খরচের পাঁচসিকে পয়সা টায়-টায় উঠে এলে, আর এক পয়সাও সে কারো কাছ থেকে নেয় না। অবশ্য কেউ গান শুনতে চাইলে গায়, কিন্তু বিনিময়ে একটি আধলাও সে আর গ্রহণ করে না। কেউ জোর ক'রে দিতে চাইলে বলে:—আজকের মতো খরচের পয়সা আমার উঠে গেছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিলে কেবল মায়াই বাড়বে। অহেতুক আর মায়া

বাড়িয়ে লাভ কি !'……কেউ যদি প্রশ্ন করে :—'সব মায়াই কি কাটিয়ে উঠেছো ?'……তাহ'লে তার উত্তরে সে বলবে :—না। বুকের মধ্যে এখনও একটা মায়া জেগে আছে। তাই আজও পথে-পথে ঘুরছি, আর চোখে-চোখে অনুসন্ধান করছি সেই মায়ার বস্তুকে। কিন্তু সে-বস্তু আজও আমায় ধরা দিলনা। কে জানে, হয়তো এ-মায়াই আমাকে শেষ করবে !'

অদ্ভুত লোকটা ! এ-সমস্ত নানান কারণেই তাকে আমাদের ভালো লাগে। গানের গলা তার নেই। তবু ভাঙাভাঙা গলায় আজও যা গায়—তাতেই অনুভব করা যায় পদ্মার স্নেহ-কল্লোল। ভবঘুরে বাউল হলেও, লোকটা যে গুণী এবং সৎ—সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাই আমাদের পাড়ার অনেকেই তার ঘনিষ্ঠ এবং সেই সূত্রে আমিও যে তার একজন বন্ধু—সে-কথা আগেই বলেছি।

এমন একটা লোক আজ রাস্তার ওপর মার খাচ্ছে—এ-কথা ভাবতেও যেন কেমন লাগে ! তাই বাধ্য হয়েই আমাকে ছুটে আসতে হয় ভীড়টা লক্ষ্য ক'রে। আমি এসে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই সেই লোকটা পরপর আরও কয়েকটা কিল-ঘুষি চালিয়ে বাউলকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে একতারাটাও হাত থেকে ছিটকে প'ড়ে ভেঙে যায়। আমি তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে বলি :—'এ কি করছেন মশায় ? ব্যাপার কি ?'…

লোকটা আমার দিকে দৃকপাত না ক'রে বাউলকেই লক্ষ্য ক'রে বলতে থাকে :—

—'বেটা সাধুবেশী শয়তান ! আশা করি এবার শিক্ষা হয়েছে। এবার থেকে সমঝে চলো।'……এই ব'লে লোকটা আর না দাঁড়িয়ে

রাস্তা ছেড়ে সটান তার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং সশব্দে বন্ধ ক'রে দেয় ঘরের দরজা। সঙ্গে সঙ্গে ভীড়টাও স'রে যায়। আমিই কেবল অখনও অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখে নকুল বাউল এবার কোনোমতে উঠে দাঁড়ায়। তারপর কুড়িয়ে নিয়ে আসে ভাঙা একতারাটা। আমি কোনো কথা না ব'লে তার হাত ধরি এবং আস্তে আস্তে তাকে রাস্তার পাশের একটা রেস্তোরাঁয় এনে বসাই। তারপর হু'কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে তাকে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার অবকাশ দিই।......

বেলা তখন এগারোটা। চায়ের দোকান নির্জন। এক কোণের একটা টেবিল ঘিরে মুখোমুখি ব'সে আছি কেবল আমরা হু'জন। আমি জানি সে নিরপরাধ। অতএব কেন সে ওভাবে মার খেলো—তা নিয়ে তাকে প্রশ্ন করা বৃথা। তাই অন্য কিছু না ব'লে তাকে আগে চা খেতে বলি। তারপর চা খাওয়া শেষ হ'লে দৃঢ়কণ্ঠে জানাই যে, তাকে নিয়ে আমি থানায় যেতে চাই।

থানার কথা শুনেই সে আমার মুখের দিকে একবার তাকায়। তারপর ধীরে ধীরে বলে :—'থানা? থানায় কেন?'

আমি বলি :—'যে-লোকটা তোমাকে বিনাদোষে ওভাবে মারলো, তার বিরুদ্ধে একটা ডায়েরী দিতে হবে।'

আমার এ-কথায় সে বেশ একটু বিচলিত হয়। তারপর আবার বলে :

—'না-না, ডায়েরী দিতে হবে না। ও-লোকটার কোনো দোষ নেই। দোষ আমারই।'

—'দোষ তোমারই? তার মানে?'

—'হ্যাঁ, সে অনেক কথা। বুকের মধ্যে যে-অবুঝ মায়াটাকে এতদিন জাগিয়ে রেখেছিলাম—আজ তারই ফল ভোগ করেছি

আমি। লোকটার কোনো দোষ নেই। দোষ আমার ভাগ্যের!'

তার এই হেঁয়ালি আমার ঠিক বোধগম্য হলো না। তাই অত্যন্ত আকুল হয়ে আবার বলিঃ —'আসল ব্যাপারটা কি বলোতো? আজ মনে হচ্ছে, তুমি আমার পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও, তোমার অনেক কথাই আমি জানি না।'

—'হ্যাঁ, তা জানো না এবং না জানাই ভালো।'

—'না তবু বলো। আজ আমি শুনতে চাই।'

—'শুনে লাভ কি?'

—'লাভ অনেক। বিশেষ ক'রে আজকের এই ঘটনার পর তোমার জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে ইচ্ছে করে। সুতরাং তোমার সব কথা খুলে বললে আমি খুশি হবো।'

তবু সে ইতস্ততঃ করে। কিন্তু আমি যখন একান্ত দাবি নিয়ে চরম জিদ ধরি, তখন সে আর দৃঢ় থাকতে পারে না। আমি সুযোগ বুঝে আরও দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে উৎকর্ণ হই। নকুল বাউল বলতে সুরু করে তার জীবনের একটা বিশেষ অধ্যায়ের বিচিত্র কাহিনীঃ

সে প্রায় অনেক কাল আগের কথা। ফরিদপুর জিলার কোনো এক গ্রামে ছিল এই নকুল বাউলের পৈত্রিক ভিটে। অতি শৈশবেই তার বাপ মারা যায়। বাপ মারা যাওয়ার পর সংসারে ছিল কেবল তার বৃদ্ধা মা আর সে। তাদের দিন চলতো চাষ-আবাদের কাজ ক'রে। ভেবেছিল এভাবেই কেটে যাবে সমস্ত জীবন। কিন্তু কাটলো না। কিছুদিন পর একটা শক্ত অসুখে আক্রান্ত হয়ে নকুলের মা'ও যখন পরপারের পথে পাড়ি

জমায়—তখন স্বাভাবিক কারণে নকুলেরও বিরাগ জন্মে সংসারের প্রতি। সুতরাং সে তার মামার হেফাজতে বাড়ী-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে পথে। ঘুরতে ঘুরতে খুলনায় এসে ধর্মদাস নামে

এক বৃদ্ধ বাউলের কাছে সে দীক্ষা নেয় এবং বসবাস করতে থাকে সেখানেই।

ধর্মদাস বাউল ছিল বিপত্নীক। তার সংসারে থাকার মধ্যে ছিল এক উঠতি বয়সের কন্যা। নাম তার রাধা। দিনে দিনে

এই রাধার সঙ্গেই ভাব জন্মে নকুলের। রাধা তাকে রসিকতা ক'রে বলতো : —'তোমার নামটা নকুল না হয়ে গোকুল হলো না কেন?'··· এ-কথার উত্তরে নকুল হাসতে হাসতে গানের স্বরে বলতো :

—'নকুল আমার দেহের নাম,
মনের নাম গোকুল ;
তাইতো সখী মনটা আমার
রাধার প্রেমে আকুল।'

নকুলের এ-গান শুনে রাধা আর কোনো কথা বলতো না। কেবল হাসতো।

সেদিন নকুলের গানের গলা ছিল মধুর। দিনমান বাড়ী-বাড়ী গান গেয়ে সে পয়সা রোজগার করতো এবং সে-পয়সা দিয়েই রাধার জন্য কিনে আনতো হলুদবরণ শাড়ি, মাথার কাঁটা এবং রঙ-বেরঙের কাঁচের চুড়ি। বিনিময়ে সে রাধার কাছ থেকে উপহার পেতো পদ্মফুলের মালা।

এভাবেই পরস্পরের পূর্বরাগ নেমে আসে অনুরাগে। তারপর তাদের অনুরাগও একদিন রূপান্তর লাভ করে গভীর ভালোবাসায়। ধর্মদাস বাউল এ-ব্যাপারে কোনো আপত্তি করেনি। বরং মনে মনে খুশিই হয়েছিল এই ভেবে যে, নকুলের মতো একটা সমর্থ ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে মা-মরা মেয়েটার একটা সদ্‌গতিই হবে। তাই ধর্মদাস একদিন নকুলকে ডেকে বলে :

—এবার থেকে বাহুল্য খরচ না ক'রে পয়সা-কড়ি জমানোর দিকে একটু মন দাও। আসছে বছরই তোমাদের দু'জনের বিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।'

নকুল ধর্মদাসের এ-প্রস্তাবে খুশি হয় এবং দ্বিগুণ উৎসাহে সে কাজে নামে। গ্রাম থেকে গ্রামে এবং হাট থেকে গঞ্জে সে গান গেয়ে বেড়ায় পয়সা রোজগারের আনন্দে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিয়ের দিন এগিয়ে আসতে-না-আসতেই ঘনিয়ে এলো সেই সর্বনাশা দিন। অর্থাৎ ১৯৫০ সালের হাঙ্গামা।···

পূর্ববঙ্গ পাকিস্থানের এলাকা হলেও, দেশ ছেড়ে পালাবার কথা এতদিন তারা চিন্তা করেনি। কিন্তু ১৯৫০ সালে উভয় বঙ্গেই যে- নতুন দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূত্রপাত ঘটে—তার উত্তেজনা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পূর্ববঙ্গের সমস্ত গ্রামেও। স্বজাতিরা ঘর-বাড়ী ছেড়ে দলে দলে পালাতে সুরু করে। নকুলরাও পালাবে কিনা চিন্তা করছে—এমন সময় ফরিদপুরের সেই গ্রাম থেকে নকুলের নামে একখানা চিঠি আসে। চিঠি তার মামার। মামা লিখেছে: গ্রাম ছেড়ে সবাই পালাচ্ছে। সুতরাং বউ ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে তার পক্ষেও আর গ্রামে টিকে থাকা সম্ভব নয়। সে তার নিজের বিষয়-সম্পত্তির সঙ্গে নকুলের ভিটে-বাড়ীটাও যথাযথ মূল্যে বিক্রি করার একটা ব্যবস্থা করেছে। এ-জন্য নকুলের উপস্থিতি প্রয়োজন। নকুল যেন অনতিবিলম্বেই আসে।···

এমতাবস্থায় রাধা আর বৃদ্ধ ধর্মদাসকে একা ফেলে মামার ডাকে ফরিদপুর রওয়ানা হওয়া উচিত কিনা ভেবে পাচ্ছিল না নকুল—এমন সময় ধর্মদাসই নকুলকে ডেকে বলে: —"তুমি ফরিদপুর যাও। তোমার সেই ভিটে-বাড়ীটা বিক্রি হলে হাতে কিছু টাকা-পয়সা আসবে। এই দুর্দিনে টাকা-পয়সার খুব দরকার। তবে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। এই ক'টা দিন আমরা সাবধানে থাকার চেষ্টা করবো।"

ধর্মদাসের নির্দেশে অগত্যা ফরিদপুরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়

নকুল। কিন্তু ফরিদপুর পৌঁছেই সে শুনতে পায়ঃ খুলনারও কোনো কোনো অংশে হাঙ্গামা স্বরু হয়েছে। এমন কি সেই গ্রামেও—যেখানে রাধা আর ধর্মদাস থাকে। বিশেষ ক'রে রাধার জন্য নকুলের সমস্ত অন্তরাত্মা হাহাকার ক'রে ওঠে। তাই দু-চারদিনের মধ্যেই সে তার ভিটেবাড়ীর একটা হিল্লে ক'রে পাগলের মতো আবার ছুটে আসে খুলনায়। কিন্তু যখন সে এসে পৌঁছয়—তখন বাড়ী শূন্য। কেবল ধর্মদাসের বাড়ীই নয়,

আশ-পাশের সব বাড়ীই খাঁ খাঁ করছে জনশূন্য অবস্থায়। মাত্র দিন-দুয়েক আগে একটা দুর্ঘটনা ঘ'টে গেছে গ্রামে। তাই আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে সমস্ত স্বজাতি এবং সেই

সঙ্গে পালিয়ে গেছে রাধা ও ধর্মদাস।......ধর্মদাসের হায়-হায় বাড়ীটার উঠোনের মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে নকুল।

তারপর কেটে গেছে অনেক দিন। পায়ে-পায়ে সে ঘুরেছে উভয় বঙ্গের সমস্ত শহর ও গ্রাম। কিন্তু কোথাও কোনো সন্ধান পায়নি রাধার বা ধর্মদাসের। অবশেষে হতাশ হয়ে সে কলকাতায় এসে ঠাঁই নিয়েছিল। দেখতে দেখতে এই কলকাতাতেই কেটে গেছে সাতটি বছর।

দীর্ঘ সাত বছর ধ'রে কলকাতার পথে পথেও সে অনুসন্ধান করছিল তার মায়ার বস্তুকে, অর্থাৎ তার রাধাকে। ধর্মদাসের কথা সে বড়ো একটা ভাবেনি। কারণ ধর্মদাস ছিল অথর্ব বৃদ্ধ। এতদিনে সে হয়তো মরেই গেছে। কিন্তু রাধা? রাধা তার নিশ্চয়ই মরেনি। হয়তো নকুলের পথ চেয়েই সে অপেক্ষা করছে কোথাও। নকুল তাই আজও বুকের মধ্যে জাগিয়ে রেখেছিল সেই মায়া এবং সেই মায়ার টানেই সে চষে বেড়াচ্ছিল সমস্ত কলকাতা। হয়তো সে-জন্যেই আজ এমন একটা অঘটন ঘটলো প্রকাশ্য রাস্তায়ঃ

প্রতিদিনের মতো আজও সে বেরিয়ে পড়েছিল একতারাটা হাতে নিয়ে। এ-পাড়ার ওই বস্তী সংলগ্ন বাড়ীটার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে আপন মনে গান গাইছিল হয়তো দুটো পয়সারই আশায়। তার গান শুনেই হোক, অথবা দুটো পয়সা দেবার উদ্দেশ্যেই হোক ঘর থেকে বেরিয়ে আসে একটি নারী-মূর্তি। গান গাইতে গাইতে সেদিকে চোখ ফেরাতেই চম্‌কে ওঠে নকুল বাউল। গান তার থেমে যায় তখনই। নারী মূর্তিটিও অবাক

হয়ে দেখতে থাকে নকুলকে। থর-থর করে কাঁপতে থাকে তার রাঙা ঠোঁট দুটি। দুজনেরই চোখে-মুখে অপার বিস্ময়।

এ-অবস্থায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে নকুল। হঠাৎ আনন্দে সে চিৎকার ক'রে ওঠে ঃ

—'রাধা! তুমি, তুমি বেঁচে আছো? আমি যে বছরের পর বছর তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমি যে তোমার গোকুল'............

এই ব'লে সে আবেগের আতিশয্যে হঠাৎ ছুটে গিয়ে একটা হাত ধরে সেই নারীর। আর ঠিক তখনই বেরিয়ে আসে সেই ষণ্ডামার্কা লোকটা। সে একটা ধমক দিয়ে নারীমূর্তিটিকে ভেতরে পাঠিয়ে দেয় এবং তারপর উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে নকুলের ওপর।

ভাবে বিভোর হয়েছিল কাণ্ডজ্ঞান-হীন নকুল। তাই সে দেখেও দেখতে পায়নি—রাধার সীমন্ত জুড়ে জ্বলজ্বল করছিল সিঁদুরের রেখা। সে যে আজ অন্যের বউ!!

এতদিনে সমস্ত মায়া কাটিয়ে উঠলো নকুল। আজ আর পেছনে কোনো বন্ধন নেই তার। কলকাতার পথে-পথে আজ সে সম্পূর্ণ বাউল, মুক্ত পুরুষ।

———

মানিক

ছেলেটা খোঁড়া। বড়ো রাস্তার পাশেই তার বাড়ী। বর্তমানে বয়স তার বছর-এগারো। সম্ভবতঃ খোঁড়া বলেই এতদিন তার পড়াশোনা চলছিল বাড়ীতেই। কিন্তু আজ বাড়ী ছেড়ে সে'ও পা বাড়িয়েছে স্কুলের পথে। বাঁ-পাটা তার সম্পূর্ণ ভাঙা। ভাঙা পায়ে ভর রেখে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে পথ চলে মন্থরগতিতে। এখন সে আর ভয় পায় না, লজ্জা পায় না খোঁড়া ব'লে। কারণ খোঁড়া হলেও, সবাই তাকে স্নেহ করে—যে-স্নেহে কোনো কৃত্রিমতা নেই এবং ভালোও বাসে—যে-ভালোবাসায় কোনো ভেজাল নেই। স্কুলের সময় হলেই তার বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ায় পাড়ার অন্যান্য স্কুল-যাত্রী ছেলেরা। সে'ও প্রস্তুত হয়ে নেমে আসে বাড়ী থেকে। তারপর সবাই মিলে আনন্দে গল্প করতে করতে স্কুলে যায়। আবার স্কুল থেকে ফিরে আসে একইভাবে। পথচলার সময় কেউ তাকে ছেড়ে এগিয়ে যায় না। এমন কি পিছিয়েও পড়ে না কেউ!··· বিকেলেও সে ছেলেদের সঙ্গে পার্কে যায়। ছেলেরা খেলাধূলা করে—সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দ্যাখে। খোঁড়া পা'য়ে সে খেলতে পারে না। তাই খেলাশেষে ছেলেরা তাকে দোলনায় বসিয়ে দোল খাওয়ায়। তারপর সন্ধ্যা ঘনালেই পৌঁছে দিয়ে যায় বাড়ীতে। পাড়ার ছেলেরা তার যথার্থই বন্ধু। ···অবশ্য কেবল ছেলেরা বা তার সম-বয়সীরাই নয়, এ-পাড়ার বয়স্করাও তাকে আদর করে। এমন কি, এ-পাড়ায় যে-ভদ্রলোকের নাম করলে হাঁড়ি ফাটে, তিনিও মাঝে মাঝে এসে চকোলেট দিয়ে যান ছেলেটাকে। ছেলেটা আজ সকলের প্রিয়।

ছেলেটা খোঁড়া হলেও দেখতে বেশ সুন্দর। চোখ দুটো টানা-টানা এবং স্নিগ্ধ। কাঁচা সোনার মতো দেহের রঙ— যে-রঙে ঢেউ খেলছে এক অনুপম কান্তি। অবশ্য পাড়ার লোক তাকে এজন্যেই ভালোবাসে তা' নয়, ভালোবাসে অন্য কারণেঃ বয়স যখন তার আরও অল্প ছিল— তখন বড়ো দুঃখ পেয়েছে ছেলেটা। অকারণেই অনেক নির্যাতন সইতে হয়েছে তাকে। তার সে-দুঃখ বা নির্যাতনের বর্ণনা শোনার মতো কান যদি পাথরের থাকে, তবে পাথরও হয়তো গ'লে যাবে। উপলব্ধির মন যদি পাখিদের থাকে, তবে পাখিরাও হয়তো ভুলে যাবে গান। মাটির বুকেও করুণা জাগবে এবং বাতাসও হবে ব্যথায় কাতর।···

তার শৈশব-অধ্যায়ের মর্মান্তিক ইতিবৃত্ত অর্থাৎ তার সেই দুঃখ বা নির্যাতনের কথা শুনে এ-পাড়ার বাসিন্দাদের মনেও হাহাকার জেগেছিল। তাদের সে-হাহাকারই রূপান্তর লাভ করে মমতায় এবং সে-মমতাও আজ রূপ পেয়েছে ভালোবাসায়। ছেলেটাকে তাই সবাই ভালোবাসে।

ছেলেটার মা-বাপ বেশ অবস্থাপন্ন। এ-পাড়াতেই তাঁদের নিজস্ব বাড়ী আছে এবং আছে স্বচ্ছন্দে সংসার নির্বাহের অর্থ। ছেলেটা যখন বাড়ীর ভেতর থাকে—তখন তাঁরাও তাকে বুকে-বুকে রাখেন এবং যখন বাইরে আসে ছেলেটা—তখন রাখেন চোখে-চোখে। কারণ একমাত্র এ-ছেলেটাই তাঁদের বুকের মাণিক, যে-মাণিক হারিয়ে গিয়েছিল একদাঃ

ধনী মা-বাপের কোলে ছেলেটা যেদিন জন্ম নেয়—সেদিন সে খোঁড়া হয়ে জন্মায়নি। সেদিন তার সমস্ত অঙ্গই ছিল অক্ষত,

সুন্দর এবং ছন্দোময়। সে-সময় তার হীরের হাসিতে আলো ফুটতো, ফুল ফুটতো ঠোঁটের অস্পষ্ট শব্দে এবং তার কান্নার নিক্কণে সৃষ্টি হতো এক দিব্য-মমতার পরিবেশ। সারা সংসার জুড়ে সে যেন লাবণ্যের এক অপূর্ব লীলা।...

ছেলেটার এক দিদি ছিল। এ-দিদিকেই সবচাইতে ভালো-বাসতো ছেলেটা। সারাক্ষণ সে থাকতে চাইতো দিদির কাছে

কাছেই এবং দিদিও একমুহূর্তের তরে সঙ্গ ছাড়া করতো না তার সোহাগী ভাইটিকে। ভাই-বোনের এই উচ্ছল সুষমায় কূলে কূলে ভ'রে উঠতো মা-বাপের মনের নদ-নদী—যার ঢেউয়ের চূড়ায় নেচে নেচে ক্রমেই বেড়ে উঠতে থাকে ছেলেটা এবং দিদিও ছাড়িয়ে আসে তার কৈশোরের খেলাঘর।

দেখতে দেখতে ছেলেটা যখন তিন বা সাড়ে তিন বছরের কোঠায় এসে দাঁড়ায়, তার দিদিও তখন পূর্ণ যুবতী। অতএব দিন-কয়েকের মধ্যে অতি স্বাভাবিক কারণেই তার দিদির বিয়ে হয়। হাওড়ায় মার্টিন-লাইনের কোনো এক ষ্টেশনের কাছে স্বামীর ঘর। দিদি তার সেখানেই যায়। দিদির অভাব অত সহজে সহ্য করতে পারে না ছেলেটা। দিন-রাত কেবল কাঁদে। তাই তার মা-বাপ মাঝে-মাঝেই তাকে পাঠাতে সুরু করেন তার দিদির কাছে। দিদিও আসে কলকাতার বাড়ীতে। দিদিকে সব সময় না পেলেও, মাঝে-মাঝে এভাবেই পাওয়ার মধ্যে অভাববোধ খানিকটা কমে। ছেলেটার কান্না থামে এবং তার দিদিও সান্ত্বনা পায়। ···দিন আবার চলতে থাকে আগের মতোই। তিন বা সাড়ে তিন বছরের কোঠাও অতিক্রম ক'রে ছেলেটা এবার পা রাখে সাড়ে পাঁচ বছরের মাথায়। ঠিক এ-সময়ে হঠাৎ সকলের অলক্ষ্যেই এমন একটা দিন আসে—যে-দিনের আলো প্রখর থাকা সত্ত্বেও হারিয়ে যায় ছেলেটা। হারিয়ে যায় সে কলকাতার বাড়ী থেকেই।

ছেলেটা হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ায় সাড়া প'ড়ে যায় সমস্ত পাড়ায়। আর্তনাদ ক'রে ওঠে মা-বাপ। আর তার দিদিও হাহাকার ক'রে ওঠে শ্বশুর বাড়ীতে। গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে শহরে, সারা ভারতের সমস্ত তল্লাটে অনুসন্ধান চলে। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। কিন্তু

কিছুতেই কিছু হয় না। সন্ধান পাওয়া যায় না ছেলেটার। সারা ভারতের সতর্ক পুলিশ-বাহিনীও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় এ-ব্যাপারে। ফলে মা হন অর্ধ-উন্মাদিনী। বাপের ঋজু মেরুদণ্ড যায় বেঁকে এবং শোকে দুঃখে ভেঙে পড়ে তার দিদিও। তারপর একে একে আবার গত হতে থাকে ম্রিয়মাণ দিনগুলি।

ছেলেটা তবে কোথায়? ছেলেটা মরেনি। সে'ও তখন দুঃসহ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিল বহুদূরের কোনো। এক গভীর জঙ্গলে। জঙ্গলটার নির্দিষ্ট ঠিকানা ছেলেটা আজ বলতে পারে না। কী-ভাবে ও-জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে সে পড়ে—সে-কথাও তার মনে নেই। তবে স্পষ্ট মনে আছে জঙ্গলের সেই আখড়াটার কথা: চারদিকে গভীর জঙ্গল, মধ্যে বৃহৎ একটা খড়ের ঘর। ঘরের মধ্যে প'ড়ে আছে অজস্র কানা, খোঁড়া এবং বিকলাঙ্গ ছেলে-মেয়ে। তাদের আশেপাশে অবিরাম বিচরণ করছে জন-কয়েক লোক। যমদূতের মতো ভয়ঙ্কর তাদের চেহারা এবং রক্তবর্ণ চোখে পিশাচের দৃষ্টি। উঃ! সে যেন এক ভয়ের রাজত্ব। ভয়েই অনেকবার জ্ঞান হারিয়েছিল ছেলেটা এবং আতঙ্কেই সে কথা বলতে পারেনি অনেকদিন।

এই ভয়াবহ আখড়ার মধ্যেই কিছুদিন প'ড়ে থাকতে হয় ছেলেটাকে। এ-সময় দুর্বৃত্তরা অকারণেই তাকে মারধোর করে এবং নৃশংসভাবে ধারালো অস্ত্রের খোঁচায় অজস্র ক্ষতের সৃষ্টি করে তার সমস্ত শরীরে। শুধু তাই নয়, একদিন গভীর রাত্রে জন-কয়েক দুর্বৃত্ত তাকে চেপে ধ'রে তার সজ্ঞানেই ভেঙে দেয় বাঁ-পাটা। আচম্‌কা একবার চিৎকার ক'রেই সে বুঝি অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তারপর জ্ঞান হতেই সে অনুভব করে যে-কঠিন যন্ত্রণা—

তা' আজ প্রকাশ করার মতো কোনো ভাষা নেই ছেলেটার মুখে এবং ভাষা নেই আজ আমারও। মানুষরূপী পশুদের যে-পৈশাচিক লীলা সেখানে চলছিল এবং তাদের হিংস্র পীড়নে অকারণেই যে-নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছিল সেদিন সাড়ে পাঁচ বছরের নিষ্পাপ ছেলেটা, তা' আজ যে-ভাষায় আমি প্রকাশ করতে চাই—সে-ভাষার সন্ধান আজও পাইনি। হয়তো তা' আবিষ্কার হয়নি আজও। তাই বাধ্য হয়ে আমিও এখানে প্রকাশ করছি আমার অক্ষমতা।

দীর্ঘদিন পর ছেলেটার ভাঙা পায়ের ব্যথা যখন খানিকটা ক'মে আসে, সারা দেহে গলিত ঘা হয়ে ফুটে ওঠে ক্ষতগুলো এবং অনাহার, অনিদ্রা ও অত্যাচারের ফলে দেহের চামড়া ঠেলে বেরিয়ে আসে ক্ষীণাস্থির কাঠামো—তখন অন্য সকলের সঙ্গে তাকেও পাঠানো হয় ভিক্ষা করতে। দুর্বৃত্তদের কঠিন প্রহরার মধ্যে থেকে শহরে শহরে, গঞ্জে গঞ্জে, হাটে-বাজারে ভিক্ষে ক'রে বেড়ায় ছেলেটা। দেখতে দেখতে এভাবেই কেটে যায় আরও দুটো বছর। তারপর ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে আসে কলকাতায়। হয়তো এতদিনে অতীতের সমস্ত স্মরণশক্তি তার লোপ পেয়েছে ভেবেই হোক অথবা ভুল করেই হোক, দুর্বৃত্তরা অন্য সকলের সঙ্গে তাকেও কলকাতাতে আনে ভিক্ষা করাতে।··· কলকাতায় এসেই ছেলেটা চিনতে পারে এ-জায়গা তার নিজের। এখানেই তার বাড়ী আছে, মা-বাপ আছে, আর আছে খেলার সাথীরা। কিন্তু পা' তার ভাঙা। ভাঙা পায়ে সে ঠিকমতো চলতে পারে না। তাছাড়া আশে-পাশে অনবরতই প্রহরা দিচ্ছে দুর্বৃত্তের দল। তাদের তীক্ষ্ণ চোখ এড়িয়ে পালাবার উপায় তো নেইই, এমনকি

এ-সম্বন্ধে কোন চিন্তা করার সাহসও তার হয় না। কারণ দুর্বৃত্তদের মুখের দিকে তাকালেই সে শিউরে ওঠে আতঙ্কে। তাই কলকাতায় এসেও নীরবে কেবল সে ভিক্ষাই করে দুর্বৃত্তদের নির্দেশে এবং সময়মতো ভিক্ষার পয়সা গুণে দেয় তাদের হাতে। সে আজ এমনই অসহায় যে, বাড়ীর এত কাছে এসেও, বাড়ীটা একবার চোখে দেখার ক্ষমতাও তার নেই।

কলকাতায় বেশ কয়েকদিন কেটে যায়। তারপর দুর্বৃত্তরা কলকাতার পাট চুকিয়ে অন্য সকলের সঙ্গে ছেলেটিকে নিয়ে রওয়ানা হয় অন্য জায়গার উদ্দেশে। হাওড়ার মার্টিন-লাইনের ছোটো ট্রেন ধরেই তারা রওয়ানা হয়। ট্রেনটা পর পর অনেক কটি ষ্টেশন পেরিয়ে অন্য একটা ষ্টেশনে এসে থামতেই ছেলেটা হঠাৎ বুঝতে পারে ঃ এ-ষ্টেশনের কাছেই তার দিদির বাড়ি আছে। মুহূর্তেই মন তার অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু ভাঙা পা নিয়ে ট্রেন থেকে নামার শক্তি তার নেই। তাছাড়া ছদ্মবেশে পাশের সিটেই ব'সে আছে দুর্বৃত্তের দল। তাদের দিকে তাকিয়ে বাধ্য হয়েই সে দমন করে তার মনের অস্থিরতা। কিন্তু ট্রেনটা স্টার্ট নিতেই হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে যায় তার মাথায়। ট্রেনের দরজা খোলাই ছিল। গতি একটু বাড়তেই সে খোলা দরজা দিয়ে হঠাৎ মরিয়া হয়ে গড়িয়ে পড়ে বাইরে। আর একটু হ'লে সে হয়তো ট্রেনের নিচেই পড়তো। কিন্তু ভাগ্য জোরে আটকে যায় প্লাটফর্মের গায়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটাও অতিক্রম ক'রে চ'লে যায় প্লাটফর্মের সীমা।

হঠাৎ ওভাবে গড়িয়ে পড়ায় দেহে-মাথায় বেশ আঘাত পায় ছেলেটা। ট্রেনটার গতি-পথের দিকে ভয়ার্ত্ত চোখ মেলে খানিকক্ষণ সে তাকিয়ে থাকে। তারপর ট্রেনটা সম্পূর্ণ অদৃশ্য

হতেই সে গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে আসে একটা প্রৌঢ় লোকের কাছে এবং কোনো এক বাড়ীর ঠিকানায় তাকে পৌঁছে দেবার

জন্য লোকটাকে সে কাতরভাবে প্রার্থনা জানায়। কিন্তু একটা

পথবাসী ভিখারী ছেলের কথায় লোকটা তেমন কর্ণপাত করে না। ছেলেটা তখন বাধ্য হয়েই অন্য একটা যুবককে ধরে এবং তার কাছেও পেশ করে অনুরূপ প্রার্থনা। যুবকটি ছেলেটার পাশে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কী যেন ভাবে। হয়তো ছেলেটার এই কাতর প্রার্থনা কিছুটা কৌতূহলের উদ্রেক করে তার মনে। তাই সে পরক্ষণেই একটা রিক্সা ডেকে ছেলেটাকে তুলে নেয় পাশে। তারপর ছেলেটার নির্দেশিত বাড়ীর কাছে এসে তারা নামে। বাড়ির কড়া নাড়তেই দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন একটি মহিলা যুবকটি ছেলেটাকে দেখিয়ে মহিলাটিকে উদ্দেশ ক'রে বলে :

—"এই ছেলেটা সম্ভবতঃ ভিখারী এবং খোঁড়া। সে ঠিকমতে হাঁটতে পারেনা। আপনাদের এই বাড়ীতে আসার জন্য সে কাতরভাবে আমার সাহায্য চাইছিল ষ্টেশনে। তাই আমি তাকে পেঁৗছে দিলাম। আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন—সে কী চায়?"

মহিলাটি এ-কথায় বেশ একটু অবাক হয়ে ওঠেন এবং খানিকটা বিরক্তির সুরে তারপর বলেন :

—"কী ব্যাপার? এমন ছেলে আবার আমাদের বাড়ী আসতে চাইবে কেন? ওকে তো আমি চিনি না!"

ছেলেটা এতক্ষণ মহিলাটির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। এবার মহিলাটির কথা শুনেই তার চোখ ফেটে জল নামে এবং ওভাবেই সে হঠাৎ একবার ব'লে ওঠে :

—"দিদি তুমি আমাকে চিনতে পারছো না?"

মহিলাটি এবার চমকে ওঠেন আকস্মিকভাবে। তার রক্তের শিরায় শিরায় যেন আলোড়ন তোলে ছেলেটার এ-প্রশ্ন : দিদি আমাকে চিনতে পারছো না?......কোথায় যেন কিসের ছোঁয়

লাগে! তাই সত্যই এবার চঞ্চল হয়ে ওঠেন এ-মহিলা এবং তাঁর বিভ্রান্ত দৃষ্টি এবার তিনি নামিয়ে আনেন ছেলেটার মুখের কাছে। তারপর একসময় হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠেন এবং ঝাঁপিয়ে প'ড়ে জড়িয়ে ধরেন ধূলি-ধূসর ক্ষত-লাঞ্ছিত ছেলেটাকে। সে তো ভিখারী নয়, সে যে তাঁর ভাই—তাঁর সোহাগী ভাইটি!

মাণিক আজ অক্ষত নয়, তবু সে মাণিকই। আবার সে ফিরে এসেছে মা-বাপের বুকে। বাপ আবার সোজা হয়ে দাঁড়ান তাঁর বাঁকা মেরুদণ্ড টান ক'রে এবং অজস্র অর্থের বিনিময়ে সুরু করেন ছেলের চিকিৎসা। ছেলেটার দেহের ক্ষত সারে। সুঠাম স্বাস্থ্যের গভীরে ডুবে যায় ক্ষীণাস্থির কাঠামো এবং তার সারা মুখে আবার ফিরে আসে অতীতের অনুপম কান্তি। কিন্তু ভাঙা পা আর জোড়া লাগে না। হয়তো জোড়া আর লাগবে না।

তবে জোড়া লেগেছে ভাঙা সংসার এবং ছেলেটার চোখের জলের সঙ্গে তার মা বাপ ও তার দিদির চোখের জলেরও মিলন ঘটেছে অলক্ষ্যেই। এই মিলিত অশ্রুর বাষ্পই আজ মেঘ হয়ে জেগে আছে আকাশে। একদিন এ-মেঘেই যে বিদ্যুৎ জাগবে—তার আগুনেই যেন জ্বলে যায় নির্বিকার বিধাতা এবং তার দুর্বৃত্তের পৃথিবী।

আস্তে আস্তে পা ফেলো

পর পর একাধিক বস্তি আজকাল এক হয়ে সামিল হয়েছে এক পাড়ায়। পাড়াটা বেশ সাজানো। সরু পথে ফুটপাথ নেই। তবু পরিপাটির অভাব ঘটেনি কোথাও। টালি-খোলার ঘরগুলো সবই সংস্কার সাধিত। প্রায় ঘরেরই ইঁটের দেয়াল। প্রায় বাড়ীরই সামনে বাগান—যেখানে ফুল ফোটে, ফলও ধরে ঃ মনে হয় ঃ এ যেন বস্তি নয়, বৃহৎ এলাকা জুড়ে লতা-পাতায় ঘেরা এক আশ্রম। এখানে জীবনের সঙ্গে যেন জীবনের যোগ আছে এবং যোগাযোগের মধ্যেই যেন অনাড়ম্বর সংসারেও উন্মেষ ঘটেছে জ্ঞানের, শান্তির, আনন্দের।......

অথচ কী আশ্চর্য, আজ এমন একটা পাড়ার মধ্যেও নেমে এসেছে বিষাদের ছায়া। আজকের ভোরটাই যেন মূর্তিমান শোক এবং হাওয়া যেন তার মনের হা-হুতাশ। পাড়ার পুরুষরা আজ কাজে বেরোয়নি। মেয়েরা উনোন জ্বালেনি। ছেলেরা খেলতে নামেনি। আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা—সবাই এসে আজ জড়ো হয়েছে এক জায়গায়—যেখানে প্রাচীন তালগাছটার ঠিক পাশেই লাউপাতার সবুজ ঘোমটা প'রে দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘর। ঘরটার দরজা খোলা। ভেতর থেকে ভেসে আসছে ধূপের ধোঁয়া। পাড়ার যুবকরা দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশেই। বৃদ্ধরা ব'সে পড়েছে মাথায় হাত দিয়ে। ঘরের দরজার দিকেই শোকাচ্ছন্ন চোখ ফিরিয়ে একসঙ্গে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েরা। তাদের পাশে শিশুরাও আজ নিশ্চল। কারো মুখে কোন কথা নেই। কিন্তু চোখে জল। এ-জলের ছোঁয়া লেগে

হঠাৎ ম্লান হয়ে উঠেছে ভোরের আলো এবং দুঃসহ ব্যথায় ভারি হয়ে উঠেছে বাতাস। আকাশটাও থমথমে। পাড়ার পায়রাগুলোও আজ নিঃশব্দে এসে সার হয়ে বসেছে ঘরের চালে। ওরাও আজ আর ডাকে না, ডানা মেলে ওড়ে না। কারণ দাশরথি দাস আজ মারা গিয়েছে। তার মৃত্যুর খবর পেয়েছে সবাই।

কে এই দাসরথি দাস? তার মৃত্যুতে কেন এত শোক! সে কি কোনো দানশীল ব্যক্তি? না। দান করার মতো ঐশ্বর্য তার ছিল না। সে ছিল দীন-দরিদ্র। তবে কি রাজনৈতিক নেতা? না, তাও নয়। সে রাজনীতি বুঝতো না। নেতৃত্ব করার মতো কোনো শিক্ষা বা যোগ্যতাও তার ছিল না। তবে কি দেশ-কর্মী? হ্যাঁ, সে একজন কর্মীই। তবে দেশের নয়, কেবল এই পাড়ার। এ-পাড়ার মাটির সঙ্গেই ছিল তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মাটিকে সে প্রাণ দিয়েছে। প্রাণে এনেছে গান এবং গানে গানেই প্রেরণার প্রাচুর্য জাগিয়েছে সমস্ত পাড়ায়। পাড়ার বিভিন্ন অংশে তার অক্লান্ত পরিশ্রমই সুন্দর সংস্কার হয়ে জেগে আছে। তার সৃষ্টিধর্মী ইচ্ছাই ফুল এবং ফল হয়ে ফুটে আছে। আর তার স্বপ্নই আজ ভালোবাসার রেণু ছড়িয়েছে এ-পাড়ার পথে-ঘাটে। তার আকস্মিক মৃত্যুতে আজ তাই এত শোক, চোখে চোখে বর্ষার সূচনা।

আজ থেকে ষোলো বা সতেরো বৎসর আগে দাশরথি ছিল উত্তরবঙ্গের কোনো এক গ্রামে। সেখানেই হঠাৎ এক ভয়াবহ মহামারীর কবলে নিজের মা-বাপ এবং সেই সঙ্গে তার প্রাণাধিকা স্ত্রীকেও সে হারায়। তারপর দেড় বৎসরের এক কঙ্কালসার শিশু-কন্যাকে বুকে চেপে সে ভেসে আসে কলকাতায় এবং

কলকাতার পথে পথেই তার দিন কাটতে থাকে ব্যর্থ অন্বেষায়। এ-সময় তার নিজের আহার তো দূরের কথা, বুকের শিশু-কন্যাটির জন্যেও একমুঠো আহার সে জোটাতে পারতো না। ফলে নিস্তেজ শিশুটি একদিন সকালবেলা তার বুকের মধ্যেই ত্যাগ করে শেষ নিঃশ্বাস। সেদিন মরা শিশুকে কোলে নিয়ে ফুটপাথে বসেই সে দিনমান কাঁদে। তারপর সন্ধ্যার সময় পৌরসভার লোক এসে

তার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় শিশুকে। ঠিক এমন সময় ঘটনাচক্রেই তার সঙ্গে আলাপ হয় এক গরীব শ্রমিকের। শ্রমিকটি গরীব, কিন্তু দরদী। দাশরথির সব কথা শুনে, সে তাকে নিয়ে আসে বর্তমান পাড়ায় এবং আশ্রয় দেয় নিজেরই ঘরে। হায় রে! এ-আশ্রয় আর মাত্র একদিন আগে পেলেও তার বুকের শিশু-কন্যাটি হয়তো মরতো না।

এ-পাড়াটা তখন ছিল পর পর কয়েকটি বস্তিতে বিভক্ত এবং

প্রত্যেক বস্তিই যেন এক একটি আঁস্তাকুড় বিশেষ। ময়লা আবর্জনা এবং নর্দমার উপচে ওঠা পচা কর্দমের মধ্যেই যেন হাজার হাজার পোকার মতো কিলবিল করছে অজস্র নরনারী। তবু এখানেই একটা আশ্রয় পেয়ে বর্তে যায় দাশরথি। যে-শ্রমিকটি তাকে আশ্রয় দিয়েছে—সেও একা। অতএব একজনের রোজগারে দু'জনের খাওয়া-খরচ কোনোমতে চলে যায় এবং দেখতে দেখতে বেশ খানিকটা সুস্থ হয়ে ওঠে দাশরথি। এ-সময় তার বয়স সম্ভবতঃ পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশের মধ্যে। সুতরাং যৌবনের শক্তি তখনো বজায় আছে ব'লে সুস্থ হয়েই সে বেরিয়ে পড়ে কাজের অন্বেষণে। কিন্তু কলকাতার বাজারে তার জন্যে কাজ খালি নেই কোথাও। পর পর অনেকদিন এভাবে ব্যর্থ হয়ে, শেষে একদিন সে তার আশ্রয়দাতা শ্রমিকটির সঙ্গেই তার কারখানায় যায় এবং অনেক কষ্টে দেখা করে উক্ত কারখানার ম্যানেজারের সঙ্গে। ম্যানেজার চোখ না তুলেই স্পষ্ট বলেন ঃ

—"এখানে কোনো কাজ খালি নেই।"

দাশরথি তবু অনুনয় ক'রে বলে ঃ

—"সাহেব, বড় কষ্টে পড়েছি। যেভাবেই হোক, দয়া ক'রে একটা ব্যবস্থা করুন।"

ম্যানেজার এবার চোখ তুলে তাকান এবং একবার লক্ষ্য করেন দাশরথির আপাদ-মস্তক। তারপর কী যেন ভেবে আবার বলেন ঃ

—"না, কারখানায় কোনো কাজ নেই। তবে আমার বাড়ীতে কাপড় কাচা ও বাসন মাজার জন্য একটা লোকের দরকার। কাল সকালে তুমি আমার বাড়ীতে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করো।"

কাপড় কাচা আর বাসন মাজার কথা শুনেই হঠাৎ চমকে ওঠে দাশরথি। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে ঃ

—"সাহেব, আমি লেখাপড়া শিখেছি। এ ধরণের কাজ আমার পোষাবে না।"

ম্যানেজার এবার ভ্রূ-কুঁচকে তাকান। তারপর বলেন ঃ

—"লেখাপড়া শিখেছ! কতদূর পড়েছ হে ?"

—"আজ্ঞে, ম্যাট্রিক পর্যন্ত।"

—ম্যাট্রিক পাশ করেছ ?"

—"আজ্ঞে না।"

ম্যানেজার এবার সশব্দে হেসে ওঠেন এবং বলেন ঃ "একে লেখাপড়া শেখা বলেনা। তুমি থাকো কোথায় ?"

ম্যানেজারের তাচ্ছিল্য ভরা চোখের দিকে তাকিয়েই দাশরথি এবার উত্তর দেয় ঃ—"পূব-পাড়ার বস্তিতে।"

বস্তির কথা শুনেই আরেকবার তিনি হেসে ওঠেন। তারপর চটুল বিদ্রূপের সুরে বলেন ঃ—"বস্তিতে ? মানে সেই নোংরা বস্তির লোক তুমি ? তবে কাপড় কাচা ও বাসন মাজায় এত বিরাগ কেন তোমার ?"

দাশরথি নিজেকে আর সামলাতে পারে না। বেশ একটু চড়াগলায় এবার বলে ঃ—"কেন সাহেব, বস্তিতে থাকি বলেই কি আমাদের কোনো ইজ্জৎ নেই ?"

ম্যানেজার তেমনই বিদ্রূপের সুরে জবাব দেন ঃ "ইজ্জৎ ? নিশ্চয়ই আছে। বনে বনমানুষের যেমন ইজ্জৎ, ঠিক তোমাদেরও তেমনই—বুঝলে হে ?"—তারপর দরজার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রে বলেন ঃ "এবার যেতে পার।"

ম্যানেজারের ঘর থেকে সেদিন ব্যর্থ আক্রোশ নিয়ে ফিরে

আসে দাশরথি। তার আশ্রয়দাতা শ্রমিকটি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে :

—"দুঃখ ক'রোনা। তোমার কোনো কাজ নেই, কিন্তু আমার তো আছে। যতদিন তোমার কোনো গতি না হয়—ততদিন আমরা একসঙ্গেই থাকবো।"

কিন্তু শ্রমিকটি তাকে সান্ত্বনা দিলেও, মন তার শান্তি পায় না। সে ভাবে : সত্যিই তো বস্তি এত নোংরা কেন ? কেন বস্তিবাসীরা মদ খেয়ে পয়সা নষ্ট করে এবং তাদের ছেলেমেয়েরাই বা লেখাপড়া শেখে না কেন ? মনে মনে সংকল্প নেয় : নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকবে না, কাজ সে করবেই। তবে বাইরে নয়, বস্তির মধ্যেই। এখানেই সে একটা স্কুল গড়বে এবং লেখাপড়া শেখাবে বস্তির ছেলে-মেয়েদের।···অনেক ভেবে-চিন্তে সে বস্তির সর্দারদের সঙ্গে দেখা ক'রে তার সংকল্পের কথা জানায়। তার কথা শুনে সর্দাররা প্রথমে হেসে উঠলেও, শেষে উপলব্ধি করে : তারা বস্তিবাসী এবং নিরক্ষর হলেও তাদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে আপত্তি কী ? অন্ততঃ এ ব্যাপারে চেষ্টা করতে দোষ নেই। সুতরাং বস্তির মধ্যবর্তী একখণ্ড পতিত জমির মধ্যেই তারা গ'ড়ে তোলে একটা একচালা ঘর এবং দাশরথিকে ডেকে তা অর্পণ করে। দাশরথি এই চালাঘরেই সুরু করে তার স্কুল। ম্যাট্রিক পর্যন্ত সে পড়েছে। সুতরাং নিরক্ষর ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে ও-বিদ্যাই তার যথেষ্ট। প্রথমতঃ দশ, তারপর কুড়ি এবং কুড়ির পরে ত্রিশটি ছেলে-মেয়েকে নিয়েই জমে ওঠে স্কুল।

স্কুল চলতে থাকে। ছাত্র-ছাত্রী ত্রিশজনের বেশি আর না বাড়লেও, হাল ছাড়েনা দাশরথি। তার আন্তরিক শিক্ষার গুণে

ত্রিশজনের অনেকেই বেশ উন্নতি করে লেখাপড়ায় এবং দেখতে দেখতে এভাবেই কেটে যায় তিনটি বছর। তিন বছর পর অগ্রগামী ছাত্র-ছাত্রীদের সে বস্তির স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজ তাগিদেই শহরের অন্য এক সম্ভ্রান্ত স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয় আরও অধিক শিক্ষার আশায়। তার ছাত্র-ছাত্রীরা উক্ত স্কুলে যাতে বিনা খরচায় পড়তে পারে—এমন ব্যবস্থাও সে করে স্কুল-কর্তৃপক্ষের হাতে-পায়ে ধরে। তার এই নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা লক্ষ্য ক'রে এবং বস্তির ছেলে-মেয়েরা আজ ভদ্রঘরের ছেলে-মেয়েদের মতোই শহরের সম্ভ্রান্ত স্কুলে যাতায়াত করছে দেখে বস্তির নিস্পৃহ লোকেরাও এবার একসঙ্গে উৎসাহিত হয়ে ওঠে এবং দলে দলে তাদের ছেলে-মেয়েদেরও পাঠাতে সুরু করে দাশরথির কাছে। দেখতে দেখতে এবার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ভ'রে ওঠে দাশরথির বস্তির স্কুল। ছা-ত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় আড়াইশ'। বস্তির সর্দাররা খুশি হয়েই স্কুলঘরের পরিসর বাড়িয়ে দেয় এবং দাশরথির পক্ষে এবার একা সমস্ত স্কুলটা পরিচালনা করা সম্ভব নয় বলে বস্তির যুবকরাও এসে যোগ দেয় তার সঙ্গে। যদিও শিক্ষাদানের কাজটা একা তাকেই চালাতে হয়, তবু এবার তার বুক ভ'রে ওঠে এবং অন্ততঃ আংশিক সাফল্যের আনন্দে স্নিগ্ধ হাসি ফোটে তার ঠোঁটে।

বস্তির যুবকরা এতদিন নির্বিকার ছিল। কিন্তু তারাও এবার এগিয়ে আসায় দাশরথির শক্তি যেন অনেক বেড়ে যায়। যুবকদের নিয়েই সে গ'ড়ে তোলে একটা নতুন সংগঠন এবং তার জোরেই একাধিক বস্তিকে সে একপাড়ার সামিল করে অনায়াসে। তারপর প্রত্যহ স্কুল ছুটির পর এই সংগঠনকেই পাশে রেখে সে হাত দেয় বস্তি সংস্কারের কাজে। দিনের পর দিন যায়। ধীরে

ধীরে নতুন হয়ে গ'ড়ে উঠতে সুরু ক'রে পাড়াটা। দিনে দিনে সংস্কার সাধিত হয় বস্তিবাসীদের ভাঙা ঘর। রাস্তাঘাট নতুন রূপ পায়। খানা-ডোবা ভরাট হয়। তারপর ভরাট অংশেই দোল খায় শাকসব্জির শ্যামলিম বাহার। দেখতে দেখতে পাড়ার সমস্ত অংশেই প্রকাশ পায় একটা আশ্চর্য পরিবর্তন। এ-পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে অবাক হয় সমস্ত বস্তিবাসী এবং ভাবে: এতদিনে কোন্ পুণ্যের ফলে তারা উদ্ধার পেলো নরক থেকে!

সময় এগিয়ে চলে। দাশরথির কাজ তবু কমে না। বিশ্রাম তার নেই। চোখ থেকে উধাও হয়ে গেছে ঘুম। কেবল কাজ আর কাজ। কাজের নেশাই তাকে পেয়ে বসেছে। যার ঘরে চাল বাড়ন্ত—তার আহারের ব্যবস্থা করে দাশরথি। রোগে আক্রান্ত হয়ে যে কাতরভাবে আর্তনাদ করে—সে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। যে গরীব শিশুর দুধ জোটে না—সে তার দুধ আনে রেডক্রশের অফিস থেকে। সংগঠনের সাহায্যেই সে চাঁদা তোলে এবং চাঁদার পয়সায় ওষুধ কেনে। তারপর বিতরণ করে বস্তি-বাসীদের মধ্যে। এভাবেই একটার পর আরেকটা কাজে নিজেকে সে ব্যাপৃত রাখে অক্লান্ত। এ-পাড়াকে সে ভালোবাসে এবং মায়ের মতো ভক্তি করে এ-পাড়ার মাটিকে। তাই আজীবন কেবল সেবা করতে চায়। বিশ্রাম চায় না। লোকে বলে: দাশরথি স্বয়ং একটা!শক্তি। সে এ-পাড়ায় না এলে এ-মাটি জাগতো না; ঘুম ভাঙতো না যুবকদের; প্রাণ পেতো না আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা এবং ফুলে ফলে অপরূপ হ'য়ে হেসে উঠতো না এ-পাড়ার পরিবেশ।......লোকের এই কথা বলার ছন্দেই আরামে গড়িয়ে চলে দিন।

তারপর আরও অনেক কাল কেটে যায়। দিনে দিনে আরও

শ্রীবৃদ্ধি ঘটে পাড়ার। একে একে দাশরথির অজস্র ছাত্র-ছাত্রী স্কুলের পর কলেজের পাঠ শেষ ক'রে হার বাড়ায় শিক্ষিতের, মর্যাদা বাড়ায় বস্তির। পঁয়ত্রিশ বা ছত্রিশ বৎসরের সেই দাশরথিও আজ পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ায় পঞ্চাশের মাথায়। এখানেও সে থামতে চায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে থামতেই হলো হঠাৎ এক অসুখের ডাকে। পাড়ার সমস্ত নরনারী আবার তাকে ফিরে পেতে চাইলো আকুলভাবে, কিন্তু সম্ভব হলো না!
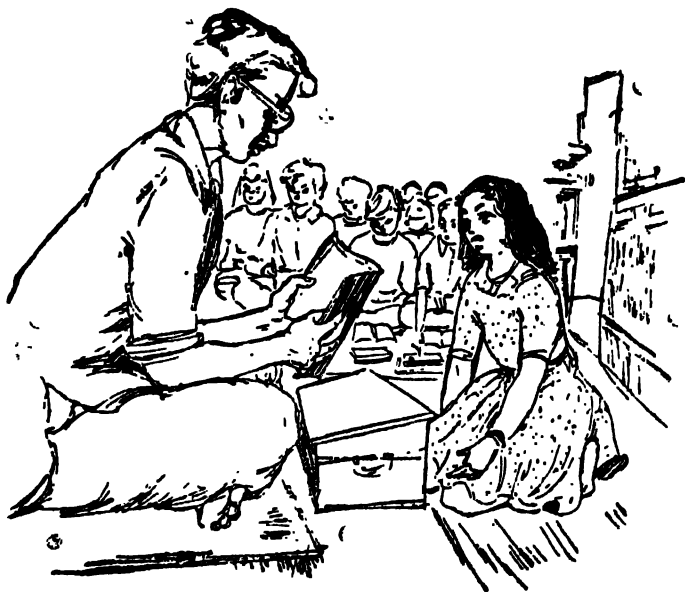
তার অতিপ্রিয় যুবকদের স্কন্ধে বাহিত হয়ে আজ সে চলে যাচ্ছে তার ভালোবাসার পাড়া ছেড়ে, তার মায়ের মতো মাটিকে পেছনে ফেলে। এ-পাড়ায় আর সে আসবে না। এ-মাটি আর পরশ পাবে না তার।......হে যুবকগণ, আস্তে আস্তে পা ফেলো, সে ঘুমিয়ে আছে তোমাদের কাঁধে—তার ঘুম যেন না ভাঙে!

একটি দিনান্তের ছবি

শহরের একপ্রান্তে ছোট একটা পার্ক। মালীর যত্ন আছে এখানেও। তাই ফুল ফুটেছে, শীতকালের ফুল। ফুলে ফুলে বিচিত্র রঙ এবং রঙে রঙে আলোর নাচন দেখছে মেঘের আল্পনা আঁকা আকাশটা। সূর্য-টা হাসতে হাসতে হেঁটে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে।··· গোটাকয় গাছও রয়েছে পার্কের এদিকে-ওদিকে। গাছগুলো সব একই জাতের এবং উচ্চতাতেও এক। এগুলো যেন সূর্যের শেষ রসিকতায় বেশ চটুল হয়ে উঠেছে এবং নটীর মতো দোল খাচ্ছে সখীর মতো হাওয়ায়।

পার্কের পশ্চিম দিকটায় সম্ভ্রান্ত বসতি : কিন্তু উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ দিক অনেক দূর পর্যন্ত ফাঁকা। তাই পার্কে দাঁড়িয়ে তিন-দিকের তিনটে দিগন্তকে মনে হয় ত্রি-কোণ আয়নার মতো—যার গায়ে-গায়ে নানা দৃশ্যের বিম্বিত ছায়া দৃষ্টিকে যেমন উদাস করে তেমনই মনে জাগায় পুলক। অবশ্য তৃষ্ণাও জাগায়, অন্তহীন তৃষ্ণা। মনে হয় : (কী যেন নেই, কী যেন চাই। এই 'কী-যেন চাই'-টা যে সত্যই কী-বস্তু—তা কেউ জানে না। অথচ এর প্রতি সব মনেরই আকর্ষণ চিরন্তন। সব-কিছু পাওয়ার পরেও এ-চাওয়ার শেষ হয় না। তাই জীবন সম্ভবতঃ চিরদিনই কাঙাল এবং এই কাঙালপনা আছে ব'লেই হয়তো মানুষ আজ শিল্পী, কবি, দার্শনিক, এবং প্রেমিক।)

পার্কটা ছোট্ট হলেও, সুন্দর এবং বিকেলটাও আজ মধুর। অথচ কেন জানি না, পার্কে আজ ভীড় নেই। কেবল পশ্চিম দিকের রেলিঙ ঘেঁষে কয়েকটি অর্ধ-উলঙ্গ ভিক্ষাজীবী ছেলে-মেয়ে

ব'সে আছে। হয়তো দিনের এই অবসরে ব'সে-ব'সেই তারা খেলা করছে আপন মনে। আর আড়াই বছরের একটি ফুটন্ত শিশুর হাত ধ'রে এইমাত্র পার্কে প্রবেশ করেছে একটি মাত্র সম্ভ্রান্ত দম্পতি। দম্পতির বয়স খুব বেশী নয়। বিশেষ ক'রে

স্বামীটি দেখতে বেশ তরুণ। পরনে তাঁর অতি মূল্যবান পোষাক। অথচ তা সত্ত্বেও মনে হয় না যে, তিনি খুব আত্ম-সচেতন বা তাঁর কোনো অহমিকা আছে। বড়ো সরল, বড়ো সুন্দর তিনি। দিগন্তের মতো প্রশস্ত ললাট, মন্দিরের অনুপম চূড়ার মতো উন্নত

নাসা এবং গানের মতো তাঁর প্রসন্ন চোখ— যে-চোখের মদির ছায়ায় ধরা পড়েছে তাঁর উদাস মনের প্রতিবিম্ব। হয়তো তিনি শিল্পী কিংবা কবি। অথবা কিছুই নন, কেবল ভাবুক। শিশু ও স্ত্রীর সঙ্গে পার্কে প্রবেশ ক'রেই তিনি গাছে-গাছে উন্মুখ ফুলের আশে-পাশে বার-কয়েক পায়চারী করেন মৃদু-পদক্ষেপে। তারপর কোনো একটা ফুলগাছের পাশে দাঁড়িয়েই হঠাৎ তাঁর উদাস দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন দক্ষিণ দিগন্তে। তাঁর ঠোঁটের ললিত রেখায় ফুটে ওঠে সুন্দর স্বপ্নের মতো হাসি। শীতের সোহাগী হাওয়া সস্নেহে এসে হাত বুলোতে সুরু করে তাঁর মাথায়!

স্ত্রীটিও সুন্দর। তবে নাইলনের নির্লজ্জ পোবাক তাঁর দেহের সৌন্দর্যকে ব্যাহত করেছে অনেকাংশে। তাছাড়া তাঁর মুখমণ্ডলেও বেশ খানিকটা বিকৃতি এনেছে ঠোঁটের টক্‌টকে লাল রঙ, অর্থাৎ লিপষ্টিক। লিপষ্টিকেব উগ্র প্রভাবে তাঁব টানা-টানা চোখ দুটির কমনীয়তা যেমন হারিয়ে গেছে, তেমনই কাঁচা সোনার মতো তাঁর মুখের রঙও ম্লান হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ। হয়তো কেবল ব্যবহার করার আনন্দেই তিনি ব্যবহার করেছেন লিপষ্টিক; কিন্তু লিপষ্টিকের অসুন্দর রঙ যে হরণ করেছে তাঁর প্রশংসা করার মতো কান্তি—তা তিনি বুঝতে পারেননি। তাই মনে হয়, স্ত্রীটি বড়ো বোকা। তাঁর এই বোকামির প্রতি সত্যই করুণা হয়।

আড়াই বছরের ফুটফুটে শিশুটির হাতে ছোট্ট একটি বল গুঁজে দিয়ে স্ত্রীটি তাকে ছেড়ে দেন পার্কে। তারপর নাইলনের আঁচল হাওয়ায় উড়িয়ে বারকয়েক তিনি এদিক-ওদিক ফিরে তাকান। হয়তো এভাবে তিনি নিজেকেও দেখবার চেষ্টা করেন। কিন্তু পশ্চিম রেলিঙের ধারে একমাত্র ভিক্ষাজীবী ছেলে-মেয়েরা ছাড়া তাঁকে দেখার মতো নতুন কেউ আর পার্কে নেই। ভিখারী ছেলে-

মেয়েরাই তাঁকে দেখলো। তাই ওদেরই মধ্য থেকে ধূলি-ধূসর অর্ধ-নগ্ন একটি ছেলে স্ত্রীটির কাছে ছুটে এসেই হাত পাতে। তারপর অনুনয় ক'রে বলে ঃ

—"মা, ছুটো পয়সা দিন।"

ছেলেটির দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠেন স্ত্রীটি। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি চাপা গলায় একটা ধমক দেন। ধমক খেয়েই ছেলেটি পিছিয়ে আসে কয়েক পা, কিন্তু সরে যায় না। খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে এবার সে তাকিয়ে থাকে আড়াই বছরের ফুটফুটে শিশুটির দিকে। কিন্তু স্ত্রীটির কাছে সম্ভবতঃ এ-দৃশ্যও ঠিক সহ্য হলো না। তাই তিনি ছুটে এসেই এবার চড়া গলায় একটা ধমক দেন ভিখারী ছেলেটিকে। চড়া গলার ধমক খেয়ে ছেলেটি এবার সত্যই ভয় পায়। তাই আর দাঁড়িয়ে না থেকে এবার সে পালিয়ে আসে রেলিঙের ধারে। স্ত্রীটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাঁর শিশুটিকে একবার টেনে নেন বুকের কাছে। তারপর আবার তাকে ছেড়ে দিয়ে এবার তিনি স'রে আসেন স্বামীর কাছে। তাঁর স্বামীটি তখনো নির্বিকার। উদাস, অথচ কাব্যের মতো ছন্দসী দৃষ্টি তার তখনো নিবদ্ধ দিগন্তের দিকে। পেছনের কোনো ঘটনাই তাঁর গোচরীভূত হয়নি।

শিশুটি তার ছোট্ট বলটি নিয়ে একা একা খানিকক্ষণ খেলে। কিন্তু এভাবে একা একা খেলতে সম্ভবতঃ তার ভালো লাগে না! তাই ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে মায়ের হাত ধ'রে এবার সে টানাটানি সুরু করে। অর্থাৎ মাকে সে খেলার সঙ্গী হিসেবে পেতে চায়। স্ত্রীটি তাঁর শিশুর মনের কথা বুঝতে পারেন। সুতরাং ছোট্ট বলটি নিয়ে তিনি এবার বাধ্য হয়েই খেলতে সুরু করেন শিশুটির সঙ্গে। কিন্তু শিশুর সঙ্গে এ-ধরণের কৃত্রিম খেলা তাঁর পক্ষে বেশিক্ষণ

ভালো লাগবার কথা নয়। অতএব খানিকক্ষণ খেলেই শিশুটিকে আবার একা ছেড়ে দিয়ে তিনি স'রে আসেন স্বামীর কাছে। এমন একজন স্বামী পেয়ে সত্যই তিনি গরবিনী। পাশে দাঁড়িয়ে তিনি আলতোভাবে একটা হাত রাখেন স্বামীর পিঠে এবং অন্যহাতে বেশ

সস্নেহে গুছিয়ে দেন হাওয়ায় এলোমেলো তাঁর মাথার চুল। স্বামীটির তবু খেয়াল নেই। চোখের চাওয়ায় তখনো তিনি পান ক'রে চলেছেন সারা দিগন্তের সুধা।

মা স'রে যাওয়ায় শিশুটি এবার অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ। হয়তো সে মনে-মনে ভাবেঃ মা আবার তার সঙ্গে খেলা করতে আসবেন। কিন্তু বেশ খানিকক্ষণ কেটে যাওয়ার পরেও মা যখন আর কিছুতেই এলেন না, তখন সে বলটি হাতে নিয়ে অন্য সঙ্গীর খোঁজ করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে। হঠাৎ কী বুঝে সে টুক্ টুক্ ক'রে হাঁটতে সুরু করে রেলিঙের দিকে—যেদিকে ব'সে আছে ভিক্ষাজীবী ছেলে-মেয়েরা। খানিকটা কাছাকাছি এসেই সে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর অবাক তুটি চোখ মেলে সে তাকায় দলটার দিকে। তার দিকে এবার দলটারও চোখ পড়ে এবং চোখ পড়তেই শিশুটি এবার ফিক্ করে হেসে ওঠে। তারপর হাতের ছোট্ট বলটি সে সজোরে ছুঁড়ে দেয় নিশ্চিন্তে। ভিক্ষাজীবী ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও এবার সাড়া পড়ে। তারা একসঙ্গে সবাই ছুটে এসে ঘিরে ধরে শিশুটিকে। কেউ কেউ তার গায়ে-মুখে হাত বুলিয়ে অনুভব করে অপরিসীম আনন্দ। শিশুটিও নেচে ওঠে অদ্ভুত খুশি হয়ে। হয়তো এতক্ষণেই সে পেয়েছে তার প্রকৃত খেলার সঙ্গী। অতএব ছোট্ট বলটি নিয়ে এবার সে সুরু করে তার সত্যিকারের খেলা।

কিন্তু ওদিকে শিশুটির মা অর্থাৎ সেই স্ত্রীটি হঠাৎ চমকে ওঠেন সেদিকে তাকিয়ে। তাঁর একমাত্র আদরের শিশু ছোটো সমাজের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলছে দেখে তিনি আর্তনাদ ক'রে ওঠেন। তাঁর এই আকস্মিক আর্তনাদে স্বামীটিও এবার মুখ ফিরিয়ে তাকান। ভিখারী ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে শিশুটিকে সরিয়ে আনার জন্য স্ত্রীটি ছুটে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই স্বামীটি তাঁর হাত ধরেন। তারপর বেশ একটু মিষ্টি হেসে বলেনঃ

—"অত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? তাকে খেলতে দাও। আমাদের

মতো সে বড়ো হয়নি বলেই তার মনটির মধ্যে কোনো কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়নি। তাই মানুষকে সে মানুষের মতোই দেখে।”

এ-পর্যন্ত বলেই তিনি খানিকক্ষণ নীরব থাকেন। তারপর স্ত্রীটির দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হেসে আবার বলেন :

—“ওই ছেলে-মেয়েরা দুঃস্থ, কিন্তু দেখতে যে আমাদের খোকনের মতোই—তা আমরা না বুঝলেও, খোকন বুঝেছে এবং বুঝেছে বলেই সে আনন্দে খেলা করছে ওদেরই সঙ্গে।

এ-কথা শুনে স্ত্রীটি এবার তাঁর অবাক চোখ তুলে তাকান স্বামীর মুখের দিকে। কিন্তু স্বামীটি আর স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে হাসিমুখেই তাঁর মুগ্ধ দৃষ্টি বিস্ফারিত করেন ক্রীড়ারত ছেলে-মেয়েদের দিকে। তাই, এবার যেন আরও ছন্দোময় হয়ে উঠলো সমস্ত পার্কটা।

দেখতে দেখতে সূর্যটা অদৃশ্য হয় পশ্চিমে। পার্কে নেমে আসে আবছা অন্ধকার। স্বামীটি এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন ক্রীড়ারত ছেলে-মেয়েদের কাছে। দুঃস্থ ছেলে-মেয়েদের কারো কারো মাথায় তিনি হাত বুলিয়ে আদর করেন সস্নেহে। তারপর নিজের শিশুটিকে বুকে তুলে পার্ক থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে এবার তিনি হাঁটতে স্থুরু করেন ধীরে ধীরে। শিশুটি বাপের কাঁধের ওপর দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দুঃস্থ ছেলে-মেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ে, হাসে। কিন্তু দুঃস্থ ছেলে-মেয়েদের সমস্ত চোখ অতি করুণ হয়ে ওঠে শিশুটি এবার চলে যাচ্ছে ব'লে। মুহূর্তেই কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়ে পরিবেশটা।

স্বামীর পেছনে পেছনে স্ত্রীটিও হাঁটছিলেন। কিন্তু কী ভেবে

হঠাৎ তিনি থেমে যান। তারপর স্বামীর অলক্ষ্যেই কয়েক পা পিছিয়ে এসে অবোধ ভিক্ষাজীবীদের মাথায় তিনিও একবার হাত বুলোন। তারপর বেশ একটু নিচু গলায় বলেন :

—"চলো আমার খোকন ডাকছে। আজ তোমাদের নেমন্তন্ন!"

স্ত্রীটির কথা শুনে একসঙ্গে উল্লসিত হয়ে ওঠে সবাই এবং মুহূর্তেই আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাদের করুণ চোখগুলি সম্ভবতঃ নেমন্তন্নের লোভে নয়, তাদের খুদে খেলার সঙ্গীটিকে অন্ততঃ আরেকবার পাবে বলেই তারা হাঁটতে শুরু করে আনন্দে তাদের পেছনে পেছনে হাসিমুখে এবার পা চালান স্ত্রীটিও।

আবছা অন্ধকারে হারিয়ে যায় তাঁর লিপষ্টিকের রঙ এবং ম্রিয়মান হয়ে পড়ে নাইলনের অতি-চটুল অস্তিত্ব। অথচ কী আশ্চর্য, কাঁচা সোনার মতো মুখের রঙ তাঁর হারিয়ে গেল না বরং অন্ধকারে আরও উজ্জ্বল হ'য়ে তা ঢেউ খেলে গেল। স্ত্রীটিকে এবার যেন সত্যই মনে হলো অপরূপা।

———

মস্তানের প্রেম

আসুন পায়ে পায়ে একবার পরিক্রমা করি মধ্য কলকাতার ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ার। এর চারদিকের প্রশস্ত ফুটপাথ যদিও পায়ে হাঁটার জন্য তৈরী হয়েছিল এককালে, তবু পায়ে-হাঁটা মানুষ এগুলোকে ঠিক কোনোদিনও ব্যবহার করতে পারেনি। কারণ প্রথম থেকে এগুলোর মধ্যে আস্তানা গড়েছে অধঃপতিতের দল। যদিও রাষ্ট্রের চোখে এরা অমানুষ এবং বেহিসেবী বলেই স্থান পায়নি হিসেবের খাতায় তবু আমরা এদের মানুষ বলেই গণ্য করবো। কারণ দেখতে এরা মানুষেরই মতো। এরা কেউ খঞ্জ, কেউ অন্ধ, কেউ বা চিররোগী এবং কেউ পাগল। ওপরে খোলা আকাশ,

নিচে সংস্কারহীন ফুটপাথ। ফুটপাথের কঠিন পাথরই এদের শয্যা। ছেঁড়া চট, ময়লা কাঁথা, আর উনোনের প্রয়োজনে খান-কয়েক ইট ও রান্নার প্রয়োজনে দু-একটা মাটির হাঁড়ি ছাড়া এদের

সংসারের সম্পত্তি বলতে কিছু নেই। দিনের পর দিন আসে, বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়। তবু ফুটপাথ থেকে এরা নড়ে না। এরা সাদরে অভ্যর্থনা জানায় গ্রীষ্মের সূর্যকে, মাথা পেতে বরণ করে বর্ষার ঝড়-বৃষ্টি এবং নিশ্চিন্তে আলিঙ্গন করে হাড়-কাঁপানো শীতকে। এদের ভয় নেই, ভাবনা নেই। যদিও দুঃখ-যন্ত্রণার অপরিবর্তিত ছবি এরাই, তবু এদের মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে, ভাঙা-গড়া আছে এবং আছে পরিবর্তন। আসুন, আজ, অবগত হই এদেরই একটি সংসারের ইতিহাস ঃ

উত্তর দিকের দক্ষিণ ফুটপাথে গুটিকয় ঘন পল্লবিত গাছ আছে। তাই স্বাভাবিক কারণেই এ-ফুটপাথ কিছুটা ছায়াযুক্ত এবং ছায়াযুক্ত বলেই ফুটপাথবাসীর সংখ্যা এখানে কিছু বেশি। দৈনন্দিন যাতায়াতের পথে এদের এলোমেলো সংসার প্রত্যেকেরই চোখে পড়ে। আর চোখে পড়ে একটা দেশী কুকুর। কুকুরটার স্বভাব বা আচরণ ঠিক কুকুরের মত নয়, খানিকটা যেন মানুষের মতো। সে একটা গাছতলার খানিকটা জায়গা অধিকার ক'রে ব'সে থাকে এবং কেউ পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে সামনের পা'দুটো ওপরে তুলে অদ্ভুত আওয়াজ করে। এ পথের যারা নতুন পথচারী, তারা এর ভাবভঙ্গী ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু যারা পুরোনো—তারা এ-কুকুরটাকে চেনে এবং চিনতো তার প্রভুকেও। তাই দয়াপরবশ হয়ে মাঝে মাঝে তারা খাবার এনে দেয় কুকুরটার সামনে। কেউ তাড়া করলেও কুকুরটা তার স্থান ত্যাগ করে না। ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়েও সে পড়ে থাকে একই জায়গায়। মাঝে মাঝে সজ্ঞান মানুষের মতোই নাকী সুরে কেঁদে-কেঁদে এদিক ওদিক তাকায়। হয়তো সে এভাবে তার প্রভুরই অনুসন্ধান

করে। কিন্তু দিন যায়, রাত যায় ; দেখতে দেখতে অতিক্রান্ত হয় মাসের পর মাস। তবু প্রভু তার ফেরে না।

এ-পথের পুরোনো পথচারীদের মতো আমিও এ-কুকুরটাকে চিনি এবং চিনতাম তার প্রভুকেও। তার প্রভুর নাম ছিল পিয়ারু মস্তান। মাথাভরা বাবরি চুল, সারামুখে লম্বা দাঁড়ি, পরনে লুঙ্গি এবং গায়ে গেঞ্জী—বরাবর এভাবেই তাকে দেখে এসেছি অনেককাল। এখানেই সে থাকতো। অন্য ফুটপাথ-বাসীদের মতো পিয়ারু মস্তান ভিক্ষা করতো না। তার ধারণা ছিল ঃ ভিক্ষা করাটা পাপ। তাই সে দিনমান বিভিন্ন হোটেলের ময়লা বাসন-পত্র পরিষ্কার ক'রে এবং কখনো এবাড়ী-ওবাড়ীর ঘর ঝাঁট দিয়ে পয়সা রোজগার করতো এবং তা দিয়েই সে নিজের ও কুকুরের আহার জোটাতো কোনোমতে। কুকুরটা ছিল তখন নেহাতই বাচ্চা। মস্তান তাকে দুধ-ভাত খাওয়াতো, বুকে ক'রে আদর করতো। এবং মাঝে মাঝে সারা ফুটপাথ ছুটোছুটি ক'রে খেলা করতো কুকুরটার সঙ্গেই। এভাবেই দিন কাটতো মস্তানের এবং প্রভুর আদর যত্নে কুকুরটাও বড়ো হয়ে উঠতো দিনে দিনে।

ঠিক এমনই সময়ে হঠাৎ একটা পরিবর্তন আসে মস্তানের জীবনে। অর্থাৎ মস্তানের পাশে এসে জোটে এক অল্প বয়স্কা ভিখারিণী। মস্তান আত্মভোলা হলেও সরল মনেই ভিখারিণীকে গ্রহণ করে, ভালোবাসে। তারপর ছেঁড়া চটের ছাউনি তুলে একদিন ফুটপাথেই গ'ড়ে তোলে নতুন সংসার।.........ফুটপাথবাসীদের মধ্যে এ-ধরণের ঘটনা নতুন নয়। তাই এ-ব্যাপারে এ-অঞ্চলের কেউই তেমন আশ্চর্য হয়নি এবং আশ্চর্য হইনি আমিও। কারণ এদের মধ্যে এ-ই স্বাভাবিক। এভাবেই গড়ে ওঠে এদের

সংসার। পথে পথেই জ'মে ওঠে দাম্পত্যজীবন। আর পথে-পথে অলক্ষ্যেই ভেসে যায় কখনো বা।

এ ঘটনার দিন কয়েক পর, আমি পথ চলতে চলতে একদিন মস্তানকে ডেকে রসিকতা ক'রে বলি ঃ

"ওহে মস্তান, জোড়া-জীবন ফুটপাথে ঠিক মানায় না। এবার বস্তির মধ্যে একটা ঘর-টর ভাড়া নেবার ব্যবস্থা করো।'

আমার এ-কথার পর মস্তান একবার হো-হো ক'রে হেসে ওঠে। তারপর হাসতে-হাসতে উত্তর দেয় ঃ

—" না বাবু ঘরে আমাদের কাজ নেই। ঘর কেবল অশান্তিই পয়দা করে। আমরা পথের লোক, ফুটপাথই আমাদের ভালো। মনের শান্তি আমরা এখানেই পাবো।"

সত্যই হয়তো মনের শান্তি তারা পেয়েছিল। তাই দেখতে দেখতে ফুটপাথেই জ'মে ওঠে তাদের সংসার। অসুস্থতার আড়ালে ভিখারিণীর যে যৌবন চাপা ছিল এতদিন—তা' মস্তানেরই আদর-যত্নে ভরাট নদীর মতোই আত্মপ্রকাশ করে দিনে দিনে। মস্তান তার নাম রাখে ময়নামতী। ময়নামতীর সেবা-দাক্ষিণ্যে মস্তানেরও চুল-দাড়িতে তেল পড়ে, ময়লা গেঞ্জী সাফ্ হয় এবং দেহেরও চেকনাই বাড়ে খানিকটা।......দৈনন্দির যাতায়াতের পথে তাদের এ পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করতাম। ভাবতাম ঃ ফুটপাথে সংসার পাতলেও সামান্যের মধ্যেই এরা শান্তি পেয়েছে অফুরন্ত। অতএব অস্তিত্ব এদের এদের এখানেই সুন্দর। হয়তো জীবন এদের এভাবেই কেটে যাবে।

কিন্তু না। ধারণা আমার মিথ্যা হলো অচিরেই। কারণ বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মস্তানের সংসারে আবার একটা পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করি। এ যেন ঠিক পরিবর্তন নয়, মর্মান্তিক একটা বিপর্যয় ঃ

সেদিন সাত-সকালেই কী একটা কাজে বেরিয়েছিলাম জানি না। কাজের তাগিদে এ-পথ দিয়ে যেতে যেতে ফুটপাথেই দেখতে পাই মস্তানকে। সে জড় পদার্থের মতো ব'সে আছে একা। আকাশের দিকে নিবদ্ধ তার বিষণ্ণ দৃষ্টি। খানিকদূরেই প্রভুভক্ত কুকুরটা আধশোওয়া অবস্থায় তাকিয়ে আছে মস্তানেরই মুখের দিকে। পাশেই খ'সে পড়েছে ছেঁড়া চটের ছাউনি।
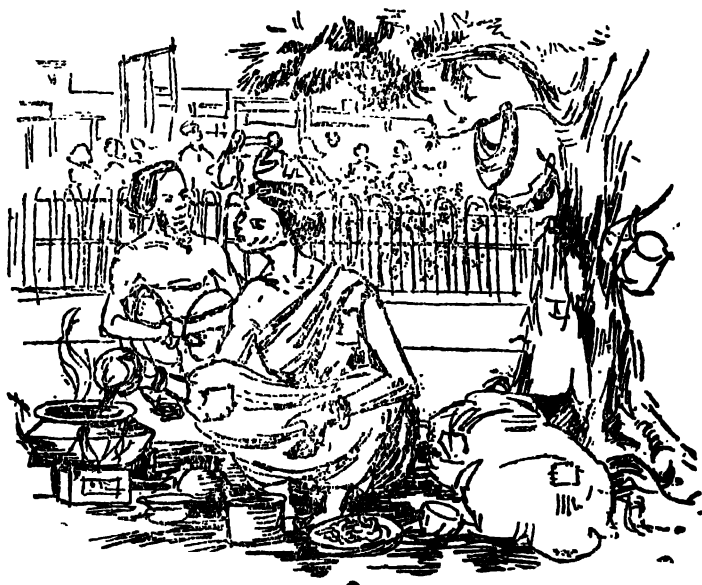
এলোমেলো তার সমস্ত সংসার। সংসারে নেই ময়নামতী।

পাশের লোকদের কাছে খবর পাই: ময়নামতী পালিয়েছে। সে পালিয়ে গেছে ফুটপাথেরই বাসিন্দা এক জোয়ান ছোকরার সঙ্গে। ছোকরাটা নাকি অনেকদিন থেকেই ভাব জমাচ্ছিল ময়নামতীর সঙ্গে। মস্তান তা টের পায়নি। গতকাল দুপুরবেলা মস্তান যখন কাজে গিয়েছিল—ঠিক তখনই তারা পালিয়েছে।

কুকুরটা তাদের আটকে রাখতে পারেনি। পাশের ফুটপাথবাসীরাও তাদের বাধা দেয়নি। কারণ তারা অথর্ব ও চিররোগী বলেই বাধা দেবার ক্ষমতা তাদের রহিত। তাছাড়া এ-ব্যাপারে তাদের কোনো স্বার্থ নেই। মস্তান কাজ থেকে ফিরে আসে সন্ধ্যার সময় এবং এসেই তাদের পালিয়ে যাওয়ার খবর পায়। এ-খবর সে সহ্য করতে না পেরে বারবার মাথা খোঁড়ে ফুটপাথের পাথরে, টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে চটের ছাউনি, লাথি মেরে ভাঙে মাটির হাঁড়ি ও বাসন এবং কুকুরটার পিঠেও ঘা-কতক বসিয়ে দেয় অকারণে। তারপর এ-ফুটপাথ থেকে ও-ফুটপাথ খানিকক্ষণ অস্থিরভাবে ছুটোছুটি করার পর ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে সে যেভাবে ব'সে পড়ে—ঠিক সেভাবেই ব'সে আছে সকাল পর্যন্ত। চোখের পলক তার পড়ছে না। কেউ ডাকলেও সাড়া দিচ্ছে না। হয়তো সে শুনতেই পাচ্ছে না কারো ডাক।

আমরা ভদ্রঘরের সন্তান। ফুটপাথের পতিত সমাজে দৈনন্দিন কী ঘটছে বা না-ঘটছে—সে-বিষয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমাদের নেই। সময় থাকলেও সে-বিষয়ে খুব বেশি উৎসাহী হওয়া উচিত নয় আমাদের। নচেৎ ভদ্র সমাজের বিধানমতে আমরা হবো উপহাসের পাত্র। তাই আমিও সেদিন ফুটপাথের এ-ঘটনার প্রতি তেমন আকৃষ্ট না হয়ে নিজের কাজে চ'লে যাই।

কিন্তু এ-ঘটনাই যে মস্তানের জীবনে শেষ ঘটনা—এ-কথা সেদিন ভাবতে পারিনি এবং বুঝতেও পারিনি যে ময়নামতী তার সমস্ত জীবনে ইতি টেনে চ'লে গেছে। বুঝতে পারি ঠিক তার দুদিন পরে—যেদিন বিকেলবেলা ওয়েলেসলি স্কোয়ারের থমথমে পুকুরের জলে হঠাৎ একটা ভাসমান মৃতদেহ দু'জন ক্রীড়ারত

কিশোরের চোখে পড়ে। তাদেরই চিৎকারে পার্শ্ববর্তী এলাকার অজস্র লোক এসে উপস্থিত হয় পুকুরের ধারে। আমিও আসি। এ-অঞ্চলের সবাই মস্তানকে চিনতো। তাই মৃতদেহ ডাঙায় তোলার পর তা আর সনাক্ত করা কঠিন হয় না কারুর পক্ষেই। যথাসময়ে পুলিশও আসে এবং হৈ-চৈ হয় খানিকটা। তারপর পুলিশই মৃতদেহটাকে নিয়ে যায়।

এগিয়ে চলে সময়ের গতি। ময়নামতী পালিয়ে গেলেও হারিয়ে সে যায়নি। চিরকালের মতো হারিয়ে গেল কেবল ফুটপাথের সেই পিয়ারু মস্তান। তাই ধীরে ধীরে তাকে ভুলে গেল এ-অঞ্চলের সমস্ত লোক এবং ভুলে গেলাম আমিও। ভুলতে পারলো না কেবল ফুটপাথের সেই কুকুরটা। সে তার প্রভুর মৃত্যু সংবাদ পায়নি। তাই আজও সে ফুটপাথেই দিন গুণছে প্রভুর আগমন আশায়।

অনন্ত

—"একি ? আপনি ! কী সৌভাগ্য ! মনে মনে কতদিন আপনার খোঁজ করেছি। আপনি তো আমাকে ভুলেই গেছেন। জানেন, আমি আপনার কত অনুগত ? আপনাকে কেবল শ্রদ্ধাই করি না, ভালোও বাসি সমস্ত অন্তর দিয়ে। তাই প্রায় প্রত্যহই আপনার কথা ভাবি। অথচ দিনের পর দিন আপনি আমাকে উপেক্ষা করেই চলেছেন। উঃ, আজ কতদিন পরে দেখা। আপনি ভালো আছেন ?"

ওপরের কথাগুলো প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বলার পর, যে আমার নিষেধ সত্ত্বেও পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে মাথা সোজা ক'রে দাঁড়ায় হাজরার মোড়ে—সে আমারই পুরোনো ছাত্র অনন্ত। সত্যই আজ প্রায় বছর-দেড়েক পরে দেখা। তার এ-আনুগত্য এবং সেই সঙ্গে বিগলিত শ্রদ্ধায় অভিমানের জোয়ার-ভাঁটা লক্ষ্য ক'রে আমার পক্ষে সত্যই খুশি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু খুশি হতে পারলাম না। বরং একটু ঘাব্ড়েই গেলাম। কারণ তাকে দেখেই অতীতের দু'একটি ঘটনার চিত্র ভেসে উঠলো চোখের সামনে। তাছাড়া মাস-দুয়েক আগেও যার সম্বন্ধে বিশেষ একটা খবর পেয়েছিলাম, তাকে প্রকাশ্য রাস্তায় ঠিক এভাবেই দেখতে পাবো—আশা করিনি। তাই সহসা কিছু বলতে না পেরে, কেবল অবাক হয়েই তাকিয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। সে হয়তো আমার এ-অবস্থা ঠিক লক্ষ্য করলো না। তাই পরক্ষণেই প্রবল উচ্ছ্বাসে আমার হাত ধ'রে টানতে টানতেই বললো : —"আজ আপনাকে সহজে ছাড়ছি না। আসুন, এ-পার্কে ব'সে খানিকক্ষণ গল্প করা যাক।"

আমি পুতুলের মতো তাকে অনুসরণ ক'রে পার্কের একটা বেঞ্চে এসে বসলাম। সে বলতে লাগলো অনেক কথা—অতীতের, বর্তমানের, ভবিষ্যতের। আমি তার অনর্গল কথায় কান রাখলাম সত্য, কিন্তু মন ছুটে গেল অনেক পেছনে ঃ

সেই প্রায় বছর-দেড়েক আগের কথা। কী একটা বিশেষ কারণে ডালহৌসী এসেছিলাম দুপুর বেলা। অনেকক্ষণ পথে-পথে ঘুরে বেশ একটু ক্লান্ত হয়ে পড়ায়, লালদিঘির পাশেই একটা বেঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করি খানিকক্ষণ বিশ্রামের আশায়। এমন সময় কিছু দূরে দিঘির পাশেই নজরে পড়ে একটা ভীড়। নিছক কৌতূহল বশতঃই ভীড়ের কাছে এসে যাকে দেখতে পাই, অর্থাৎ যাকে কেন্দ্র ক'রে সমগ্র ভীড়টার সূচনা—সে আজকেরই এই অনন্ত। সে ভীড়ের সবাইকেই লক্ষ্য ক'রে বলছে ঃ

—"আপনারা চিন্তা করবেন না। আগামী মাস থেকেই এ-দেশের শাসন-দণ্ড আমি হাতে নেবো। যারা কর্মহীন তারা কাজ পাবেন। যাঁদের মাইনে কম, তাঁদের মাইনে বাড়বে। যারা দুর্নীতিপরায়ণ, তাদের আমি কঠোর হস্তে দমন করবো এবং যারা কালো বাজারের অর্থ জমিয়ে আজ পুঁজিপতি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—তাদের সমস্ত অর্থ আমি আইন-বলে অধিকার ক'রে দরিদ্র-সাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দেবো। চালের দাম কমবে, মাছের দাম কমবে, কাপড়ের দাম কমবে। এমন কি পান, বিড়ি, সিগারেট, আফিং প্রভৃতির দামও কমবে। আপনাদের কোনো দুঃখ থাকবে না। আর মাত্র একটি মাস আপনারা অপেক্ষা করুন। এক মাস পরেই নতুন রাজত্বে নতুন নীতি প্রবর্তিত হবে"—ইত্যাদি···

ভীড়ের মধ্যে এভাবে তাকে দেখে এবং তার এ-সমস্ত আবোল-তাবোল কথা শুনে আমি কেবল অবাকই হলাম না, যেন আকাশ

থেকে পড়লাম। এ কি ব্যাপার ? ছেলে হিসেবে সে মোটামুটি শিক্ষিতই। সরকারী অফিসে চাকুরীও করে। তাছাড়া উদার স্বভাব ও মিশুকে বলে বন্ধু মহলে তার সুনামও আছে যথেষ্ট। অন্য কোনো বাজে নেশা বা বদঅভ্যাস তার নেই। অথচ কী আশ্চর্য, এমন একটা যুবক প্রকাশ্যে লালদিঘির মোড়ে দাঁড়িয়ে কী-সব যা-তা বকছে! ছাত্র হিসেবে এককালে সে আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল! তাই স্বাভাবিক কারণেই অত্যন্ত বিচলিত হয়ে, ভীড়ের মধ্যেই তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করি ঃ

—"অনন্ত, কি হয়েছে তোমার ? এখানে দাঁড়িয়ে কী-সব যা-তা বকছো ? আমার ডাক শুনে সে আমার দিকে ফিরে তাকায়। কিন্তু সরাসরি একেবারে 'তুমি' সম্বোধন ক'রে আমাকেও বলতে থাকে ঃ

—"তোমাকেও আর বেশিদিন বেকার থাকতে হবে না। আমি জানি, জীবনে তুমি অনেক দুঃখ পেয়েছ। কিন্তু এবার সব দুঃখের অবসান হবে মাসখানেক পরেই। কারণ এ-দেশের শাসনদণ্ড আমি হাতে নিচ্ছি। তুমি ধৈর্য ধরো।"

তার মস্তিষ্কের মধ্যেই কিছু একটা ঘটেছে ব'লে সন্দেহ হয় আমার। আশেপাশের লোক-জনেরাও বলাবলি করে ঃ লোকটার মাথা খারাপ হয়েছে। কেউ কেউ বেশ মজা পেয়ে হাসে, হাততালি দেয়। কিন্তু এ-পরিবেশ এবং তার এ-অবস্থা আমার কাছে অত্যন্ত অসহ্য ঠেকে। তাই আমি ছুটে গিয়ে তার একটা হাত ধ'রে টানতে সুরু করি। উদ্দেশ্য—কোনোমতে তাকে বাড়ী পৌঁছে দেবো। কিন্তু পরক্ষণেই সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আরও চড়া গলায় বলে ঃ

—"আমার হাত ধ'রে টানাটানি ক'রছো কেন ? কেন আমার

কর্তব্য কাজে বাধা দিচ্ছ শুনি ? আমার এখন কত দায়িত্ব—তা জানো ? মাসখানেক পরেই আমি হবো সারা দেশের কর্ণধার। সুতরাং তার আগে সারা দেশ ঘুরে ঘুরে সবাইকেই সে-কথা জানিয়ে দিতে হবে। তুমি স'রে যাও, আমাকে বিরক্ত করো না।”

আমি আর সহ্য করতে না পেরে জনকয়েক লোকের সাহায্যে তাকে রাস্তায় টেনে এনে একটা ট্যাক্সি ডাকি। তারপর ট্যাক্সির

সাহায্যেই তাকে নিয়ে আসি বাড়ী পর্যন্ত। ট্যাক্সিতেও সে সারা পথ বকতে বকতেই আসছিল। বাড়ীতে এসেও তার বকুনির মাত্রা বাড়ে বই কমে না। তার মা'তো ছেলের এ-অবস্থা দেখে কেঁদেই অস্থির। কাঁদতে-কাঁদতেই তিনি বলেন :

—“এই তো আজ সকালেই ছেলে আমার নেয়ে-খেয়ে অফিসে গেল। হঠাৎ এর মধ্যেই তার হলো কি ? হে ভগবান, তুমি আমার ছেলের মতি ফিরিয়ে দাও !” সঙ্গে সঙ্গে ছেলেও বলতে থাকে :

—"তুমি আমার জনম-দুখিনী মা! এবার এক মাস পরেই তুমি হবে রাজ-জননী। সুতরাং তুমি আর কেঁদো না।"

আমি তার মায়ের নির্দেশেই তার এক উচ্চপদস্থ আত্মীয়ের কাছে খবর পাঠাই। খবর পেয়ে সেদিন রাত্রেই তিনি আসেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ফলে পরদিন প্রত্যুষেই অনন্তকে যেতে হয় এক উন্মাদ আশ্রমে।

তারপর, দিন পনেরো পরে একদিন আশ্রমে গিয়েও তার সঙ্গে দেখা করি। কিন্তু সেদিন দেখি ঃ সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বেশ হেসে-হেসেই কথা বলে, কুশল জিজ্ঞেস করে! আশ্রমের ডাক্তারও বলেন ঃ তার নাকি এমন কিছুই হয় নি। সামান্য একটু সক্ পেয়েছিল হয়তো। অতএব আর দিন-কয়েক পরেই সে নাকি আশ্রম থেকে ছাড়া পাবে।

দিন-কয়েক পরে সত্যই সে ছাড়া পেয়েছিল এবং অফিসের কাজেও যোগদান করেছিল যথারীতি। কিন্তু আমার সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি। সে স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে সুখেই আছে ভেবে আমি যেমন তার খোঁজ-খবর নেবার প্রয়োজনবোধ করিনি, তেমনই সে-ও আমার কাছে আর আসে নি। সুতরাং দেখতে দেখতে কেটে যায় দেড়টি বছর।··· কিন্তু এই দেড় বছর পর, অর্থাৎ আজ থেকে মাস-দুয়েক আগে আকস্মিকভাবেই আবার একদিন খবর পাই ঃ তার নাকি পুনরায় মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে এবং সেই উচ্চপদস্থ আত্মীয়ের ব্যবস্থাপনায় আবার নাকি সে ফিরে গিয়েছে উন্মাদ আশ্রমে।··· অনন্ত কেবল আমার পরিচিত নয়,

সে আমার ছাত্র এবং বিশেষ স্নেহাস্পদ। সুতরাং আবার তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে শুনে অন্ততঃ কর্তব্যের খাতিরেও আমার একবার আশ্রমে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করা উচিত। কিন্তু নানা কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায়, যাই-যাই করেও এতদিন যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ভেবেছিলাম দু' একদিনের মধ্যেই একবার যাবো। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হলো না। আজ তাকে প্রকাশ্যে হাজরার মোড়েই পেলাম। বর্তমানে মোড় ছেড়ে পার্কের বেঞ্চে এসে বসেছি উভয়ে। সে ব'লে চলেছে অনেকদিনের অনেক কথা :

আজ তার কথা-বার্তার ধরণ দেখে মনে হয় : সে সম্পূর্ণ নর্ম্যাল। অতএব আমিও এবার বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে নড়ে-চড়ে বসি। সে কথার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে হঠাৎ বলে ওঠে :

"সামনের মাসেই বিয়ে করছি। আপনাকে ঠিক সময়মতো জানাবো। আপনি কিন্তু অবশ্যই আসবেন।"

এ-কথায় আমি এক রকম চমকেই উঠি। তারপর বলি :

—"কোন্ মেয়ের সর্বনাশ করতে চলেছ ?"

—"সর্বনাশ ? তার মানে ?"

—"মানে, কিছুদিন পরে আবার হয়তো তুমি পাগল হবে। তখন সেই মেয়েটার অবস্থা কী দাঁড়াবে ?"

এ-কথার পর সে একবার উচ্চস্বরে হেসে ওঠে। তারপর বলে :

—"ও, এই কথা ? আপনি নিশ্চিত জানবেন, আমি আর পাগল হবো না।"

—"ইতিপূর্বেই তুমি বার-দু'য়েক পাগল হয়েছ। সুতরাং ভবিষ্যতে আবাব যে হবে না—তা কি ক'রে বলা যায়।"

—"নিশ্চয়ই বলা যায়। আমার দিক থেকে পাগল হওয়ার

আর কোনো সম্ভাবনাই নেই। কারণ, দ্বিতীয়বার আমি যখন উন্মাদ আশ্রমে যাই—তখন সেখানকার বড়ো ডাক্তার আমায় শাসিয়ে বলেছেন : ফের যদি আমি পাগলামী করি তাহলে তারা নাকি আমাকে রাঁচির পাগলা গারদে যাবজ্জীবন আটকে রাখার ব্যবস্থা করবেন। অতএব জ্ঞান থাকতে আমি আর ও-পথে যাচ্ছি না।"

আমি এবার অতি মাত্রায় বিস্মিত হয়ে বলি :—"তাহলে তুমি পাগল হতে জ্ঞান থাকতেই, অর্থাৎ ইচ্ছে, করেই ?"

—"তা আর বলতে!……প্রথমবার আপনাকে খুব নাকাল করেছিলাম, না? সেজন্য সত্যই আমি খুব দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করুন!"

—"আমাকে নাকাল করেছ বলে দুঃখ নেই। কিন্তু তোমার এ-ধরণের উদ্ভট অভিনয় করার অর্থ কি ?"

—"অর্থ সহজ। আপনি জানেন, সংসারে আমরা চারজন। ভাইটা বেকার। সংসারের সমস্ত খরচ আমাকেই চালাতে হয়। অথচ বেতন পাই মাত্র এক শ' দশ টাকা। এতে একজনেরই খরচ চালানো দায়। তাই প্রায় প্রত্যেক মাসেই ধার করতে হতো মোটা হারে। শেষে পাওনাদারের তাগাদার ঠেলায় সত্যই যখন আমার পাগল হবার উপক্রম হলো—তখন পাগল হলাম ইচ্ছে করেই।"

—"তাতে লাভ হলো কি ?"

—"দেনার দায় থেকে অব্যাহতি পেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিন বিশ্রাম করারও সুযোগ পেলাম উন্মাদ আশ্রমের সাজানো বাগানে।"

—"কিন্তু তুমি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছো—একথা ভেবে পাওনাদাররা তো আবার তোমাকে তাগাদা দিতে পারে ?"

—"না, তারা আর তাগাদা দেয় না। কারণ, তাদের সঙ্গে

দেখা হলেই আবোল-তাবোল বকতে সুরু করি। তাই তারা মনে করে ঃ আমি এখনো খানিকটা এ্যাবনর্ম্যাল। সুতরাং তাগাদা দেবার ইচ্ছে থাকলেও, তারা আর সুযোগ পায় না।"

—"দ্বিতীয়বার পাগল হয়েছিলে কেন ?"

—"ওই একই কারণে। আবার কিছু নতুন লোকের কাছে ধার করেছিলাম।"

তার সব কথা শুনে আমি এবার নীরবে তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। তারপর ধীরে ধীরে আবার বল্লাম ঃ

—"এবার তো বিয়ে করতে চলেছ। খরচের হারতো বাড়বে বই কমবে না। চালাবে কি ক'রে ? আবার কি কোনো নতুন লোকের কাছে ধার করার মতলবে আছো ?"

—"না। ধার আর করবো না। শ্বশুর যা যৌতুক দেবেন—তা দিয়েই গোপনে একটা ব্যাবসা ফাঁদার চেষ্টা করবো এবং চাকুরীটাও বজায় রাখবো। প্রয়োজন হলে, বউটাকেও লাগিয়ে দেবো কোনো কাজে। আশা করি এভাবেই চ'লে যাবে।"

এই বলে সে হাসতে-হাসতেই আবার আমার দিকে তাকায়।

পাগল না হলেও, সে প্রকৃতই পাগল ! কিন্তু এই পাগলেরই বিস্ফারিত চোখের পর্দায় আমি যেন দেখতে পেলাম ঃ সারা বাংলা দেশের এক অসহায় প্রতিচ্ছবি।

নিচের তলার মায়া

কোনো এক বিশেষ রাস্তার ধারে আস্তাবল। আস্তাবলের ঠিক সামনের ফুটপাথেই আরাম কেদারায় দেহ এলিয়েছেন কাজী সাহেব —যিনি এ-আস্তাবলের অধিকাংশ ঘোড়া-গাড়ীর মালিক।......

রাত তখন এগারোটা। ওপরে তারায় ভরা আকাশ। দক্ষিণ-পূর্ব কোণের আধখানা চাঁদ কাজী সাহেবের মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে।

গরমকালের রাত। চোখে ঘুম নেই আমারও। তাই আমিও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একই ফুটপাথে পায়চারী করছি। আর মাঝে মাঝে অকারণেই তাকাচ্ছি কাজী সাহেবের দিকে। তিনি যে চোখ মেলে নেই—চাঁদের আলোয় তা পরিষ্কার বোঝা যায়। হয়তো তিনি ওভাবেই ঘুমিয়েছেন। কিংবা না ঘুমালেও চোখ দুটো বন্ধ ক'রে মগ্ন আছেন বিষয়-চিন্তায়। তাই তার এলিয়ে থাকা বিশাল দেহটা নিথর, নিষ্কম্প।

ওদিকে আস্তাবলের ভেতরের কটুগন্ধী অন্ধকারে ডাইনীর চোখের মতো দুটো তেলের কুপি জ্বলছে পাশাপাশি। ওখানে বসেই আপন মনে বিড়ি টানছে জনকয়েক কোচুয়ান। তাদের পাশেই জ'মে আছে গুটিকয় সবুজ ঘাসের আঁটি। সেদিকেই করুণ চোখ মেলে নিস্তেজ লেজের সাহায্যে মশা অথবা মাছি তাড়াচ্ছে কয়েকটা হাড়-জিরজিরে ঘোড়া। কুপির নিষ্প্রভ শিখা অন্ধকার নাচাচ্ছে বাঁশের বেড়ায় ও দেওয়ালে। চারদিকে আটকে রয়েছে একটা অস্থির গুমোট। সব মিলিয়ে পরিবেশটা কেমন নিঃঝুম, নিঃসার।

খানিক বাদেই ফুটপাথের আরাম কেদারা থেকে হঠাৎ তড়িৎগতিতে উঠে দাঁড়ান কাজী সাহেব। কারণ তার ঠিক পাশেই এসে দাঁড়ায় একটা ঘোড়ার গাড়ী। হয়তো এরই জন্যে তিনি এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ফুটপাথ থেকে নেমেই গাড়ীটার পাশে এসে দাঁড়ান। তারপর ওপরে কোচুয়ানের দিকে মুখ তুলে বেশ একটু মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞেস করেন :

—"কিরে, আজ কত হলো ?"

কোচুয়ানটা সম্ভবতঃ কোচে বসেই ঝিমোচ্ছিল। কথা শুনেই সে একবার মাথা ঝেড়ে সোজা হয়। তারপর ওখান থেকেই বেশ একটু অস্পষ্ট ভাবে থমকে থমকে বলে :

—"না, আজ কিছুই হয়নি। ঘোড়ার গাড়ীতে কেউ উঠতে চায় না।"

কোচুয়ানটার কথা শুনেই মনে হলো সে নেশা করেছে। অন্ততঃ পাইন্টখানেক সে গিলে এসেছে তাই তার গলাটা যেমন ধরা, তেমনই ভাষাও তার অস্পষ্ট। তার এ-কথার পরই খানিকটা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন কাজী সাহেব এবং বলেন :

—"কী বাজে কথা বলছিস ? কিছুই হয় নি ? তাহলে গাড়ীটা নিয়ে এতক্ষণ তুই বেকার ঘুরলি ? হারামজাদা তুই মিথ্যা কথা বলছিস।"

মাতাল কোচুয়ানটা এবার টলতে টলতে কোনো মতে নেমে আসে কোচ থেকে। তারপর কাজী সাহেবের মুখের কাছে মুখ এনে অদ্ভুতভাবে তাকায় এবং ও-অবস্থাতেই অস্পষ্টভাবে বলে :

—"আমি মিথ্যা বলছি না। আজ একটি পয়সাও হয় নি। একটিও সোয়ারী ওঠেনি গাড়ীতে। কেউ যদি উঠতে না চায়তো আমি কী করবো ? তোমার ঘোড়ার গাড়ী আর চলবে না।"

কাজী সাহেব এবার প্রকৃতই রেগে ওঠেন। তিনি হঠাৎ এবার কোচুয়ানটার একটা হাত চেপে ধ'রে বেশ চড়া গলায় বলেন ঃ

—"একটি পয়সাও হয় নি? তাহলে মদ খেলি কোত্থেকে রে শালা?"

এ-কথা বলেই তিনি প্রথম একটা বিরাশি সিক্কার চড় ছাড়েন তার গালে। তারপর পরক্ষণেই আবার মণখানেক ওজনের

একটা প্রকাণ্ড ঘুষি চালান বুকে। আমি পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম ; তাই স্পষ্টই দেখা গেল ঃ মাতাল কোচুয়ানটার দেহে কেবল হাড়ের ওপর শুকনো চামড়া ছাড়া আর কিছুই বাকি নেই। সুতরাং একটা চড় এবং তারপর একটা ঘুষির আঘাতেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং ওভাবে পড়েই থাকে অসাড় হয়ে! কাজী সাহেব কিন্তু তাতেও শান্ত হলেন না। আরেকবার তিনি চিৎকার করে বলেন ঃ

—"শালা আমারই গাড়ীর রোজগারের পয়সায় নেশা ক'রে এসেছে। অথচ বলছে এক পয়সাও হয়নি। শালা এক নম্বরের হারামখোর।"

এই বলে তিনি লুটিয়ে পড়া কোচুয়ানটার পাশে হাঁটু ভেঙে বসেন এবং তার ট্যাঁকে ও শতচ্ছিন্ন ময়লা ফতুয়ার পকেটে হাত চালাতে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোচুয়ানটার ট্যাঁক বা পকেট হাতড়ে একটি আধলাও তিনি পেলেন না। না পেয়ে মেজাজ তার চরমে ওঠে আরও। সুতরাং তিনি আবার দাঁড়িয়েই কোচুয়ানটার অসাড় দেহের বিভিন্ন অংশে প্রায় উন্মাদের মতোই চালাতে থাকেন লাথির ওপর লাথি এবং গালাগাল দিতে থাকেন অশ্লীল ভাষায়।

কোচুয়ানটা সম্ভবতঃ জ্ঞান হারিয়েছে। তাই তার কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না! এদিকে আস্তাবলের ভেতরের অন্যান্য কোচুয়ানরা ছুটে এসে ভীড় জমায় চার পাশে। সবাই পক্ষ নেয় কাজী সাহেবেরই। আমি এ-পাড়ায় নতুন। কাজী সাহেবের সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় নেই। তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছু জানিও না। কেবল তাঁর নামটাই আমার জানা। অতএব এ-ব্যাপারে আমার পক্ষে নাক বা মাথা গলানো সমীচীন নয় বলেই এমন একটা দৃশ্যের পাশে আর না দাঁড়িয়ে, তাড়াতাড়ি স'রে আসি নিঃশব্দে।

পরেব দিনের কথা। সকালবেলা বাজার করতে এসে—বাজারের বাইরের শেডের তলার পত্র-পত্রিকার ষ্টলগুলোর পাশে একবার দাঁড়িয়েছি খেয়ালবশতঃই। হঠাৎ আমার চোখে পড়লো গত রাত্রের সেই মাতাল কোচুয়ানটা। গত রাত্রে রাস্তার

আলোয় তার মুখ দেখেছি। তাই এখানেও তাকে চিনতে পারলাম দেখা মাত্রই। এখানে শেডের তলারই একটি কোণ ঘেঁষে সে শুয়ে আছে। আর আশ্চর্য, পাশে ব'সে তার ব্যথা-কাতর দেহে ধীরে ধীরে হাত বুলোচ্ছেন একজন বোরখা পরা মহিলা। মহিলার মুখের অংশ খোলা। তাই দেখলাম চোখ তার অশ্রুসজল। তিনি সুন্দরীও বটে। অথচ নোংরা কোচুয়ানটার পাশে ব'সে তার গায়ে তিনি হাত বুলোচ্ছেন। দৃশ্যটা কেমন যেন বেমানান ঠেকলো।

কে এই মহিলা? কোচুয়ানটার সঙ্গে কি তার কোনো আত্মীয়তা আছে? নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে মনে মনে এ-কথাই ভাবছি। এমন সময় হঠাৎ চমকে উঠি এক প্রচণ্ড চিৎকারে। অতি আশ্চর্য ব্যাপার! গত রাত্রের সেই কাজী সাহেবই প্রচণ্ড এক গর্জনের সঙ্গে ঝড়ের মতো এসে উপস্থিত হন শেডের তলায়। তিনি শুয়ে থাকা কোচুয়ানটার পাশে ছুটে এসেই রক্তবর্ণ চোখ মেলে তাকান। তিনি আসতেই মহিলাটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ান। তিনি উঠে দাঁড়াতেই কাজী সাহেব তার একটা হাত ধ'রে ঝটকা মারেন এবং দাঁত চিবিয়ে বলেন :

—"হারামজাদী, তুই এখানে এসেছিস? তোর লজ্জা-সরম, মান-ইজ্জত কিছু নেই? তোর গায়ের চামড়া আজ আমি তুলে নেবো।"

এ-কথা বলেই তিনি মহিলাকে সজোরে ঠেলে দেন রাস্তার দিকে। ঠেলা খেয়েই মহিলা রাস্তায় এসে পড়েন। তারপর ওখান থেকেই তিনি বোরখায় মুখ ঢেকে হাঁটতে শুরু করেন একদিকে। তার চ'লে যাওয়ার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাজী সাহেব এবার মুখ ফেরান কোচুয়ানটার দিকে। কোচুয়ান-টাকে তিনি বেশ শাসিয়ে বলেন :

—"শালা, তোর এই কাজ। তোকে আমি পুলিশে দেবো।"

এ-কথা বলেই এদিক-ওদিক বারকয়েক তাকিয়ে কাজী সাহেবও এবার দ্রুতপদে রওয়ানা হন মহিলার পিছে-পিছে।

আমি অবাক হলাম অতি মাত্রায়। ঘটনাটা পুরোপুরিই কেমন যেন রহস্যময় ঠেকলো আমার কাছে। অথচ কোচুয়ানটার কাছে গিয়ে আমার পক্ষে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করাও সম্ভব হলো না সেদিন।

তারপর বেশ কয়েকদিন কেটে যায়। কাজী সাহেব, কোচুয়ান এবং সেই মহিলার কথা ধীরে ধীরে প্রায় ভুলতে বসেছি—এমন সময় ঘটনাচক্রেই আবার দেখা পেলাম সেই কোচুয়ানটার!

সেদিন দুটি জনপ্রিয় দলের ফুটবল খেলা ছিল ময়দানে। আমি যে-পাড়ায় থাকি—সেখান থেকে সরাসরি ময়দানে যাওয়ার কোনো ট্রাম-বাস নেই। তাই জন-দশেক যুবক একটা ঘোড়ার গাড়ী ঠিক করে। আমিও তাদের সঙ্গী হই। গাড়ীর পরিসর অনুপাতে সোয়ারীর সংখ্যা বেশি। তাই কেউ ভেতরে বসে এবং কাউকে পেছনে ও পাশের পাদানীতে পর্যন্ত দাঁড়াতে হয়। আমি ঠাঁই পেলাম ওপরের কোচে ঠিক কোচুয়ানের পাশেই।

গাড়ী চলতে সুরু করতেই হঠাৎ আমার চোখ পড়ে কোচুয়ান-টার মুখের ওপর এবং তাকে চিনতে পারি। এ সেই কোচুয়ান। আজ ঘটনাচক্রে আমি যে তারই কোচে ব'সে এভাবে খেলা দেখতে যাবো—তা কোনোদিন কল্পনাও করিনি। তাকে দেখেই কিছুদিন আগের সেই রহস্যময় ঘটনা দুটোর কথা আমার মনে পড়ে এবং আমি বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠি। ওপরের কোচে কেবল আমি আর কোচুয়ান। সুতরাং আস্তে আস্তে কথা বললে নিচের কেউ

শুনতে পাবে না বুঝে অদম্য কৌতূহলবশতঃই কোচুয়ানটাকে আমি জিজ্ঞেস করি :

—"কি হে, আবার তুমি গাড়ী চালাচ্ছ ? সেদিন তো এই গাড়ী চালানো নিয়েই কাজী সাহেবের সঙ্গে তোমার বেশ কিছু একটা হয়ে গেল।"

আমার কথা শুনেই সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকায়। তারপর বলে :

—"ও, আপনি সেদিন ছিলেন বুঝি ? তা যা-ই হোক বাবু গাড়ী আমাকে চালাতেই হবে। নইলে বাঁচবো কি ক'রে ?"

সে আমার কথার উত্তর সহজভাবেই দিচ্ছে দেখে আমি বেশ

উৎসাহিত হই এবং তার সঙ্গে এবার ঘনিষ্ঠ হয়েই আলাপ জমিয়ে তোলার চেষ্টা করি। আমি আবার বলি ঃ

—"কাজী সাহেব আবার তোমাকে কাজে নিলেন ?"

—"না নিলে তারই বা চলবে কি ক'রে ? আজকাল ঘোড়ার গাড়ীর রোজগার নেই ব'লে কোচুয়ানের কাজ ছেড়ে সবাই পালিয়ে যাচ্ছে। এ-কাজে তো বাঁধা-ধরা মাইনে নেই। রোজগার হলেই কোচুয়ানরা পয়সা পায়, না হ'লে পায় না। পয়সা না পেলে বেগার খাটবে কে ?"

-"সেদিন রাত্রে কি এই গাড়ীরই রোজগারের পয়সায় তুমি মদ খেয়েছিলে ?"

—"না বাবু। সেদিন একটি আধলাও রোজগার হয়নি এবং সারাদিন আমি কিছু খেতেও পাইনি। রাত এগারোটা নাগাদ যখন খালি গাড়ী নিয়ে ফিরে আসছিলাম, তখন পথেই আমার এক অন্য পাড়ার কোচুয়ান বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়। সেই বন্ধুই আমাকে মদ খাওয়ায়। সেদিন খালি পেটে মদ খেয়েছিলাম কেবল ক্ষুধার জ্বালা ভুলে থাকবো ব'লে।"

তার এ-কথার পর আমি বেশ খানিকক্ষণ নীরব থাকি। তারপর বার-দুয়েক কেশে এবং একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে ধীরে ধীরে আবার তাকে জিজ্ঞেস করি ঃ

—"আচ্ছা পরের দিন সকালবেলা তুমি বাজারের বাইরের শেডের তলায় ওভাবে শুয়ে ছিলে কেন ?"

—"ওখানেই যে আমি রাত কাটাই। সেদিন সকালবেলায় গায়ের ব্যথায় আমি উঠতে পারছিলাম না।"

—"যে মহিলাটি তোমার গায়ে সেদিন হাত বুলোচ্ছিলেন, তিনি কে ?"

আমার এই হঠাৎ প্রশ্নে সে একটু নড়েচড়ে ওঠে। তারপর আমার দিকে ফিরে তাকায় করুণ চোখে। বলে ঃ

—"আপনি এত খবর নিচ্ছেন কেন ?

—"কোনো উদ্দেশ্য নেই। এমনিই।"

—"আপনি যার কথা বলছেন—সে কাজী সাহেবের দ্বিতীয় বিবি, মানে বউ।"

—"অত বড়ো একজন লোকের বউ হয়ে তিনি বাজারের শেডের তলায় গিয়েছিলেন তোমার কাছে, আর তোমারই গায়ে হাত বুলোচ্ছিলেন ?"

"হ্যাঁ বাবু। আমার কাছে আসতে আমি তাকে মানা করেছি অনেকবার। তবু সে চুরি ক'রে আসে। কিছুতেই সে কাটাতে পারে না আমার মায়া।"

—"তোমার মায়া ? তার মানে ?"

—"মানে সোজা। একদিন সে আমারই বউ ছিল। দিনকালে আমার অবস্থা যখন ঠিক এমনই হয়, তখন তাকে আমি খেতে দিতে পারতাম না। দিনের পর দিন সে না খেয়ে থাকতো। তার উপোস করা মুখ আমি রোজ রোজ আর সইতে পারছিলাম না। তাই কাজী সাহেবেরই বার বার তাগিদে এমন অবস্থায় তাকে আমি একদিন তালাক দিই।"

—"তারপর ?"

—"তারপর তালাকের ঠিক মাস-দুয়েক পরে কাজী সাহেবই তাকে নেকাহ্ করে। তার প্রতি কাজী সাহেবের লোভ ছিল আগে থেকেই। আজ সে খেতে পায় ; সেজেগুজে থাকে।

তবু আমার মতো একটা কোচুয়ানের মায়া কাটাতে পারে না। এমনই বোকা।"

—"বোকা নয়, সে তোমাকে ভালোবাসে।"

—"হয়তো বাসে।"

—"তুমিও তাকে ভালোবাস নিশ্চয়ই ?"

—"আমি ? আমার মতো লোক আবার ভালোবাসতে জানে নাকি ? ভালোবাসলে এমন বউকে কেউ আবার তালাক দেয় ?"

তার এই শেষের কথাক'টি অতি তীক্ষ্ণ হয়ে আমার কানে বাজলো। মনে হলো : পৃথিবীর স্পন্দমান হৃৎপিণ্ডে হঠাৎ সে ছুঁড়ে মারলো অভিমানের ক্ষমাহীন বল্লম।

গাড়ি এসে পৌঁছলো ময়দানে। কোচ থেকে নিঃশব্দে নেমে গেলাম আমি—অতি নিষ্ঠুর শ্রোতা।

———

সাধিকা

আমার বা আমাদের এক বন্ধু আছে। আজকের এ-রচনার সঙ্গে সে খানিকটা জড়িত। তাই তার নামটা এখানে গোপন রাখতে হলো। বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক। বর্তমানে সরকারী চাকুরে। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও মনটা তার সেকেলে এবং সংস্কারাচ্ছন্ন। তার সঙ্গে আমাদের মনের কোনো মিল নেই—এ-কথা সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আমাদের বন্ধু। কারণ আমরা একই পাড়ার বাসিন্দা। প্রত্যহ সকাল হলেই পরস্পরের মুখ দেখি।

গত কালীপুজোর ঠিক আগের দিন সকালে সবে ঘুম থেকে উঠেছি, অমনই এই বন্ধুটি এসে উপস্থিত। এসেই সে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে ঃ

—"গিরিবালার খবর জান ?"

তার এ-প্রশ্ন আমি ঠিক বুঝতে না পেরে খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে থাকি। তারপর বলি ঃ —"গিরিবালা ? গিরিবালা আবার কে ?"

সে ততোধিক অবাক হয়ে বলে ঃ —"গিরিবালাকে চিনলে না ? মাত্র বছর-পাঁচেকের ব্যবধানেই তাকে ভুলে গেলে হে ? আমাদের এই পাড়াতেই তো সে থাকতো। বছর-পাঁচেক আগে সেদিন তোমরাইতো তাকে তাড়িয়ে দিলে পাড়া থেকে। মনে পড়ছে না ?"

এবার বুঝতে পারি—কার কথা সে বলছে। সত্যই আজ

থেকে প্রায় বছর-পাঁচেক আগে আমাদের এই পাড়া-সংলগ্ন এক বস্তির ঘরেই বসবাস করতো গিরিবালা নামে এক বিধবা। বয়স ছিল তার পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশের মধ্যে। তার শরীর ও স্বাস্থ্য ছিল বেশ ভরাট। তার ছেলে-মেয়ে বা আত্মীয়স্বজন কেউ ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পরেই সে তার নিজের ঘরে প্রতিষ্ঠা করে এক পটের কালী। পাড়ার লোককে বলে: সে কালী সাধনা করছে। কিন্তু পাড়ার লোক লক্ষ্য করে: কালী সাধনার অছিলায় প্রায় প্রতিরাতেই অবাঞ্ছিত লোকের আনাগোনা স্থুরু হয় তার ঘরে। ঘরের মধ্যে গাঁজা, মদ, তাড়ি ইত্যাদির আসরও বসে। বস্তির মধ্যে বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে যারা বাস করে— তাদের পক্ষে এ-দৃশ্য বরদাস্ত করা সম্ভব হয় না। তারা দল বেঁধে প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদের উত্তরে গিরিবালা চড়া গলায় বলে:

—"আমি মায়ের সাধনা করি। রাত্রে আমার ঘরে যারা আসে—তারাও মায়ের সাধক, সাধকরা মদ-গাঁজার নেশা তো করেই থাকে। এতে পাড়ার লোকের আপত্তি করার কি আছে?"

কিন্তু গিরিবালার এ-সাফাইয়ে পাড়ার লোক মজলো না। কারণ গিরিবালার ঘরে গভীর রাত পর্যন্ত একে একে একাধিক লোকের আনাগোনা তারা লক্ষ্য করেছে। গিরিবালার বিছানার মধ্যেই আড্ডা বসে। মাঝে মাঝে সে-আড্ডা এতদূর গড়ায় যে, কোনো ভদ্রসন্তান তার প্রতিবাদ না ক'রে পারে না। অতএব কালী সাধনার নামে পাড়ার মধ্যে যে বিশেষ ধরণের এক অনাচার চলছে—পাড়ার লোক তা বুঝতে পারে। তাই তারা দল বেঁধে এসে উপস্থিত হয় পাড়ারই এক মান্য ব্যক্তির কাছে। এই মান্য ব্যক্তিটি সকলের কাছে চক্রবর্তী কাকা বলেই পরিচিত। চক্রবর্তী

কাকা বস্তিরই লোক। তিনি সারা জীবন দেশের কাজ করেছেন। জেল খেটেছেন। আজ বৃদ্ধ বয়সে স্বাধীন সরকারের অনুগ্রহ না নিয়ে শিক্ষকতা করছেন এবং বসবাস করছেন বস্তির মধ্যেই। বস্তির লোক তাকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে। তিনিও ভালোবাসেন বস্তিবাসীদের। শিক্ষকতা ক'রে আজও যা মাইনে পান—তার অর্ধেক ব্যয় করেন বস্তিবাসীদেরই অসুখে-বিসুখে। তিনি কখনও চড়া গলায় কথা বলেন না। রাগ করেন না। অপরাধীকেও তিনি শাসন করেন হাসিমুখে। সেদিন গিরিবালার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ শুনে তিনি নীরবে খানিকক্ষণ কি যেন ভাবেন। তারপর এক সময় গিরিবালাকে ডেকে অতি অমায়িক কণ্ঠে বলেন ঃ

"মা, আমি জানি তোমার কেউ নেই। তুমি আজ অসহায়। খাওয়া-পরার কোন সংস্থানও তোমার নেই। কিন্তু তবু বলছি ; পাড়ার মধ্যে তুমি এমন কাজ ক'রো না—যা লোকের চোখে খারাপ ঠেকে। তোমার জন্য অন্য একটা কাজের ব্যবস্থা আমি করবো যাতে তোমার খাওয়া-খরচের কোন অসুবিধে না হয়।"

চক্রবর্তী কাকার সব কথা শুনে গিরিবালা সেদিন নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে চক্রবর্তী কাকা তাকে আকারে-ইঙ্গিতে এ কথাও বুঝিয়ে দেন যে, এ-বয়সে গিরিবালা যদি আবার বিয়ে করতে চায় তো ভালো একটা সম্বন্ধ খুঁজে সে-ব্যবস্থাও তিনি ক'রে দেবেন। তবু যেন পাড়ার মধ্যে এ-ধরণের অ-শালীন কাজ আর না হয়।

চক্রবর্তী কাকার এ-সমস্ত কথায় গিরিবালা সেদিন কি ভাবলো জানি না। সে হঠাৎ গড় হয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে অতি মৃদুস্বরে বলে ঃ

—"ঘরে আমার খারাপ কাজ হয় না। তবু আপনারা যখন

আপত্তি করছেন, তখন আমি আর ঘরে কাউকে আসতে দেবো না। আজ থেকে একা একাই মায়ের সাধনা করবো। আমার জন্য আপনাদের কাউকে ভাবতে হবে না। আমার জীবন আমি নিজেই চালিয়ে নিতে পারবো।”

গিরিবালার কথায় চক্রবর্তী কাকা আশ্বস্ত হন। পাড়ার লোকেরাও খুশি হন। কিন্তু গিরিবালা যে সেদিন সত্য কথা বলেনি—তা' বোঝা গেল দিন-কয়েক পরের এক গভীর রাত্রে। হঠাৎ গভীর রাত্রে গোলমাল শুনে বস্তির সবাই জেগে ওঠে। ছুটে যায় গিরিবালার ঘরের কাছে। যেতেই দেখতে পায়ঃ ঘরের

মধ্যে হু'জন পাঁড় মাতাল পরস্পর মারামারি করছে আর চিৎকার করছে। তাদের মারামারি ও চিৎকার যে গিরিবালাকেই কেন্দ্র ক'রে—তা' বুঝতে কারো বাকি রইলো না। স্থতরাং পরের দিনই বিচার বসলো। সবাই বললোঃ

গিরিবালাকে বস্তি ছেড়ে চলে যেতে হবে। চক্রবর্তী-কাকাও এগিয়ে এসে গিরিবালাকে উদ্দেশ ক'রে ধীরে ধীরে বললেন ঃ

—"গিরি-মা, তোমাকে আমি অনেক বুঝিয়েছি। কিন্তু তবু যখন তুমি বুঝলে না, তখন বস্তি ছেড়ে চ'লে যাওয়াই তোমার ভালো।"

আশ্চর্য, পরের দিন সত্য সত্যই বস্তি ছেড়ে চ'লে যাবার উদ্যোগ করে গিরিবালা। খবর পেয়েই চক্রবর্তী-কাকা ছুটে আসেন এবং তার হাতে গুঁজে দেন গোটা-দশেক টাকা। তারপর তার মাথায় হাত রেখে একবার বলেন ঃ

—"জীবনে তুমি স্থখী হও—চিরদিন এ-কামনাই আমি করবো।"

গিরিবালা সেদিন সজল চোখে আরেকবার পায়ের ধূলো নেয় চক্রবর্তী-কাকার। তারপর চ'লে যায় বস্তি ছেড়ে। সময়ের ব্যবধানে দিনে দিনে আমরাও ভুলে যাই তাকে।

আজ এতদিন পরে আমার এই ধর্মভীরু বন্ধুটি হঠাৎ গিরিবালার প্রসঙ্গ কেন তুলছে—ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি তাকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি ঃ

—"গিরিবালার কোনো খবর পেয়েছ নাকি ?"

সে বলে ঃ —"নিশ্চয়ই পেয়েছি। সেদিন তোমরা তাকে

চিনতে না পেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। কিন্তু আজ তাকে দেখলে সেদিনের কথা ভেবে তোমাদের আর অনুশোচনার সীমা থাকবে না।"

আমি তেমনই অবাক হয়ে বলি: —"কেন?"

সে বলে: —"কারণ সে আজ সিদ্ধিলাভ করেছে: টালিগঞ্জের পুটিয়ারী ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণের এক গ্রামে তার ঘর। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। আজ সে আর গিরিবালা নয়, স্বয়ং শক্তিসাধিনী মা। মা-কালী তার দেহেই আশ্রয় নিয়েছেন। হাজার হাজার নরনারী আজ তার ভক্ত। ভক্তরা সারাক্ষণ তার দরজার সামনে গড় হয়ে প'ড়ে থাকে।"

বন্ধুর কথা শুনে আমি হঠাৎ হেসে ফেলি। আমার হাসি লক্ষ্য ক'রে সে বেশ ক্ষুব্ধ হয়। তারপর বলে:

—"বিশ্বাস না হয়, কাল-তো কালীপূজো, কালই চলো না? নিজের চোখেই সব দেখে আসবে। ওখানে গেলে তুমিও ভুলে যাবে তোমার নাস্তিক-বাদ। গিরিবালা আজ স্বয়ং সিদ্ধেশ্বরী।"

তার কথায় আমার বেশ একটু কৌতুক বোধ হলো। কালীপূজোর দিন সন্ধ্যা থেকেই বাজী পোড়ার ধুম পড়বে কলকাতায়। অবিরাম শব্দে কেবল যে কানই ঝালাপালা হবে তা নয়, বাইরে বেরুলে অক্ষত শরীর বিক্ষত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। তার চাইতে বন্ধুর সঙ্গে সেদিন গ্রামের দিকেই বেড়াতে গেলে মন্দ হয় না। গ্রামের আবহাওয়াটাও উপভোগ করা যাবে এবং সেই সঙ্গে গিরিবালার নতুন কাণ্ডটাও দেখতে পাবো। সুতরাং সব ভেবে বন্ধুকে বললাম:

—"বেশ-তো চলো না! আমার কোনো আপত্তি নেই!"

বন্ধু উৎসাহিত হয়ে বলে:—"তাহলে সত্যই তুমি যাবে?

দেখো, কথার খেলাপ যেন না হয়। আমি কাল বিকেলে যথা-সময়েই এসে উপস্থিত হবো।”

আমি তার কথায় সায় দিতেই সেদিনের মতো সে বেরিয়ে যায়।

পরদিন বিকেলের দিকে সত্যই আমরা রওয়ানা হলাম। খবরটা চক্রবর্তী-কাকার কানেও পৌঁছেছে। তাই তিনিও সঙ্গী হয়েছেন আমাদের। তিনি বললেন :—

“মেয়েটাকে অনেকদিন দেখিনি। আজকাল সে আবার কোন্ রূপ নিয়ে কী কাণ্ড করছে—চলো একবার দেখেই আসা যাক।”

টালিগঞ্জের আদি গঙ্গার নালাটা পেরুলেই পুঁটিয়ারী অঞ্চল। পুঁটিয়ারা ছেড়ে আমরা এগিয়ে চললাম সোজা দক্ষিণদিকে। দুই-দিকে ঝোপ-ঝাড় আর অসংখ্য গাছপালা। মধ্য দিয়ে সাপের মতো এঁকে-বেঁকে গেছে সরু পথ। এ-পথ ধরেই ঘণ্টাখানেক হেঁটে প্রায় সন্ধ্যার পর আমরা এসে পৌঁছলাম এক টালির বাড়ীর কাছে। বাড়ীটা পথের ধারেই। চারদিক বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়ার বাইরে হ্যারিকেন ও হ্যাজাকের আলো জ্বলছে। সে-আলোয় দেখা গেল বাইরে দাঁড়িয়ে আছে অজস্র লোক : বুঝতে পারলাম এ-বাড়ীই গিরিবালার। পূজো এখনো সুরু হয়নি ব'লে ভক্তরা ভেতরে ঢোকার অনুমতি পায়নি। ওদের সঙ্গে আমরাও অপেক্ষা করতে লাগলাম বাইরেই।

কিছুক্ষণ পর ভেতর থেকে ভেসে এলো শঙ্খধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল বেড়ার দরজা। সবাই ভেতরে ঢুকলো এবং সকলের সঙ্গে আমরাও। ভেতরে ঢুকতেই উঠোনের মধ্যে নজরে এলো এক কালী-প্রতিমা। প্রতিমার সামনে পূজো-উপচার সাজানো। কোনো

এক বৃদ্ধ পূজারী আসন গ্রহণ করতেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো ধূপের ধোঁয়া। বেজে উঠলো ঢাক-ঢোল। কাঁসরের কাঁই-কাঁই শব্দে হঠাৎ যেন নেচে উঠলো শহরতলীর নিশাচর হাওয়া।

পূজো চলছে। অথচ গিরিবালাকে কোথাও দেখা গেল না। বন্ধুটিকে জিজ্ঞেস করতেই সে বললো :—"হয়তো ঘরের ভেতরে আছে। যথাসময়ে বেরুবে।" অতএব আমরা ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বেশ খানিকক্ষণ পর এক সময় পূজারীর হুকুমে পাঁঠা বলির ব্যবস্থা হলো। জনকয়েক লোক একটা মাঝারি বয়সের পাঁঠাকে নিয়ে এলো স্নান করিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে গিরিবালাও বেরিয়ে এলো ঘরের দরজা খুলে। এলোচুল। রক্তাম্বরে ঢাকা তার সর্বাঙ্গ এবং ললাটে আঁকা সিঁদুরের একটা ভয়াবহ তিলক। সে দাঁড়িয়ে রইলো দরজার কাছেই। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন গেরুয়াধারী বলিষ্ঠ লোক তার দু'পাশে এসে বসলো জানু পেতে।·· ওদিকে যথাসময়ে ফাঁসে আটকানো হলো পাঁঠাকে। পাঁঠাটা কাঠের শক্ত ফাঁস গলায় পরে দু'একবার চিৎকার করার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে থেমে গেল তারপর খাঁড়ার প্রচণ্ড ঘায়ে একদিকে ছিটকে গেল তার মুণ্ডটা। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত সবাই মহোল্লাসে চিৎকার ক'রে উঠ্লো :—"কালী মায়ি কি জয়।"

দু'জন লোক পাঁঠার মুণ্ডহীন ধরটা নিয়ে এলো ঘরের দরজার কাছে—যেখানে দাঁড়িয়ে আছে গিরিবালা। ধর থেকে রক্ত ছুটছে তীরের মতো। গিরিবালা হাঁটু ভেঙে হাত পাতলো। দেখতে দেখতে পাঁঠার তাজা রক্তে পূর্ণ হয়ে উঠলো তার অঞ্জলি।

খানিকক্ষণ দু'চোখ বন্ধ ক'রে হয়তো মন্ত্র পড়লো গিরিবালা। তারপর চুমুক দিল অঞ্জলিভরা রক্তে। বারকয়েক চুমুক দিয়ে খানিকটা রক্ত পান করার পর সে হাত ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ঢাক বেজে উঠলো আরও তারস্বরে এবং সমানে দিগন্ত ফাটিয়ে চললো কাঁসর! গিরিবালার কম্পিত ঠোঁট রক্তে লাল। সমবেত জনতা আরেকবার "কালী মায়ি কি জয়" ব'লে মাটির প্রতিমা ছেড়ে ছুটে এলো গিরিবালার দিকে। তারপর টাকা, পয়সা, ফুল ইত্যাদি তার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে গড় হয়ে আছড়ে পড়লো উঠোনে। সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধুটিও তাই করলো। কারণ মা-কালী এবার মাটির প্রতিমা ত্যাগ ক'রে ভর ক'রেছে গিরিবালার দেহে।

গিরিবালার সামনে সবাই গড় হ'য়ে পড়েছে। কেবল গড় হইনি আমরা দু'জন। আমি আর চক্রবর্তী-কাকা। তাই চারদিকে চোখ বুলিয়ে গিরিবালা একবার অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকালো। কিন্তু তাকাতেই সে চমকে উঠলো, সম্ভবতঃ চক্রবর্তি কাকাকে দেখে। চক্রবর্তী কাকার চোখে চোখ রেখে সে যেন মুহূর্তেই অস্থির হয়ে উঠলো এবং অনুভব করতে লাগলো এক অপরিসীম যন্ত্রণা। আমার মনে হলো: যেন এক বন্দিনী আধমরা সিংহী সামনে কোনো মুক্তির আভাস পেয়ে ছটফট করছে। এ-অবস্থা লক্ষ্য ক'রে গিরিবালার দু'পাশের দু'জন লোকও এবার উঠে দাঁড়ায় আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে। মুখ ফেরাতেই এ-দুজন লোককে এবার স্পষ্ট চেনা গেল। এরা সেই লোক—যারা বছর পাঁচেক আগে কোনো এক গভীর রাত্রে গিরিবালার বস্তির ঘরে মদ খেয়ে মারামারি করছিল। সম্ভবতঃ তারাও চক্রবর্তী কাকাকে চিনতে পারলো। তাই তৎক্ষণাৎ তারা গিরিবালাকে ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে গেল ঘরের ভেতর। সঙ্গে

সঙ্গে থেমে গেল ঢাক এবং কাঁসর। ঘরের ভেতর থেকেই একজন লোক চিৎকার ক'রে বললো ঃ

—"মা আজ প্রসন্ন নন। তাই আজ আর তিনি দেখা দেবেন না।"

আমি লক্ষ্য করলাম ঃ চক্রবর্তী-কাকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ কাঁপছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে থেকে, শেষে উল্টো দিকে ফিরে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। আমিও তাঁকে অনুসরণ করলাম। বন্ধুটি গড় হয়েপ'ড়ে রইলো উঠোনেই।......

অন্ধকার সরু পথ দিয়ে নিঃশব্দেই খানিকক্ষণ হাঁটার পর আমি এক সময় চক্রবর্তী-কাকাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ— "গিরিবালাকে দেখে আপনার কী মনে হলো ?"

তিনি অনেকক্ষণ এ-কথার জবাব দিলেন না। তারপর এক-সময় নিজের মনেই বললেন ঃ- "মেয়েটা একদিন তার কুপ্রবৃত্তির মোহে নিজেই এ-পথে নেমেছিল। কিন্তু আজ সে অস্থির হয়ে উঠেছে। অথচ মুক্তির কোনো উপায় নেই। অসৎ লোকেরা আজ তাকে সুকৌশলে বন্দী ক'রে নিজেদের কদর্য স্বার্থ উদ্ধার করছে।"

আমি বললাম ঃ—"মুক্তির উপায় নেই কেন ? ইচ্ছে করলেই তো সে পুলিশে খবর দিয়ে এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে।"

খানিকক্ষণ নীরব থেকে তিনি আবার বললেন ঃ—"সুচতুর অসৎ লোকদের হিংস্র কৌশল ও পাহারা এড়িয়ে তার পক্ষে পুলিশে খবর দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া পুলিশের সাহায্যে বা অন্য কোনো উপায়ে এদের আখড়া থেকে বেরিয়ে এলে, এ-সমস্ত ঘটনার পর এ-বয়সে সে আর অন্য কোথাও ঠাঁই পাবে না—

এ-কথা সে বোঝে। তাই আজ নিরুপায় হয়ে অসৎদের হাতেই সঁপে দিয়েছে নিজেকে, আর ভোগ করছে নির্যাতন।

এ-কথা বলার পরেই চক্রবর্তী-কাকার বুক থেকে একটা ভারি দীর্ঘশ্বাস ঝ'ড়ে পড়ে। খানিকক্ষণ আমিও নীরব থাকি। তারপর এক সময় আবার বলি:—"কিন্তু এজন্য দায়ী তো গিরিবালা নিজেই।"

তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বললেন:—"হ্যাঁ, খানিকটা সে হয়তো দায়ী। কিন্তু সব চাইতে বেশি দায়ী আমাদের সমাজ। দেশের সর্বত্রই জ্বলছে সমাজের আলো। কিন্তু সে-আলো আজ নিজেই অন্ধ। তাই পথ দেখাতে পারে না।

অন্ধকারে গ্রামের সরু পথ ঠিক দেখা যায় না। তবু আমরা হাঁটছি। হোঁচট খেয়েও পড়ছি মাঝে মাঝে। আকাশে জ্বলছে অজস্র তারা। কিন্তু তারার আলোয় পথের অন্ধকার সরে না। সত্যিইতো পথ যদি অন্ধকারই রইলো, তবে সারা আকাশ জুড়ে এত অজস্র তারা জ্বলায় লাভ কি?

———

বৃক্ষদেবতা

পূর্ব-কলকাতার কোনো এক বনেদী পাড়া। এ-পাড়ার বাড়ী-ঘরগুলো বহুকালের পুরোনো হলেও বর্তমানে সংস্কারসাধিত। রাস্তা-ঘাটগুলোও গ'ড়ে উঠেছে নতুনভাবে। এ-পাড়ারই কোনো এক বিশেষ বাড়ীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা বৃদ্ধ অশ্বত্থ। এ-অশ্বত্থ এককালের একটা গাছ হিসেবেই পরিগণিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে আর গাছ নয় দেবতা। গাছের গোড়ায় গ'ড়ে উঠেছে মাটির পবিত্র বেদী। বেদীমূলে অর্পিত নানান জাতীয় ফুল, চন্দন এবং সিঁদুরের একাধিক তিলক আঁকা তার প্রশস্ত ললাটে। পাশেই ব'সে থাকে কিশোর পুরোহিত। বয়স তার পনেরো থেকে ষোলো। এ-বৃক্ষ-দেবতার সেই একমাত্র পূজারী।

দিনান্তে পাড়ার বনেদী নারী-পুরুষ এসে সমবেত হয় এখানে। প্রথমতঃ সবাই গড় হয়ে প্রণাম জানায় কিশোর পুরোহিতকে, তারপর বৃক্ষ-দেবতার পবিত্র বেদীমূলে অর্পণ করে বিভিন্ন পূজো-উপচার। মাঝে মাঝে পুরোহিতটির দেহে হঠাৎ ভর করেন দেবতা। পুরোহিতটি সবাইকে অবাক ক'রে হঠাৎ এক সময় দেহ কাঁপিয়ে উঠে দাঁড়ায়। গাছটার চারপাশ ঘিরে খানিকক্ষণ নাচে, তারপর ভীত-চকিত ভক্তদের উদ্দেশে দান করে অলৌকিক বাণী। মাঝে মাঝে বিভিন্ন লোকের প্রশ্নেরও উত্তর দেয়।

এ-ব্যাপারে পাড়ার প্রবীণ ব্যক্তিরা গর্ব অনুভব করেন। কেনই বা করবেন না? কলিযুগে এমন একটা দেবতার জাগ্রত উপস্থিতি সব পাড়ার ভাগ্যে কি জোটে?......অবশ্য পাড়ার আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত কোনো কোনো যুবক এ-দেবতাকে বিশ্বাস করে

না। কারণ তারা এর জন্মের ইতিহাস জানে এবং জানে বলেই বেশ একটু কৌতুক অনুভব করে এ-ব্যাপারে। অবশ্য ইতিহাসটা প্রবীণরাও জানেন। কিন্তু তাঁরা সেই ইতিহাসকে গ্রহণ করেছেন ভক্তি-রসের মাধ্যমে। অর্থাৎ তাঁরা বিশ্বাস করেনঃ দেবতা আবির্ভূত হন নানা অছিলায়। অতএব এখানকার এ-ইতিহাসটাও একটা অছিলা মাত্র— যে-অছিলার মাধ্যমে সত্যই আজ আত্মপ্রকাশ করেছেন বৃক্ষদেবতা।

ইতিহাসটা আমারও অবিদিত নয়। এই বৃক্ষ-দেবতার আবির্ভাব-বৃত্তান্ত মাত্র দিনকয়েক আগে আমিও শুনেছি আমার এক বন্ধুর কাছে। বন্ধু এ-পাড়ারই বাসিন্দা। এ-সম্বন্ধে সে যা বলেছে—তা সত্যই চমকপ্রদ এবং চমকপ্রদ বলেই আজ তা আপনাদের কাছেও উপস্থিত করছি আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের মাধ্যমেঃ

বর্তমান গাছটা যে-বাড়ীর গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সে-বাড়ীর একটা প্রশস্ত রক্ ছিল এককালে। রক্‌টা ছিল বাড়ীর জানালা-ঘেঁষা এবং তার অবস্থান ছিল গাছটার ঠিক পাশেই। পাড়ার গুটিকয় ডানপিটে যুবক এই রকে বসেই আড্ডা দিত দিনরাত। আড্ডার আলোচনা কোনো এক বিশেষ ব্যাপারে সীমাবদ্ধ থাকতো না। ময়দানের খেলা-ধূলা থেকে শুরু ক'রে বম্বে সিনেমার নায়ক-নায়িকা এবং সেই এলাকাস্থ কোনো কোনো মেয়ের বিশেষ চাল-চলন সম্বন্ধে প্রায়দিনই এদের মধ্যে আলোচনার ঝড় বয়ে যেতো। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো দিন গভীর রাত পর্যন্ত এরা রকে বসেই বম্বে সিনেমার অশ্লীল গান গাইতো সমবেত কণ্ঠে, আর কেউ কেউ সিমেণ্টের ওপরই সজোরে চাঁটি মেরে বোল

বাজাতো তবলার। এদের এই অ-শালীন আড্ডার মাত্রাহীন অত্যাচারে ক্রমেই উত্যক্ত হয়ে ওঠেন রক্-সংলগ্ন বাড়ীটার বাসিন্দারা। প্রায় রাতেই তাঁদের ঘুম হতো না আড্ডাবাজদের বেসুরো চিৎকারে। অথচ প্রকাশ্যে কিছু বলতেও তাঁরা পারতেন না। কারণ এ-সমস্ত যুবককে তাঁরা ভালো করেই চেনেন। এরা ন্যায় নীতির কোনো ধার ধারে না। যে-কোনো মুহূর্তেই এরা সোডার বোতল ছুঁড়তে পারে, বোম ফাটাতে পারে এবং অবহেলায়

অপমান করতে পারে যে-কোনো সম্মানীয় ব্যক্তিকে। অতএব পাড়ার শান্তিপ্রিয় লোক স্বাভাবিক কারণেই এদের এড়িয়ে চলেন এবং উক্ত বাড়ীর বাসিন্দারাও সাহস ক'রে কিছু বলতে পারেন না এদের। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে বাড়ীর মালিক শেষ পর্যন্ত একটা উপায় স্থির করেন। অর্থাৎ তিনি একদিন জনকয়েক মজুর ডেকে এনে সমস্ত রক্‌টা ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা ক'রে দেন যে, পারিবারিক প্রয়োজনেই

তিনি রক্‌টা ভাঙছেন। রক্‌টা সম্পূর্ণ ভাঙার পর, ইট-সুরকি সরিয়ে নিয়ে তিনি ও-জায়গায় রোপণ করেন গুটিকয় ফণি-মনসার চারা।···

···কিন্তু তাতেও আড্ডাবাজদের আড্ডার কোনো অসুবিধে হলো না। বাড়ীর গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে যে-অশ্বত্থ গাছটা, এবার তার তলেই চাটাই পেতে ওরা জমায় নতুন আড্ডা। এ-আড্ডার মাত্রা আরও উগ্রতর হয়ে ওঠে। কেবল আলোচনা বা গানই নয়, অনেক রাত পর্যন্ত এবার যাত্রা থিয়েটারের মহড়াও চলতে থাকে গাছতলায়।

রক্‌টা ভেঙে ফেলেও ওদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেলোনা ব'লে বাড়ীওয়ালা এবার গাছটাও কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। কথাচ্ছলে পাড়ার অনেককেই তিনি বললেন ঃ বাড়ীতে তার পরিবারের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। স্থান সংকুলান হয় না। তাই বাড়ীর পরিধি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই গাছটা তিনি কেটে ফেলবেন।

আড্ডাবাজ যুবকরা গাছ কেটে ফেলার সংবাদ পেয়ে এবার একটু বিচলিত হলো। যিনি বাড়ীর মালিক, তিনি গাছেরও মালিক। গাছটা কেটে ফেলার পক্ষে তিনি যে-যুক্তি দেখিয়েছেন তাতে প্রতিবাদ করার কিছু নেই। অথচ গাছটা কেটে ফেললে তাদের আড্ডা দেবার শেষ সম্বলটুকুও ঘুচে যাবে। তাই কী-ভেবে দিনকয়েক গাছতলায় আসা তারা বন্ধ করলো।

···কিন্তু বাড়ীওয়ালা তাতেও দমলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন ঃ আপাততঃ গাছতলায় ওরা না এলেও দিনকয়েক বাদে আবার নিশ্চয়ই আসবে এবং আড্ডা জমাবে আগের মতোই। অতএব গাছটা কেটে ফেলাই যুক্তিযুক্ত। ভেতরে ভেতরে তিনি

গাছটা কেটে ফেলার আয়োজনাদি চালাতে লাগলেন। কয়েকজন মজুর এসে গাছটা দেখে গেল এবং জানিয়ে গেল ঃ দিন-দুই পরে এসেই তারা গাছটাকে কেটে দিয়ে যাবে।

কিন্তু যেদিন মজুররা এসে গাছটাকে দেখে গেল, ঠিক তার পরের দিনই হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটলো গাছতলায়। ঘটনাটা কেবল চমকপ্রদ নয়, অভূতপূর্ব। এ-পাড়ারই একটি পনেরো কিংবা ষোলো বছরের কিশোর সূর্যোদয়ের আগেই হঠাৎ গাছতলায় এসে দেহ কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে নাচতে থাকে, আর বলতে থাকে চিৎকার ক'রে ঃ

—"আমি স্বয়ং শিব। এখানে এই অশ্বত্থরূপে আমি বিরাজ করছি আজ নিয়ে ত্রিশ বছর। আমার দেহরূপ যে-গাছ, সে-গাছ কেটে ফেলতে চায় কে? তাকে আমি নির্বংশ ক'রবো" ইত্যাদি ইত্যাদি···

কিশোরটির চিৎকার শুনে পাড়ার সেই আড্ডাবাজ যুবকরা প্রথমত খালি হাতেই ছুটে আসে। তারপর এদিক-ওদিক ছুটে গিয়ে কেউ নিয়ে আসে ফুল এবং কেউ শঙ্খ। শঙ্খ বাজিয়ে এবং কিশোরটির প্রতি রাশি রাশি ফুল ছুঁড়ে তারাও চিৎকার ক'রে বলতে থাকে ঃ "দেবতা ভর করছে, দেবতা ভর করেছে।"

দেখতে দেখতে গাছতলায় ভেঙে পড়ে সমস্ত পাড়া। সবাই ভীত-চকিত এবং ভক্তিতে বিহ্বল।

কিছুক্ষণ পর কিশোরটি শান্ত হয়ে ঢ'লে পড়ে মাটিতে এবং তারপর ধীরে ধীরে ফিরে আসে স্বাভাবিক অবস্থায়। সবাই বুঝলো ঃ দেবতা এই কিশোরটির পবিত্র দেহে ভর করেছিল। এখন আবার দেহ ছেড়ে ফিরে গেল গাছে। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বাড়ী থেকে আসতে লাগলো পূজো-উপচার। সুরু হলো বৃক্ষ-

দেবতার পূজো। পরের দিনই গাছের গোড়ায় গ'ড়ে উঠলো বেদী এবং চন্দন ও সিঁদুরের ফোঁটায় সুশোভিত হ'লো বেদীর প্রশস্ত ললাট। যেহেতু দেবতা ভর করেছিল কিশোরটিরই দেহে, সেহেতু কিশোরটিকেই নিযুক্ত করা হলো একমাত্র পূজারী। আড্ডার সঙ্গে এবার ঢাক-ঢোলও বাজতে লাগলো গাছতলায়।

বাড়ীওয়ালা এ-ব্যাপারটাকে পুরোপুরি ষড়যন্ত্র মনে ক'রে পুলিশে খবর দিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ যখন আসে, তখন কেবল দেবতাই প্রতিষ্ঠিত হননি, দেবতার বেদীমূলে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে সমস্ত পাড়ার অনাবিল ভক্তি। কাজেই পুলিশের পক্ষেও আর কিছু করা সম্ভব হয়নি।

বাড়ীওয়ালা বর্তমানে উপায়গতিক না দেখে বাড়ীটা বিক্রি ক'রে অন্যত্র চলে যাবার কথা চিন্তা ক'রেছেন।

———

অধ্যাপক সেন

ঝাউতলার অধ্যাপক সেন আজকাল আর হাসেন না। বয়সে তিনি প্রবীণ। চুলে পাক ধরেছে। প্রতি বিকেলেই তিনি তাঁর দোতলা বাড়ীর খোলা বারান্দায় এসে নিয়মিত বসেন। বারান্দার একধারে মাটির টবে মাথা তুলেছে একটা গোলাপের চারা। তার দিকেই তিনি তাকিয়ে থাকেন উদাস দুটো চোখ মেলে। মাঝে-মাঝে তাঁর বুক থেকে হঠাৎ ঝ'রে পড়ে দীর্ঘশ্বাস এবং দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গেই দু'একটা শব্দ। অর্থাৎ টবের চারা-গাছটির দিকে তাকিয়েই মাঝে মাঝে অতি অস্ফুট কণ্ঠে তিনি বলেন ঃ

—"আমি কি সত্যই ভুল করেছি?"

বাড়ীটা তাঁর রাস্তার গা-ঘেঁষেই এবং রাস্তা থেকে দোতলার দূরত্বও বেশ অল্প। তাই তাঁর এ-কথা অস্ফুট হলেও, অনেক সময় তা রাস্তা থেকেও শোনা যায়। এমন কি, তাঁর দীর্ঘশ্বাসের হতাশ ধ্বনিও মাঝে-মাঝে এসে আছাড় খায় রাস্তার মাটিতে। তাই এ-পথ দিয়ে যেতে আসতে অনেক সময় চম্‌কে ওঠে অচেনা-অপরিচিত পথিক। অবশ্য যারা এ-পাড়ারই বাসিন্দা—তারা বড়ো একটা চম্‌কায় না। তবে যেতে-আসতে অধ্যাপক সেনের দিকে সবাই একবার গভীর চোখ মেলে তাকায়। তাকিয়ে সম্ভবতঃ ব্যথা পায়। তাই পরক্ষণেই আবার চোখ নামিয়ে বেশ নিঃশব্দেই তারা অতিক্রম করে রাস্তার এ-অংশটুকু। বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়ে এ-পাড়ার অতি আধুনিকরাও রাস্তার এ-অংশে এসে সংযত করে তাদের চপল চরণ। শ্রদ্ধা-ভয়ে দোতলার খোলা বারান্দায় তারাও একবার তুলে ধরে তাদের ভারি-ভারি চোখ। তারপর সাবধানী

পা ফেলে ধীরে ধীরে নিঃশব্দেই তারা পার হয়ে যায় অধ্যাপক সেনের বাড়ীটা।

অধ্যাপক সেন অবশ্য মঝে-মাঝে রাস্তার দিকেও তাকান। তবে মুখ তাঁর তেমনই গম্ভীর থাকে এবং চোখ দুটোও থাকে অস্বাভাবিক রকম উদাস। তাঁর এই উদাস চোখ, আর অতি গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে এ-পাড়ার আকাশটাও যেন নির্বাক
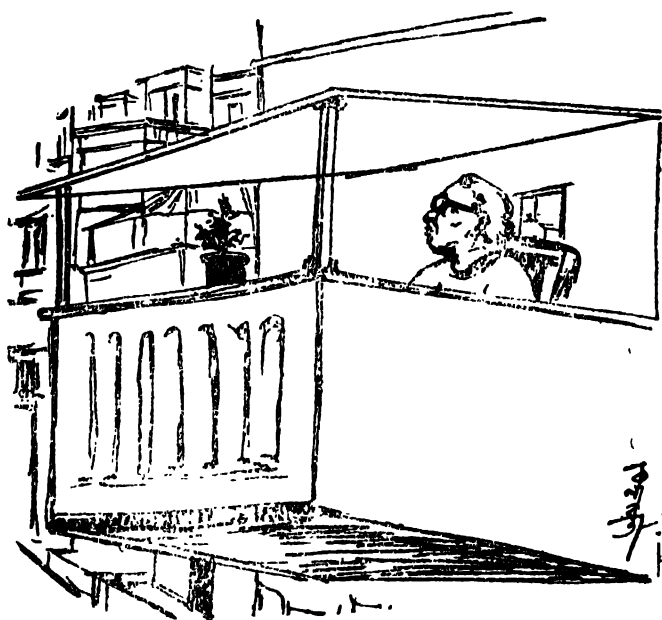
বৈরাগী এবং বাতাসও যেন ভীরু পাখির মতো নিঃশব্দেই আসে, আর যায়।

অথচ অধ্যাপক সেন তো এমন ছিলেন না। মাত্র মাস-কয়েক আগের তাঁর প্রাণখোলা হাসির উল্লাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো সমস্ত

পাড়াটা। তাঁর সপ্রীতি-সদালাপে শান্তির ছায়া নামতো এ-পাড়ার ঘরে ঘরে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কর্ম-চঞ্চল মনটিই ছিল এ-পাড়ার অমূল্য সম্পদ। তাঁর সান্নিধ্য লাভে এ-পাড়ার বয়স্করা যেমন খুশি হতেন, তেমনই তাঁর সংস্পর্শে এসে অপরিসীম তৃপ্তি পেতো এ-পাড়ার তরুণ-তরুণীরাও। তিনি এ-যুগের একজন বিদগ্ধ অধ্যাপক। অথচ তা সত্ত্বেও তাঁর চরিত্র ছিল শিশুর মতোই সরল। তাই সময়ে-অসময়ে এ-পাড়ার ছোটরা দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়তো তাঁর বুকে। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে সবাইকে জড়িয়ে ধরতেন, প্রাণ খুলে হাসতেন এবং আদর করতেন বুকের সমস্ত স্নেহ উজাড় ক'রে। এ-পাড়ার স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও তাঁর অকাতর সাহায্য লাভে কোনোদিন বঞ্চিত হতো না। সম্ভবতঃ তাঁর এই আন্তরিক সাহায্যের গুণেই এ-পাড়ার কোনো ছাত্র বা ছাত্রী তাদের পরীক্ষায় আজ পর্যন্ত তেমন খারাপ রেজাল্ট করেনি।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই অধ্যাপক সেন আজ নির্বাক। আজকাল অধ্যাপনার কাজও তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। মাত্র ক'মাসের ব্যবধানেই স্বাস্থ্য তাঁর ভেঙে পড়েছে। সঙ্কুচিত হয়েছে তাঁর প্রশস্ত বুক—যে-বুকে আজ আসন পেতেছে এক দুঃসহ যন্ত্রণার সন্ন্যাসী। সম্ভবতঃ তারই ফলে আজ পাল্টে গেছে তাঁর কর্ম-চঞ্চল চরিত্র, নিভে গেছে তাঁর জ্যোতির্ময় হাসি এবং কোথায় যেন হারিয়ে গেছে তাঁর অনর্গল কথার ঝর্ণা।

আজ প্রায় অনেক কাল ধ'রে এই ঝাউতলা পাড়াতেই সপরিবারে বসবাস ক'রে আসছেন অধ্যাপক সেন। তিনি অধ্যাপনা করতেন কলকাতারই এক বেসরকারী কলেজে এবং তাঁর একমাত্র কৃতী সন্তান সন্দীপ সেন পড়াশোনা করতো অন্য এক

কো-এডুকেশন সরকারী কলেজে। সন্দীপ সেন ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত মেধাবী ছিল এবং সে সরকারী বৃত্তিও পেতো। একমাত্র ছেলে বলেই তাকে মনের মতো ক'রে গ'ড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন অধ্যাপক সেন এবং তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে তাকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন এক কো-এডুকেশন সরকারী কলেজে।

আজ থেকে মাত্র এক বৎসর আগে এই সরকারী কলেজ থেকেই বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে বি এ পাশ করে সন্দীপ সেন। বি এ পাশের খবর যেদিন বেরোয়—ঠিক সেদিনই ছোট একটি গোলাপের চারা সে নিয়ে আসে বাড়ীতে। তার বাবা অর্থাৎ অধ্যাপক সেন তা' দেখতে পেয়েই জিজ্ঞেস করেন ঃ

—"এই চারা গাছটা কোথায় পেলে ?"

সন্দীপ উত্তর দেয় ঃ

—"লিলি দিয়েছে।"

লিলি মানেই তার কলেজের সহপাঠিনী। এ-নাম অধ্যাপক সেন আগেও দু'একবার শুনেছেন এবং প্রতিবারই ভেবেছেন ঃ লিলি তাঁর ছেলের নিছক বান্ধবীই। এর মধ্যে অন্য কোনো ব্যাপার নেই। সুতরাং এবারও তাই ভেবে বেশ খুশিই হন চারা গাছটা পেয়ে এবং তিনি নিজেই ওটাকে মাটির টবে বসিয়ে স্থাপন করেন দোতলার বারান্দায়।

কিন্তু লিলি ও সন্দীপের মধ্যে যে ইতিমধ্যেই ভাব বিনিময় হয়ে গেছে এবং উভয়ের মধ্যে চলছে গভীর ভালোবাসা—সেদিন অধ্যাপক সেন তা' বুঝতে পারেন নি। তবে বুঝতে পারলেন আরও কিছুদিন পর, যেদিন সন্দীপেরই পরামর্শে লিলির বাবা এসে অধ্যাপক সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং লিলির সঙ্গে

সন্দীপের বিয়ের প্রস্তাব পেশ করলেন সরাসরি। তাছাড়া কথা প্রসঙ্গে এ-কথাও তিনি প্রকাশ করলেন যে, উভয়ে উভয়কে গভীরভাবে ভালোবাসে।

অধ্যাপক সেন স্থির মস্তিষ্কে একে একে সব কথাই শোনার পর নীরবে খানিকক্ষণ কী-যেন ভাবলেন। তারপর আসন ছেড়ে বার-কয়েক এদিক-ওদিক পায়চারী করার পর লিলির বাবার সামনে এসে অত্যন্ত ভদ্রভাবেই প্রত্যাখ্যান করলেন তাঁর প্রস্তাব। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকেও কাছে ডেকে বেশ শান্ত কণ্ঠে বুঝিয়ে বললেন ঃ

—"তুমি আমার একমাত্র ছেলে। আজও তুমি পুরোপুরি মানুষ হওনি। জীবনের আরও অনেক কর্তব্যই তোমার বাকি রয়ে গেছে। অতএব আমি আশা করি, আমার একমাত্র সন্তান হিসেবে তুমি তোমার কর্তব্য-কর্মে অটল থাকবে এবং এত তাড়াতাড়ি এ সব ব্যাপারে বিশেষ মাথা ঘামাবে না।"

সন্দীপ বাপের বাধ্য ছেলে। এ-ব্যাপারে প্রতিবাদ করার সংসাহস তার হলো না। তাছাড়া সম্ভবতঃ প্রেমের ব্যাপার বলেই বেশ খানিকটা লজ্জা পেয়ে সে নিঃশব্দেই স'রে এলো তার বাবার সামনে থেকে।

কিন্তু লিলির বাবা ওদিকে আর ব'সে রইলেন না। তিনি কঠোর বাস্তববাদী। ঘরের যুবতী মেয়েকে ঠিকমতো পার করা তাঁর পক্ষে পরম কর্তব্য। অতএব সন্দীপের বাবা অর্থাৎ অধ্যাপক সেনের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে লিলির জন্য তিনি অন্য পাত্রের সন্ধান সুরু করলেন।

লিলির পক্ষে কিন্তু একমাত্র সন্দীপ ছাড়া অন্য লোকের কথা

চিন্তা করা দুঃস্বপ্ন। তার বাবা তার জন্য অন্য পাত্রের সন্ধান করছেন বুঝতে পেরে সে ছুটে আসে সন্দীপের কাছে। তারপর ছলোছলো চোখে তার হাত দুটো ধ'রে অতি করুণ কণ্ঠে বলে ঃ

—"যেভাবেই হোক, তুমি তোমার বাবাকে রাজী করাও। নচেৎ কেউ আমরা সুখী হতে পারবো না। হয়তো শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকাটাও আমাদের পক্ষে কঠিন হবে।"

সন্দীপও জানে, লিলি ছাড়া সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব। যাকে সে সমস্ত হৃদয় এবং জীবনের সমস্ত সাধনার বিনিময়ে এতদিন কামনা ক'রে আসছে, আজ সে হবে অন্যের জীবন-সঙ্গিনী—এ-কথা তার পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। তাই সে এবার লজ্জা-ভয় ত্যাগ ক'রে সরাসরি তার বাবার সম্মুখীন হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর দুটো পা জড়িয়ে ধরে কাতর প্রার্থনা জানায় নানাভাবে। কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হলো না, মন গ'ললো না অধ্যাপক সেনের। বরং এবার তিনি অতি রুক্ষ স্বরেই বললেন ঃ

—"তোমাদের এ-ধরণের ভালোভাসায় আমার কোনো সহানুভূতি নেই। অতএব এ-বিয়ে আমি কিছুতেই ঘটতে দেবো না। তুমি যদি অবাধ্য হও, তাহলে স্থির জেনে রেখো ঃ আমার একমাত্র পুত্র হলেও, তোমাকে আমি ত্যাজ্য পুত্র করতে কুণ্ঠিত হবো না।"

অধ্যাপক সেনের এ-কথার পর বাধ্য হয়েই হাল ছেড়ে দেয় সন্দীপ। তার এই চরম ব্যর্থতার সংবাদ যথাসময়েই লিলির কাছে পোঁছয় এবং পোঁছয় লিলির বাবার কাছেও। অতএব আর কোনো আশাই নেই বুঝতে পেরে, লিলি এবার বাধ্য হয়েই আত্মসমর্পণ করে তার বাবার কাছে। অবস্থা আয়ত্তে আসায় লিলির বাবাও এবার তৎপর হয়ে ওঠেন এবং দিন-কয়েকের মধ্যেই

বেশ ঘটা ক'রে তিনি মেয়ের বিয়ে দেন অন্যত্র। বুকভরা অভিমান চোখের জলে ভাসিয়ে, হাজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অচেনা পতিগৃহে যাত্রা করে লিলি!

কিন্তু সন্দীপ? সন্দীপের দু'চোখে এবার সত্যই নেমে আসে দুঃস্বপ্ন। লিলি আর নেই—এ-কথা ভেবেই সে অস্থির হয়ে ওঠে

অস্বাভাবিক রকম। বাতাস যেন হাহাকার হয়ে বাজতে থাকে তার কানে। সমস্ত পৃথিবীটাকেই মনে হয় শূন্য এবং তার জীবনটাও যেন আর সত্য নয় এ-পৃথিবীতে। অতএব দিন-কয়েক নিজের ঘরে একভাবে আবদ্ধ থাকার পর একদিন সকলের অগোচরেই সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে আর কোনোদিন ফিরবে না ব'লে।

সত্যই আর ফিরলো না সন্দীপ। পরদিন পুলিশের হেফাজতে ফিরে এলো কেবল তার প্রাণহীন দেহটা লেকের জল থেকে। সে-দৃশ্য দেখেই প্রথমতঃ জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন সন্দীপের মা, তারপর জ্ঞান ফিরতেই তিনি হলেন প্রকৃত উন্মাদিনী। বর্তমানে তাঁর দিন কাটছে কোনো এক উন্মাদ-আশ্রমে।

আর অধ্যাপক সেন? তিনিও তাঁর অফুরন্ত সময়কে ছেড়ে দিয়েছেন দোতলার বারান্দায় চারা গাছটার সামনে। লিলির ভালোবাসার উপহার একমাত্র এই চারাগাছটাই আজ তাঁর ছেলের প্রতীক। তাই এই চারা গাছটাকেই উদ্দেশ ক'রে মাঝে মাঝে তিনি বলছেন ঃ

—"আমি কি সত্যই ভুল করেছি?"

কে জানে বিকেলের নিঃশব্দ হাওয়ায় দুলতে দুলতে হয়তো চারা গাছটাও উত্তর দিয়ে চলেছে প্রত্যহ ঃ

—"অধ্যাপক সেন, তুমি সত্যই ভুল করছো, ফাঁকি দিয়েছ নিজেকেই।"

———

ফুলবাগানের ফুলবানু

ফুলবাগানের ফুলবানু ফুলের আস্বাদ আজও পেলো না। ফুলের লোভে একবার হাত বাড়িয়েছিল কাঁটাগাছের ডালে। কিন্তু ফুল সে ধরতে পারেনি কিংবা ফুলই ধরা দেয়নি তাকে। কেবল হাতে বিঁধেছে বিষাক্ত কাঁটা—যার জ্বালা সংক্রামিত হয়েছে মনেও। অতএব আজও সে ওই জ্বালাতেই ভুগছে এবং জীবনের ডাল থেকে একে একে ঝ'রে যাচ্ছে অজস্র হলুদ পাতা। বয়স তার বাড়ছে। তবু ভবিষ্যৎ তার ধারে-কাছে আসে না। সময় সময় ভাবে ঃ গলায় দড়ি দেবে। কিন্তু সাহস হয় না কিংবা সাহস হলেও, মায়া কাটাতে পারে না গুটিকয় ব্যাঙাচির—যারা তারই গর্ভজাত ব'লে পরিচিত। তাই আজও ফুলবাগানের পথে বসেই সে দিন গুণছে। এ-দিন গোণা কিসের—তা' সে নিজেও জানে না। পাড়ার লোকেরা তাকে বলে ঃ ডাইনী। তার মুখ দেখলেই নাকি যাত্রা নষ্ট হয়। তাই কেউ কেউ তাকে গাল দেয়, অভিশাপ দেয় এবং কেউ তার মৃত্যু কামনা করে প্রকাশ্যেই। কেবল এ-পাড়ার মতিয়া বুড়ি তাকে সে-চোখে দেখে না। কারণ ফুলবানুকে সে গোড়া থেকেই চেনে এবং চেনে বলেই মনে মনে তার জন্য দুঃখও অনুভব করে খানিকটা। যারা তাকে ডাইনী ভেবে অভিশাপ দেয়, মতিয়া বুড়ি কোনোদিনও তাদের পক্ষ নেয় না। বরং সুযোগ পেলেই ফুলবানুর দুঃখময় জীবনেতিহাস বর্ণনা ক'রে কারো কারো কাছ থেকে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করে।

আমিও মতিয়া বুড়িরই প্রতিবেশী। কথায়-কথায় তার কাছেই একদিন শুনেছিলাম ফুলবানুর জীবন-বৃত্তান্ত। তারপর পথ চলতে

চলতে নিছক কৌতূহলবশতঃই একদিন চোখ ফিরিয়েছিলাম তার আস্তানারূপ আঁস্তাকুড়ের দিকে। সুতরাং মতিয়া বুড়ির কাছেই যা শুনেছি এবং দেখেছি যা নিজের চোখে—তাই আজ সহজভাবে উপহার দিচ্ছি আমার পাঠকপাঠিকাকে ঃ

পাঁচ-পাঁচটি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে আজ যেখানে প'ড়ে আছে

ফুলবানু—ঠিক তার পাশের বস্তিতেই একদিন তার জন্ম হয়। তার জন্মের বছর-খানেক পরেই হঠাৎ অসুখে মারা যায় তার বাপ। বাপ ছিল একটি বে-সরকারী কারখানার সামান্য শ্রমিক। তাই মৃত্যুর পর সে স্ত্রী-কন্যার জন্য কিছুই তেমন রেখে যেতে পারেনি।

ফলে মেয়েকে নিয়ে দারুণ দুর্ভাবনায় পড়ে ফুলবানুর বিধবা মা। এমন সময় এ-পাড়ার মতিয়া বুড়িই তাকে এসে উপদেশ দেয় গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে বানাতে। উপায়-গতিক না দেখে, শেষে এ-পথই তাকে গ্রহণ করতে হয়। তারপর স্থুরু হয় মা-মেয়ের কঠিনতম জীবনযাত্রা।.........

মা সাত-সকালে বেরিয়ে রাস্তা-ঘাট ও বিভিন্ন খাটাল থেকে গোবর কুড়িয়ে আনে। তারপর দিনমান ব'সে ব'সে তা দিয়েই ঘুঁটে বানিয়ে শুকোতে দেয় নর্দমার পাশের দেয়ালে। ফুলবানু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যহ তা দেখে এবং দেখতে দেখতেই একসময় এসে পদার্পণ করে কৈশোরের সবুজ সিঁড়িতে। তারপর একদিন সে এগিয়ে আসে মায়ের কাজে সাহায্য করতে। কিন্তু মা তাকে ধমক দিয়ে ফিরিয়ে দেয়। তারপর বলে:

—"তুই আমার একমাত্র মেয়ে। ঘুঁটে বানাবি কেন? এ-কাজ আমাকেই করতে দে। আর কিছুদিন পরেই আমি তোর ভালো ঘরে বিয়ে দেবো। স্বামীর সঙ্গে তুই শান্তিতে ঘর করবি—এই তো আমার আশা। এ-বয়সে ঘুঁটেওয়ালি হবি কেন? ঘুঁটেওয়ালিকে কেউ বিয়ে করতে চায় না।"

অগত্যা মাকে সাহায্য করার সংকল্প ত্যাগ করতে হয় ফুলবানুকে। সে ঘরে বসেই কাঁথা সেলাই করে, আর মা গোবর ঘেঁটে দিনরাত পরিশ্রম করে বাইরে। এভাবেই দিন চলে। দেখতে দেখতে কৈশোরের সীমাও অতিক্রম ক'রে যৌবনের প্রথম ঘাটে পা রাখে ফুলবানু।

ঠিক এই সময় মা একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ে হঠাৎ। ফুলবানু নিজেকে মায়ের সেবায় নিয়োজিত করে সর্বক্ষণ। কিন্তু আপ্রাণ সেবাতেও মায়ের অসুখ আর সারে না। দিন যায়,

রাত যায়, ক্রমশঃই বেড়ে চলে মায়ের রোগ। ঘরে ঘুঁটে বিক্রীর যে-সামান্য সম্বল ছিল—তা শেষ হয় ছুদিনেই। ফলে উনোনে আর হাঁড়ি চড়ে না এবং পথ্যও জোটে না মুমূর্ষু মায়ের। মায়ের মুখেও কোনো কথা নেই। কারণ সে প্রায় সংজ্ঞাহীন। উপায়-গতিক না দেখে, শেষে রুগ্ন মা'য়ের মাথার কাছে বসেই কাঁদতে থাকে ফুলবানু। এমন সময় সম্ভবতঃ কান্না শুনেই ঘরের মধ্যে উঁকি মারে একটা লোক। ফুলবানু সেদিকে তাকিয়েই খানিকটা নড়ে-চড়ে বসে। লোকটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে রোগিণীর পাশে। তারপর ফুলবানুর দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে বলে :

—"কাঁদলেই কি অসুখ ভালো হবে? তুমি অপেক্ষা করো আমি ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করছি।"

এই ব'লে লোকটা বেরিয়ে যায়। ফুলবানু তাকে চেনে। সে এ-পাড়ারই লোক। লোকটা কি কাজ করে—ফুলবানু জানে না। ছু-একবার পাড়ার মধ্যেই তাকে মাতলামি করতে দেখেছে। সত্যই সে মাতাল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ তার প্রতি ফুলবানুর কোনো বিরূপ ধারণা হয় না। বরং অসময়ে লোকটাকে পেয়ে মনে খানিকটা ভরসাই জন্মে। সুতরাং মায়ের মাথার কাছে ব'সে সে লোকটারই ফিরে আসার প্রতীক্ষা করতে থাকে।......

খানিক বাদে কিছু চাল, এক প্যাকেট বার্লি ও ছু'শিশি ঔষধ নিয়ে সত্যই ফিরে আসে লোকটা। এসেই সে ফুলবানুকে বলে :—

—"তুমি বার্লি চড়াও, আমি তোমার মায়ের পাশে বসছি।"

এই ব'লে সে রোগিণীর পাশে বসে এবং তার নির্দেশমতো ফুলবানুও নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে বার্লির প্যাকেটটা হাতে নিয়ে। মুমূর্ষু রোগিণী ঠিক বুঝতে পারে না—কে তার মাথার কাছে ব'সে আছে।

সেদিন থেকে ফুলবানুর অসুস্থ মাকে সেবা করার অজুহাতেই আসা-যাওয়া করে লোকটা। ফুলবানুও আগের চাইতে অনেকটা সহজ হয়ে ওঠে লোকটার সামনে। তারপর দিনে দিনে উভয়ের মধ্যে খানিকটা ঘনিষ্ঠতাও জন্মে।

কিন্তু রোগিণী আর সেরে উঠলো না। একদিন উভয়েরই উপস্থিতির মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ফুলবানুর মা। সঙ্গে সঙ্গে ফুলবানুর দু'চোখ জুড়ে নেমে আসে অন্ধকার। লোকটা সুযোগ বুঝে অন্ধকারেই প্রসারিত করে তার তৃষিত বাহু। অরক্ষণীয়া ফুলবানুও নিরুপায় হয়ে ধরা দেয় যৌবনের সমস্ত রস নিয়ে। তারপর ছুটে চলে সময়ের হরিণ।

কিন্তু ফুলবানু ফুলের আস্বাদ তবু পেলো না। কারণ লোকটার বুকে প্রেম বা ভালোবাসা নেই, আছে কেবল তৃষ্ণা। তাই প্রত্যহ কেবল মদমত্ত হয়েই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুলবানুর বুকে এবং দিনে দিনে শোষণ করে তার সমস্ত যৌবন। তাছাড়া সংসারেও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে অব্যাহত অভাব। উনোনে হাঁড়ি চড়ে না প্রায় দিনই। কারণ লোকটার কোনো চাকুরী নেই। এদিক-ওদিক থেকে যা আনে—তা খরচ হয় তার মদেই। অথচ অনাহার-অনিদ্রার মধ্যেও ফুলবানু তার যৌবনের পূজা দিয়ে চলে মাতাল দেবতাকে। দেখতে দেখতে এভাবেই কেটে যায় পাঁচটি বছর।

এই পাঁচ বছরে ফুলবানু অবিরাম তার যৌবন দান ক'রে প্রতিদানে পায় পাঁচটি সন্তান। অনাহার-অনিদ্রার সঙ্গে পর পর পাঁচটি সন্তান গর্ভে ধারণ করায় স্বাভাবিকভাবেই শরীর ভেঙে

পড়ে ফুলবান্নুর। যৌবনেরও আর কিছুই বাকি থাকে না। সারা দেহের হাড়ের ওপর অবশিষ্ট থাকে কেবল রঙচটা চামড়া। চোখ ছুটোও কোটরাগত হয়ে সমস্ত মুখমণ্ডলে প্রতিষ্ঠা করে এক চরম বিকৃতি। ফুলবান্নুর এই বিকৃত স্বাস্থ্য মাতাল লোকটার তৃষ্ণা

মেটাবার পক্ষে অনুকূল নয়। তাই লোকটাও একদিন ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আর ফেরে না।

লোকটা সত্যই বেদরদী। আপন ঔরসজাত বাচ্চাদের প্রতিও তার কোনো দরদ নেই। তাই সে গেলো তো গেলোই। ফুলবান্নু

কী বুঝে তবু দিন গোণে। কিন্তু দিন গোণা তার আর শেষ হয় না। এদিকে বাড়ীওয়ালা ভাড়া বাকির দায়ে ফুলবান্নুকে বের ক'রে দেয় ঘর থেকে। তাই সে কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে আজ আস্তানা গড়েছে আঁস্তাকুড়ের পাশে। বাচ্চাদের কাছে আজও সে মা। তাই আঁস্তাকুড়ের পাশেই বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে, গভীর রাত্রে সে নেমে আসে রাস্তায় তারপর ঝাঁপতোলা হোটেলের সামনে হোটেলেরই নিক্ষিপ্ত ছাই ঘেঁটে সে সংগ্রহ করে ছোটো ছোটো পোড়া কয়লার টুকরো। পরদিন সেগুলো হাইড্র্যাণ্টের জলে ধুয়ে আবার ফিরিয়ে দেয় হোটেল-ওয়ালাদেরই কাছে। হোটেলওয়ালারা বিনিময়ে যে-সামান্য পয়সা দেয়—তা দিয়েই সে দু-এক খণ্ড রুটি কিনে ফিরে আসে আস্তানায়। মা' মা' ব'লে আনন্দে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাঙাচির মতো বাচ্চারা।···

আজ সে ডাইনী। তাই সংস্কারাচ্ছন্ন নর-নারী তাকে ভয় করে এবং ঘৃণাও করে। ভয় বা ঘৃণা করে না কেবল বাচ্চারা। কারণ বিকৃত স্বাস্থ্যের আড়ালে মায়ের পবিত্র সত্তা তারা প্রত্যহ দেখতে পায়। তাই আজও তারা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েই সিঁড়ি ভাঙে সময়ের।

দীর্ঘশ্বাসে ঝ'রে গেল ফুল

শিয়ালদার কাছাকাছি, লোয়ার সার্কুলার রোডের উত্তর দিক থেকে একখানা এবং দক্ষিণ দিক থেকে আরেকখানা ট্রাম বেশ দ্রুত-গতিতেই ছুটে আসছে। লোকটা ভাবলো: ট্রাম দুটো কাছা-কাছি হওয়ার পূর্বেই সে এপার থেকে ওপারের ফুটপাথে গিয়ে উঠবে লাইন ডিঙিয়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার পক্ষে তা সম্ভব হলো না। প্রথম লাইন পেরিয়ে দ্বিতীয় লাইনের কাছ বরাবর আসতেই হঠাৎ একখানা ট্রামের প্রচণ্ড ধাক্কায় সে সজোরে আছড়ে পড়লো লাইনের ওপর। ট্রাম অবশ্য থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু লোকটার অবস্থা কাহিল। লাইনের ওপর আছড়ে পড়ায় তার মাথার প্রায় অনেকখানি জায়গা কেটে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে ঝরতে লাগলো রক্ত।

লোকটার দুর্বল স্বাস্থ্য। ওভাবে পড়ার পর উঠে দাঁড়াবার শক্তি তার নেই। জনকয়েক লোক ছুটে এসে তাকে টেনে তোলে ফুটপাথে। দেখতে দেখতে ভীড় জ'মে ওঠে এবং ভীড়ের মধ্যে আমিও ছুটে যাই। লোকটা তার মাথার ক্ষতস্থান একহাতে চেপে ধ'রে ফুটপাথে শুয়ে শুয়েই ভীড়ের চারদিকে একবার চোখ বুলোয়। তারপর হঠাৎ একসময় ব'লে ওঠে:

—"আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন। আমি বাড়ী যাবো। আজ তিন দিন হলো আমি বাড়ী ফিরিনি।"

এ-কথা বলেই লোকটা অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। পরক্ষণেই আবার প'ড়ে যায় মাথা ঘুরে।

তার এ-অবস্থা লক্ষ্য ক'রে ভীড়ের মধ্য থেকে ষ্টেশনের দিকে

ছুটে যায় একটি যুবক। উদ্দেশ্য: ষ্টেশন থেকে ফোন ক'রে একটা এ্যাম্বুলেন্স ডাকবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে লোকটা আবার অস্থির হ'য়ে ওঠে। ফুটপাথে শুয়ে শুয়েই সে বিলাপ করতে থাকে কাতরভাবে। বলে:

—"আজ তিন দিন হলো, আমি বাড়ী ফিরিনি। বাড়ীতে আমার বাচ্চাটা অসুস্থ। বউ না খেয়ে আছে। আপনারা আমাকে বাড়ী যেতে দিন।"

তার কথা শুনে ভীড়ের লোকজন তাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেয়। আমিও তার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দু'এক কথায় তাকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করি। দেখতে দেখতে এভাবেই কেটে যায় প্রায় মিনিট পনেরো।

মিনিট পনেরো পর সত্যই এ্যাম্বুলেন্স আসে। এ্যাম্বুলেন্স আসতেই ভীড়টা সম্পূর্ণ স'রে যায়। আহত লোকটার পাশে কেবল দাঁড়িয়ে থাকি আমি, আর সেই যুবকটি—যে এ্যাম্বুলেন্স ডাকতে গিয়েছিল। যুবকটি হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য ক'রে বলে:

—"চলুন, একে হাসপাতালে দিয়ে আসি।"

এ-সব ব্যাপারে না বলা যায় না। অতএব অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলাম এবং আহত লোকটাকে নিয়ে আমরা উভয়ে উঠলাম এ্যাম্বুলেন্সে।

কোনো এক হাসপাতাল অভিমুখে এ্যাম্বুলেন্স চলতে থাকে ধীরে ধীরে। এ্যাম্বুলেন্সের ভেতরের একদিকের একটা সিটে আমি আর যুবকটি বসেছি পাশাপাশি। আর আহত লোকটা শুয়ে আছে নিচে। একসময় লোকটা শুয়ে শুয়েই কাতরভাবে আমার দিকে তাকায়। তারপর যে-হাতে সে তার মাথার ক্ষত-স্থান চেপে ধরেছিল, সেই রক্তমাখা হাতটা শোওয়া অবস্থাতেই

ছেঁড়া পাঞ্জাবীর পাশের পকেটে ঢুকিয়ে অতিকষ্টে বের করে একটা দু'টাকার নোট। হাতের স্পর্শে নোটটাও রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। রক্তাক্ত নোটটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধ'রেই অতি ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলতে থাকে :

—"দাদা, আমি আজ মাস-ছয়েক ধ'রে বেকার! বাড়ীতে দিনের পর দিন অনাহার চলছে। এ-অবস্থার মধ্যে আমার একমাত্র বাচ্চাটাকে আবার রোগে ধরেছে। তাই দিন-তিনেক আগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম
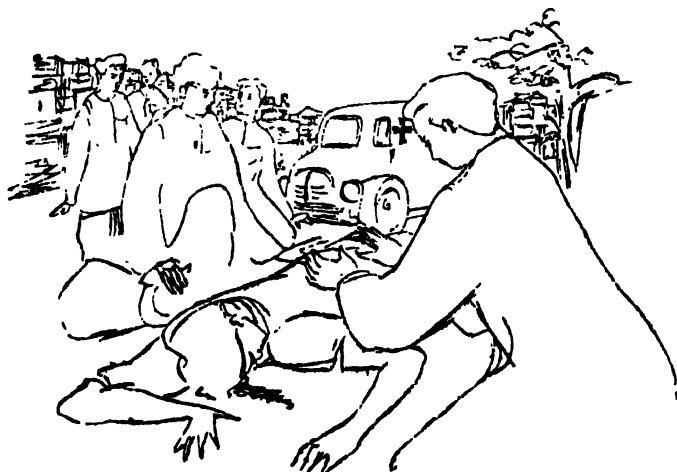
যে-ভাবেই হোক, কাজ একটা জোটাবোই। তারপর বাড়ী ফিরবো। কিন্তু হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও কাজ আমার জোটেনি। আজ তিনদিন পর এই দু'টাকার নোটটা এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার নিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম—এমন সময় এই ঘটনাটা ঘটলো। আমাকে তো হাসপাতালেই থাকতে হবে। আপনি দয়া ক'রে এই নোটটা আমার বাড়ীতে পৌঁছে দিন। আমি চিরকাল আপনাকে স্মরণে রাখবো।"

ইচ্ছে না থাকলেও, নোটটা আমাকে নিতে হলো তার হাত থেকে। নোটটা নিতেই সে আবার বলে :

—"আমার নাম ভূপতি কর্মকার। ট্যাংরার চিংড়িহাটা বস্তিতে আমার নাম বললে অনেকেই আমার ঘর দেখিয়ে দেবে। দয়া ক'রে আমার বউকে এই দুর্ঘটনার কথা বলবেন না। বলবেন যে, আমি একটা কাজে আটকে গেছি। খুব শীঘ্রই ফিরে আসবো।"

লোকটার অর্থাৎ ভূপতি কর্মকারের করুণ অনুনয় আমার পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হলো না। এ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালে পৌঁছতেই আমি আর অপেক্ষা বা বিলম্ব না ক'রে নেমে এলাম রাস্তায়। তারপর তার রক্তাক্ত দু'টাকার নোটটা হাতের মুঠোয় চেপে একা একা রওয়ানা হ'লাম ট্যাংরার দিকে।

ট্যাংরায় এসে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় দুটো। অনেক ঘুরে ঘুরে খুঁজে পেলাম চিংড়িহাটা বস্তি। বস্তির একটা চওড়া গলির মোড় ঘুরে আরেকটা সরু অন্ধকার ও নোংরা গলির মুখে প্রবেশ করতেই আমার চোখে পড়লো একটা ভীড়! একটা ভগ্নপ্রায় ছোটো টালির ঘরের সামনেই জমেছে এই ভীড়টা। ভীড়ের প্রত্যেকেই উত্তেজিত। ঘরের ভেতরের কাউকে লক্ষ্য ক'রে ভীড়ের দু'একজন প্রৌঢ় চাপা গলায় আস্ফালন করছে অবিরাম।

কিন্তু ভীড়ের দিকে তাকাবার সময় আমার নেই। যে-কাজে এসেছি, সে কাজটাই আগে হাসিল করা প্রয়োজন। তাই রাস্তার একটা কিশোর ছেলেকে দেখতে পেয়ে, তাকেই কাছে ডেকে ভূপতি কর্মকারের ঘর কোন্‌টা তা জিজ্ঞেস করি। কিন্তু আশ্চর্য,

ছেলেটা তার আঙুল দিয়ে আমাকে সেই ভীড়টার দিকেই দেখিয়ে দিল। অর্থাৎ যে-ঘরটার সামনে ভীড়টা জমেছে—সেই ঘরটাই ভূপতি কর্মকারের।

আমি ধীরে ধীরে ভীড়টার দিকে এগিয়ে গেলাম নিঃশব্দে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ভীড়ের একজন প্রৌঢ় লোকের উচ্চকণ্ঠ আমার কানে বাজতে লাগলো। তিনি দরজাবন্ধ অন্ধকার ঘরটার দিকে তাকিয়েই বলছেন:

"এতবড়ো একটা অনাসৃষ্টি আমরা পাড়ায় ঘটতে দেবো না। তোমার জন্য সমস্ত পাড়ায় একটা অমঙ্গল নেমে আসবে—তা হবে না। ভালো চাও তো বেরিয়ে এসো। নইলে আমরা জোর ক'রে ঘরে ঢুকবো।"

এবার আর কৌতূহল দমন করা সম্ভব হলো না আমার পক্ষে। ব্যাপারটা কী—এবার আমি জিজ্ঞেস করি ভীড়ের অন্য একজন লোককে ডেকে। লোকটি আমার প্রশ্নের পর বেশ উচ্চকণ্ঠেই ব'লে ওঠে:

—"আরে মশায়, আর বলবেন না। এ-বাড়ীর ভূপতি কর্মকার তার বউ আর তার রুগ্ন বাচ্চাটাকে ঘরে রেখে আজ তিন

দিন হলো কোথায় চ'লে গেছে। এদিকে গতকাল সকালে হঠাৎ তার বাচ্চাটা মরেছে ভিরমি খেয়ে। বউটা সেই থেকে এখন পর্যন্ত মরা বাচ্চাটাকে আঁকড়ে ধ'রে ব'সে আছে। আমরা সৎকার করার জন্য চাইছি তো বলছে কী জানেন? বলছেঃ বাচ্চাটার বাপ ফিরে এলে আমি কী জবাব দেবো! ওর বাপ আগে আসুক। তারপর সৎকার হবে।...বলুন তো মশায়, এমন অবাক কথা কোথাও শুনেছেন? বাচ্চাটার বাপ যদি আরও এক সপ্তাহ না ফেরে—তাহলে মরা বাচ্চাটা কি আরও এক সপ্তাহ বউটার কোলেই থাকবে এবং পচবে? মড়া ঘরে ফেলে রাখলে অমঙ্গল হয়। ওই বউটার জন্য কি আমরা সমস্ত বস্তিবাসীরাই একসঙ্গে অমঙ্গলে পড়বো?''

লোকটার কথার পরই হঠাৎ যেন আমি শুনতে পেলাম ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসা অতি ভগ্নকণ্ঠের এক ক্লান্ত বিলাপ। পায়ের নিচের মাটি আমার কেঁপে উঠলো এবং একসঙ্গে শিউরে উঠলো মন এবং দেহ। তারপর আমার চিন্তার আকাশে নেমে এলো জমাট অন্ধকার। অন্ধকারে ফুটলো গুটিকয় তারা—যে তারার আলোয় কোনো স্নিগ্ধতা নেই, আছে কেবল তীব্র জ্বালা। এ-জ্বালা আমি সইতে পারলাম না।

রক্তাক্ত নোটটা হাতের মুঠোয় চেপে আমি পিছিয়ে এলাম। পালিয়ে এলাম। ফিরে এলাম হাসপাতালে।

হাসপাতালের নির্দিষ্ট ওয়ার্ডে প্রবেশ ক'রে ভূপতি কর্মকারের বেডের কাছে গিয়ে দেখি সে ঘুমোচ্ছে। তার ঘুমন্ত কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলোঃ যেন এ-ঘুমে সে শান্তি পাচ্ছে না। হয়তো এ-ঘুম তার দু'চোখে নামিয়েছে দুঃস্বপ্ন।

নার্সে'র কাছ থেকে এক টুকরো শাদা কাগজ চেয়ে নিয়ে—তাতে লিখলাম ঃ

"বন্ধু, তোমার বাড়ী আমি খুঁজে পাইনি।"

তারপর রক্তাক্ত নোটটা সহ্ কাগজের টুকরোটি তার বালিশের পাশে রেখে, নেমে এলাম রাস্তায়।

তারপর ? তারপর যা ঘটবে—তা জানার জন্য আমি প্রস্তুত নই এবং হয়তো প্রস্তুত নয় আমার পাঠক-পাঠিকারাও। অতএব এ-ব্যাপারে আমি আর অগ্রসর হতে চাই না।

———

নিশাচরী

একদিকে তালতলা। আরেকদিকে এণ্টালি। মধ্যে লোয়ার সার্কুলার রোড অবিরাম শব্দমুখর। তার পুব-প্রান্তেই কালের সিঁড়ি ভাঙছে প্রাচীন গীর্জাটা—যার যুগ্ম-চূড়া এ-অঞ্চলের আকাশকে দিয়েছে বিশিষ্ট রূপ। গীর্জার সামনেই সুপ্রশস্ত ফুটপাথ তৃণাচ্ছাদিত এবং তার সমস্ত অঙ্গই সুশোভিত দেবদারু ও মেহগনির সমারোহে। তাই এ-ফুটপাথ পথের ধারের পার্ক হিসেবেই আজকাল ব্যবহৃত হয়। বিকেলে সম্ভ্রান্ত ঘরের শিশুদের নিয়ে আয়ারা আসে। পোষা কুকুরকে হাওয়া খাওয়াতে আনে সাহেবরা। পরস্পরের ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে পায়চারী করে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান তরুণ-তরুণী। ওদের চোখে-মুখে এবং কপোলে দোল খায় প্রত্যহের বিকেল এবং বসন্ত ফোটে দেবদারুর শাখায়। অতি-বয়স্করাও আসেন। তাঁরা এসে গাছের ছায়ায় নামিয়ে রাখেন স্থূল দেহের বোঝা। তারপর জপ করেন ইষ্ট-দেবতার নাম। কিন্তু সন্ধ্যা হলে স'রে পড়েন সবাই। এমনকি কোনো পথিককেও আর এ-ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে দেখা যায় না। সারা ফুটপাথ জুড়েই গাছের ঘন সন্নিবেশ থাকায় রাস্তার আলো এখানে পৌছয় না। কোজাগরী রাতের চাঁদের আলোও আটকে থাকে গাছের পাতায়। তাই সন্ধ্যার প্রারম্ভেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসে সারা ফুটপাথে। তারপর অন্ধকারের কোল-ঘেঁষেই নাকি মাঝে মাঝে আবির্ভাব ঘটে ভূত-প্রেতের। ইতিপূর্বে এখানে অনেকেই নাকি ভূত-প্রেতের কবলে পড়ে ঘায়েল হয়েছে শোনা যায়। তাই রাতের বেলা ভুলেও কেউ ছায়া মাড়ায় না এদিকে। ভূত-প্রেতে

যাদের বিশ্বাস নেই, আজকাল তারাও এড়িয়ে চলে এ-ফুটপাথের অন্ধকার পথ। পথটা বিপজ্জনক।

ভূত-প্রেতে বিশ্বাস নেই অনেকেরই। কিন্তু কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা নিকট আত্মীয় যদি বলে যে, ভূত-প্রেত তারা দেখেছে কিংবা আক্রান্ত হয়েছে ভূত-প্রেতের দ্বারা, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই তা' বিশ্বাস না ক'রে পারা যায় না।

জোড়া-গীর্জার সামনের গাছপালা-সমাকীর্ণ ফুটপাথে রাতের অন্ধকারে মাঝে মাঝেই যে ভূত-প্রেতের আবির্ভাব ঘটে—একথা আমিও শুনেছি। অবশ্য বন্ধু বা আত্মীয়স্বজনের মুখে শুনিনি, শুনেছি পরিচিত প্রতিবেশীদের মুখে। তাই হয়তো এ-কথা আমার বিশ্বাস হয়নি আদৌ। অবশ্য বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের মুখে শুনলেও যে এ-কথা আমার বিশ্বাস হতো—তা জোর ক'রে বলতে পারি না। কারণ, ভূত-প্রেত যে আছে—এমন প্রমাণ আমি কোনোদিনও পাইনি এবং পাইনি বলেই ভূতের ভীতি আমার নেই। কাজেই ভবিষ্যতে কোনোদিন ভূত-প্রেতের কবলে পড়তে পারি—এমন কথা ভেবে আমি কোনোদিন সাবধান হইনি এবং সাবধান হইনি বলেই হয়তো ভূত একদিন আমাকেও এসে আক্রমণ করে। অবশ্য ভূত নয়, পেত্নী—যার মুখচ্ছবি কেবল কুশ্রী নয়, ভয়াবহ। তার কোটরাগত চোখ দুটোয় যেন বহু যুগের তৃষ্ণা। তাকে দেখেই সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল আমার।

সেদিন পার্কসার্কাসে এক বন্ধুর বাড়ীতে নেমন্তন্ন ছিল। তাই ট্রাম-বাস না পেয়ে, পার্কসার্কাস থেকে হেঁটেই ফিরছিলাম এণ্টালির বাসায়। লোয়ার সার্কুলার রোডের পূর্ব-ফুটপাথ ধরেই হাঁটতে হাঁটতে মনের অজান্তেই এসে পড়ি জোড়া-গীর্জার সামনে। আকাশে

ছিল পূর্ণিমার চাঁদ। কিন্তু গাছ-পালার ঘন-সন্নিবেশ ভেদ ক'রে চাঁদের আলো ফুটপাথে পৌঁছয়নি। ভূত-প্রেতে আমার বিশ্বাস নেই। অতএব এখানে প্রায় রাতেই যে ভূত-প্রেতের আবির্ভাব ঘটে—এ-কথা আমার মনেও ছিল না। তাই পথ চলছিলাম আনমনেই। পাশের প্রশস্ত রাস্তাটা শূন্য। কেবল রাস্তার

ওপারের পেট্রল পাম্পটার কাছে দেহে ছেঁড়া চট জড়িয়ে ব'সে আছে নিগ্রো পাগলটা। এ-পাগল এ-অঞ্চলের প্রত্যেকেরই পরিচিত। সে সাধারণতঃ কারো সঙ্গে কথা বলে না। কেউ ডাকলেও শোনে না। নিঃশব্দেই পথে পথে ঘোরে। সময় সময় কোনো খাবারের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। দোকানদার

দয়া ক'রে কিছু খেতে দিলে খায়, না দিলে খায় না। রাত কাটায় ফুটপাথে।······একমাত্র এই পাগলটা ছাড়া কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই। রাত সম্ভবতঃ দুটো। তাই স্বাভাবিক কারণে সমস্ত ফুটপাথটাও নির্জন। সারা ফুটপাথের থমথমে পরিবেশে নিঃশব্দে কেবল দাঁড়িয়ে আছে অজস্র গাছ-পালা—যার তলা দিয়ে আনমনে হেঁটে চলেছি কেবল আমি। ফুটপাথের যে-অংশ সব চাইতে অন্ধকার—ঠিক সেই অংশের কাছাকাছি যার তলা হঠাৎ কোনো একটা গাছ থেকে ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যায় একটা নিশাচর পাখি এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার গীর্জাটার কাছ থেকেও ভেসে আসে খিল্‌খিল্‌ হাসির শব্দ। এ-শব্দ নারী কণ্ঠের। আমি হঠাৎ চমকে উঠেই থমকে দাঁড়াই। গভীর রাতের এই হাসির শব্দই আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় ভূত-প্রেতের কথা—যার আবির্ভাব মাঝে মাঝেই এখানে ঘটে। মনে-প্রাণে বিশ্বাস না করলেও আমি একটু ঘাবড়ে যাই এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ওভাবেই হাসতে হাসতে একটা কালো ছায়াও আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। ভয়েই হোক, অথবা যে-কোনো কারণেই হোক, আমি তাড়াতাড়ি স'রে আসি রাস্তার ধারে। সঙ্গে সঙ্গে ছায়াটাও ছুটে এসে আমার পথরোধ করে দাঁড়ায় এবং আবার একবার হেসে ওঠে খিল্‌খিল ক'রে! রাস্তার আবছা আলোয় এবার স্পষ্ট তাকে দেখলাম। তার পরণে অতি ময়লা একটা কালো গাউন। মুখটা তার কয়লার মতো কালো এবং বীভৎস। কোটরাগত চোখ দুটো যেন রক্তের তৃষ্ণা নিয়ে জ্বলছে। তার মুখের দিকে তাকাতেই সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো আমার এবং এটা যে একটা পেত্নীই—সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ রইলো না। পেত্নীটা এবার আরেকটু এগিয়ে এসে তার ডান হাতটা আমার সামনে পাতে এবং বাঁ-হাতে তার

নিজের পেট দেখিয়ে আমার কাছে কী-যেন চায়। সে আমার রক্ত চায়, না আমার কাছে কিছু পয়সা চায়—তা' ঠিক বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকি খানিকক্ষণ।

রাস্তাঘাট জনশূন্য। চিৎকার করলে এ-সময়ে কেউ আসবে না। ওপারের পাগলটার ওপরও কোনো ভরসা নেই। কারণ ও-পাগল কারো ডাক শোনে না এবং কিছু বোঝেও না।

অতএব পেত্নীটার মুখোমুখি,আমার পক্ষে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় কী ?······তার পাতা হাতে কিছু না দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখে পেত্নীটা এবার ক্ষেপে যায়। তারপর ছুটে এসেই গোখরো সাপের মতো তার লিকলিকে এক হাতে আমাকে পেঁচিয়ে ধরে এবং তার অন্য হাত সে জোর ক'রে ঢোকাতে চেষ্টা করে আমার পকেটে।······আমি শুনেছি: পেত্নীরা নাকি মানুষের ঘাড় মটকে দেয়। সুতরাং এ-পেত্নীটাও যে আমার ঘাড় মটকাবে—সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ঘাড় মটকাবার আগে আমিও আমার মরণ-কামড় না দিয়ে ছাড়বো কেন ? সুতরাং পেত্নীটা আমাকে পেঁচিয়ে ধরায় আমি আমার সমস্ত শক্তি এক ক'রে দারুণ-ভাবে একটা ঝট্‌কা মারি। ফলে টাল সামলাতে না পেরে পেত্নীটা তফাতে স'রে যায় আমাকে ছেড়ে দিয়ে। আমি এবার বুঝতে পারি: তার চাইতে আমার গায়ের জোর অনেক বেশি। তাই আর বিলম্ব না ক'রে এবার তার কোমর লক্ষ্য ক'রে, সজোরে ছুঁড়ে মারি এক প্রচণ্ড লাথি। লাথি খেয়েই রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ে পেত্নীটা। তারপর ককিয়ে ওঠে সাংঘাতিকভাবে। তার দেহটাকে লক্ষ্য ক'রে আরেকটা লাথি ছুঁড়তে যাবো—এমন সময় রাস্তার ওপার থেকে ছুটে আসে নিগ্রো পাগলটা। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে চিৎকার ক'রে বলে:

—"বাবু, ওকে মারবেন না, মারবেন না। ও ভূত-পেত্নী কিছু নয়, ও আমার বোন।"

আমি এবার আকস্মিক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। যে-পাগল কারো সঙ্গে কথা বলে না, আপন মনেই কেবল হাসে, কাঁদে এবং নিঃশব্দে পায়চারী করে পথে পথে—আজ সেই ছুটে এসে সুস্থ মানুষের মতো কথা বলছে পরিষ্কার বাংলায় এবং দাবি করছে এ-পেত্নীটা তার বোন!

এও কি সম্ভব?……আমি আমার অবাক চোখ তুলে ধরি পাগলটার মুখের ওপর। আমাকে শান্ত হতে দেখেই পাগলটা আবার বলে:

—"বাবু, ও আমার বোন। আমি ছাড়া ওর আর কেউ নেই। ও খেতে পায় না বলেই এভাবে কিছু রোজগারের চেষ্টা করে। দয়া ক'রে ওকে আর মারবেন না।"

আমি এবার ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে পারি এবং বুঝতে পেরেই বেশ একটু ঝাঁঝালো সুরে বলি:

—"এভাবে রোজগারের চেষ্টা করে কেন? কোনো একটা কাজ করলেই তো পারে।"

আমার কথা শুনে পাগলটা এবার নির্বিকারভাবে হেসে ওঠে। তারপর আবার বলে:

—"কাজ? ওকে কাজ কে দেবে বাবু? দেখছেন না—কী কালো এবং কুৎসিত? ওকে দেখে সবাই ভয় পায়, দূর দূর করে।"

এ-কথা বলেই পাগলটা এবার ফ্যাল ফ্যাল চোখে আমার দিকে তাকায়। তার এ-চাউনি দেখে মনে হলো: সে'ও যেন একটা ভূত। সে ও-ভাবেই খানিকক্ষণ নীরব থেকে আবার বলে:

—"সারা দুনিয়ার লোক ওকে বলে পেত্নী। তাই আজ সত্যিকারের পেত্নী সেজেই ও বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে বাবু। ওকে কি বাঁচতে দেবেন না ?"

পাগলটার এ-কথা শুনে আমি বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই এবার বলি :

—"তুমি তো সুস্থ রয়েছো। তুমি কোনো কাজ ক'রে ওকে খাওয়াতে পার না ?"
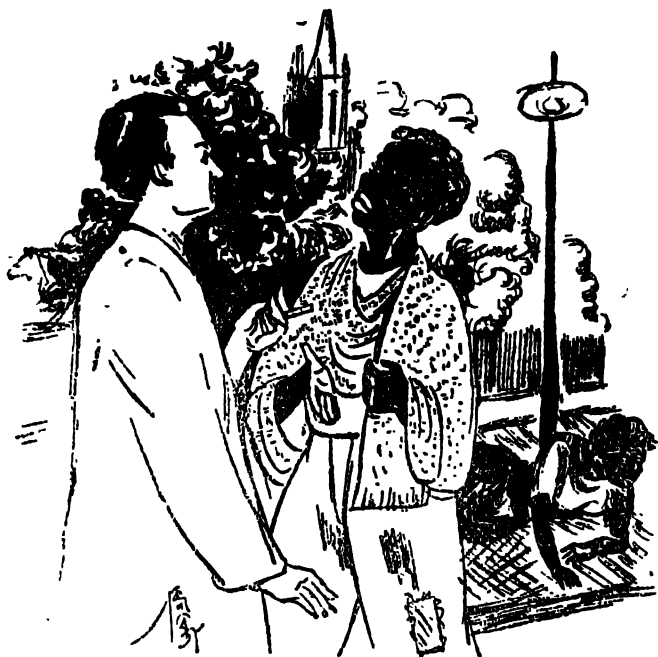
পাগলটাও সঙ্গে সঙ্গে ব'লে ওঠে :

—"আমি ? আমি কোত্থেকে খাওয়াবো বাবু ? আমি যে পাগল ! পাগলকে কেউ আবার কাজ দেয় নাকি ? হাঃ-হাঃ-হাঃ !"

কথার শেষে প্রচণ্ড শব্দে অট্টহেসে ওঠে পাগলটা। তারপর

হাঁটতে স্থরু করে রাস্তা ধ'রে এবং সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ পেত্নীটাও উঠে অনুসরণ করতে থাকে তাকে। পাগলটার প্রচণ্ড অট্টহাসির ভয়াবহ প্রতিধ্বনিতে হঠাৎ যেন কেঁপে ওঠে ফুটপাথের সমস্ত গাছ-পালা। একাধিক শাখা দুলিয়ে উড়ে যায় অনেক ক'টি নিশাচর পাখি এবং সম্ভবতঃ ভিত্তি ন'ড়ে ওঠে ধর্মের গীর্জাটারও।

———

অতীতের সাক্ষী

যেতে-আসতেই চোখে পড়ে যে-প্রকাণ্ড বাড়ীটা তারই নিচের তলার জরাজীর্ণ রকে প্রত্যেক বিকেলেই দেখা যায় সেই বুড়িটাকে। বয়স তার অনেক। চোখ-দুটোয় তার গ্রহণ ধরেছে। ললাট হয়েছে কাল-বিধ্বস্ত। সারা মুখের নীরস জমিনে যেন অজস্রবার লাঙল চালিয়েছে সময়ের নিষ্ঠুর কৃষক।

বুড়িটা ওই প্রকাণ্ড বাড়ীটার মধ্যেই ঝি-এর কাজ করছে আজ অনেককাল থেকে। বিকেলবেলা অবসর পেলেই সে রকে এসে বসে। ভেড়ার সুদীর্ঘ সাদা পশমের মতো তার এক-মাথা চুলে লুকোচুরি খেলে বিকেলের রোদ। বাতাস এসে শিশুর মতো হুমড়ি খায় তার বুকে এবং সেদিকে তাকিয়েই থমকে দাঁড়ায় পশ্চিমযাত্রী সূর্যটা।

কোনো কোনো দিন পাড়ার ছোটো-ছোটো ছেলে-মেয়েরা এসে বিরক্ত করে বুড়িকে। কেউ কেউ দূর থেকে ছড়া কাটে, ঢিল ছোঁড়ে। আবার কেউ কেউ কাছে এসে নানাভাবে ঠেলা দেয় তার গায়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে বিরক্ত হয় না বিশেষ। এমনকি, দুরন্ত ছেলে-মেয়েদের প্রচণ্ড ঠেলাঠেলিতে আঘাত পেলেও সে শব্দ করে না। কেবল ফ্যাল-ফ্যাল চোখে ছেলে-মেয়েদের কৌতুকভরা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নীরবে।

তবে ছেলে-মেয়েরা নাছোড়-বান্দা। তারা যখন বুঝতে পারে, বুড়িকে এভাবে ঠিক ক্ষ্যাপানো যাবে না—তখন তারা উদ্ভাবন করে অন্য উপায়। অর্থাৎ কেউ কেউ তারা বাড়ীর ভেতর থেকে অথবা রাস্তার কোনো দোকান থেকে নিয়ে আসে কিছু মুড়ি।

তারপর সেই মুড়ি তারা ছড়িয়ে দেয় বুড়ির কোলের কাছে। আশ্চর্য ব্যাপার! বুড়িটা এবার আর সত্যই স্থির থাকতে পারে না। মুড়ি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সে আর্তনাদ ক'রে ওঠে অতি করুণ কণ্ঠে। তার রাহুগ্রস্ত চোখ বেয়ে নেমে আসে অজস্রধারা…।

বুড়িটা মুড়ি দেখলেই কেন এমন করে—ছেলে-মেয়েরা তা জানে না। তারা কেবল জানে বা জানতে পেরেছে, যে-কোনো কারণেই হোক, বুড়িটা মুড়ির অস্তিত্ব কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। তাই তারা সুযোগমতো মুড়ি দিয়েই বিরক্ত করে বুড়িকে। বুড়িটা যতই কাঁদে ততই তারা আনন্দ পায় এবং আরও বেশি ক'রে মুড়ি ছড়াতে থাকে তার সামনে। বুড়িটা নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত মাথা কুটতে থাকে রকের শক্ত পাথরে। মাঝে মাঝে মাথা ফেটে রক্ত ঝরে, তবু শান্ত হয় না উচ্ছৃঙ্খল ছেলে-মেয়েরা। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মাঝে মাঝে বড়োরাও যোগ দেয় এই কৌতুক-আনন্দে।

অবশ্য কোনো কোনো দিন এ-ধরণের অবস্থা লক্ষ্য ক'রে প্রকাণ্ড বাড়ীটার দোতলা থেকে নেমে আসেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। তিনি একজন ঐতিহাসিক। তিনি এসেই ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেন ছেলে-মেয়েদের। তারপর বুড়িটার কাছে এসে, তার মাথায় হাত দিয়ে ধীরে ধীরে বেশ সস্নেহে বলেন :

—"যমুনা, ওঠো। এবার বাড়ীর ভেতরে যাও।"

ভদ্রলোকের কথায় বুড়িটা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। তারপর কাঁদতে কাঁদতেই এক সময় চ'লে যায় বাড়ীর ভেতরে। নাম তার যমুনা। কে জানে, একদিন হয়তো যমুনা নদীর মতোই যৌবন ছিল তার দেহে।

ঐতিহাসিক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এই যমুনা বুড়ির প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তাই কেউ তাকে বিরক্ত করলে, তিনি তা' বরদাস্ত করতে পারেন না। কারণ বুড়িটার ইতিহাস তিনি জানেন। একদিন বুড়িটার নিজের মুখ থেকেই তার সারাজীবনের করুণ বৃত্তান্ত তিনি শুনেছেন। এমনকি, নুড়ি দেখলে কেন সে হঠাৎ আর্তনাদ ক'রে ওঠে এবং কেনই বা মাথা কোটে রক্তের পাথরে, তারও রহস্য তাঁর কাছে অবিদিত নয়।

ঐতিহাসিক ভদ্রলোক পাড়ার একজন বিশেষ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। এ-পাড়ায় সবাই তার স্নেহভাজন এবং সেই সূত্রে আমিও তাঁর একজন অন্যতম স্নেহাস্পদ হিসেবে নিজেকে অনায়াসেই দাবি করতে পারি। যমুনা বুড়ির সম্বন্ধে তাঁর কাছেই আমি কিছু কিছু জেনেছি—যা আজ জানাতে চাই আমার পাঠক মহলকেও।...

হে আমার প্রিয় পাঠকগণ, এই বুড়িটা তোমাদের মনে যদি সত্যই কোনো কৌতূহলের উদ্রেক ক'রে থাকে, তবে চোখ ফেরাও পিছিয়ে এসো অনেক বছর পেছনে :

আজ থেকে সতেরো বা আঠারো বৎসর আগে—তখন সমগ্র পৃথিবী দুলছে বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর দোলায়। তারই এক প্রচণ্ড ঢেউ এসে আঘাত হানলো বাংলা দেশে। নেমে এলো অভিশপ্ত তেরো-শ' পঞ্চাশ তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো অনাহারী মানুষ। মরলো তারা পথে-পথে। বাতাস বিষাক্ত হলো বাসি শবের দুর্গন্ধে। হায়-হায় হাহাকারে আকাশ হ'লো ভারাক্রান্ত। মারী ও মড়কে উজাড় হ'লো হাজার হাজার গ্রাম।

দিন পর দিন কেটে যায়। আকাল তবু থামে না।

আজকের যমুনা বুড়ি, সেদিন বুড়ি নয়, মধ্য-বয়সিনী। সে তখন দুটি নাবালক ছেলে-মেয়েকে নিয়ে ঘর করছিল তার কৃষক স্বামীর সঙ্গে রঙপুরে। সেখানে দুর্ভিক্ষের ঝড়েই হঠাৎ ঝ'রে যায় তার স্বামীর জীবন। নাবালক ছেলে-মেয়ে দুটির হাত ধ'রে বাধ্য

হয়েই ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে যমুনা। পথে পথে সে ভিক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু ভিক্ষা তো দূরের কথা, এক অঞ্জলি ফ্যানও জোটে না তার ভাগ্যে। তবু সে অন্যান্য ভিক্ষার্থীদের সঙ্গে দ্বারে দ্বারে ঘোরে, কিন্তু লাভ হয় না। প্রত্যেক বাড়ী থেকেই লাঠি নিয়ে তাড়া করে তাদের। ফলে এভাবে ঘুরতে ঘুরতে

এবং দিনের পর দিন অনাহারে থেকে, দেহের সমস্ত যৌবন ঝ'রে যায় যমুনার। তার ছেলে-মেয়ে দুটিও অস্থিসার হয়ে ওঠে দিনে দিনে। তারা ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদে কেঁদে যেদিন কান্নার শক্তিও হারিয়ে ফেলে—সেদিন তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে অথর্ব দুর্বল দেহেও আর স্থির থাকতে পারে না যমুনা। তার কাছে অসহ্য ঠেকে সমস্ত পৃথিবীটাই। সে বুঝতে পারে: এভাবে বেঁচে থাকাটা মৃত্যুর চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক। অতএব এ-যন্ত্রণার অবসানকল্পে মনে মনে হঠাৎ সে এক সংকল্প নিয়ে বসে। কঠিন সংকল্প।

কেঁদে কেঁদে কান্নার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল ছেলে-মেয়ে দুটি। তবু তারা অসহ্য ক্ষুধায় ছটফট করছিল কোনো এক গাছতলায়।

যমুনার হাতে একটি-মাত্র ভিক্ষার পয়সা ছিল। ওই পয়সাটি দিয়েই সে একমুঠো মুড়ি কেনে। মুড়ি দেখেই লাফিয়ে ওঠে নিস্তেজ ছেলে-মেয়ে দুটি। রাজ্যের ক্ষুধা নিয়ে তারা ছুটে আসে যমুনার দিকে। যমুনা তাদের বাধা দিয়ে বলে:

—"মুড়ি খেলেই তেষ্টা পাবে। এখানে তেষ্টার জল নেই। চল নদীর-ধারে।"

সেখান থেকে নদী অনেক দূরে। হাঁটার শক্তি তাদের নেই। তবু মুড়ির লোভে মায়ের পিছু পিছু তারা অশক্ত পায়ে হেঁটে যায় কোনোমতে। নদী তখন ভরাট। রাক্ষসীর মতো নাচতে নাচতে দু'কূল ছাপিয়ে ছুটে চলেছে নদী। তারই কিনারা ঘেঁষে তারা এসে তিনজনেই দাঁড়ায়। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর যমুনা হঠাৎ মুড়ির ঠোঙাটা ছুঁড়ে দেয় নদীর জলে। তারপর ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশ ক'রে বলে:

—"যাও, যদি পার, নদীর জল থেকে মুড়ির ঠোঙাটা তুলে এনে খাও।"

প্রচণ্ডবেগে ছুটে চলেছে দু'কূলপ্লাবিনী নদী। মুড়ির ঠোঙাটা সঙ্গে সঙ্গেই ভেসে যায় অনেক দূরে। মায়ের এই অবাক কাণ্ড দেখে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ছেলে-মেয়ে দু'টি। ঠিক এই সুযোগে দু'পা পিছিয়ে এসে তাদের উভয়ের গায়েই সজোরে একটা ধাক্কা মারে যমুনা। ধাক্কা খেয়েই নিস্তেজ ছেলে-মেয়েদুটি ছিটকে পড়ে নদীর জলে। কূল পাবার আশায় একবার মাত্র ব্যর্থ মুঠি বাড়িয়েই অতলে তলিয়ে যায় তারা উভয়ে। পরমুহূর্তে নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়ে যমুনা।

···তারপর? আর কিছু সে জানে না।

যেদিন জ্ঞান ফিরে এলো যমুনার, সেদিন সে বুঝতে পারলো— সে শুয়ে আছে এক জেলের ঘরে। নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে এ-জেলেই তার ভাসমান দেহটাকে দেখতে পেয়েছিল এবং তা' ডাঙায় তুলে বুঝতে পেরেছিল তাতে প্রাণ আছে। জেলেটা ধর্মভীরু। সম্ভবতঃ ধর্মের ভয়েই যমুনার অসাড় দেহটাকে সে নিয়ে আসে নিজের ঘরে। তারপর আগুনের তাপ সহযোগে পেটে নানাভাবে চাপ দিয়ে সে জ্ঞান ফেরায় যমুনার।··· কিন্তু তার ছেলে-মেয়ে দুটি? ছেলে-মেয়ে দুটির কোনো খবর জানে না জেলেটা।

জ্ঞান ফিরতেই একে একে সমস্ত স্মৃতি ভেসে ওঠে যমুনার মনে। ছেলে-মেয়ে দুটির কথা ভাবতে গিয়েই সে শিউরে ওঠে এবং পরক্ষণেই ছুটে বেরিয়ে আসে জেলের ঘর থেকে। আবার সে নদীর ধারে যায়। কিন্তু আর ঝাঁপ দিতে পারে না। কারণ তার দুর্বল মনে এসে বাসা বাঁধে এক প্রবল আশা। হয়তো ছেলে-মেয়ে দুটি তার বেঁচে আছে। নদীর করাল গ্রাস থেকে সে

যেভাবে রক্ষা পেয়েছে, হয়তো ঠিক সেভাবেই তার ছেলে-মেয়ে দুটিও রক্ষা পেয়ে থাকবে কোথাও। অতএব আবার তাদের বুকে ফিরে পাওয়ার আশাতেই পুনরায় নদীতে ঝাঁপ দেয়া তার হলো না, মরতে পারলো না যমুনা।

ছেলে-মেয়ে দুটির ব্যর্থ অন্বেষণেই পথে পথে সে অনেককাল ঘুরেছে। গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে এবং শহরেরই এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ঝি-এর কাজ করতে করতে সে পেরিয়ে এসেছে অনেক ক'টি বছর। আজ সে পক্ককেশ বৃদ্ধা।

মুড়ির লোভ দেখিয়েই ছেলে-মেয়ে দুটিকে সে নিয়ে এসেছিল নদীর ধারে। তাই আজ মুড়ি দেখেই তার সারা-বুক তোলপাড় ক'রে ভেসে ওঠে সেই নিদারুণ স্মৃতি। সে স্থির থাকতে পারে না।

ছেলে-মেয়ে দুটিকে সে ফিরে পাবে—এমন আশা সে আজও করে। কিন্তু এ-আশা তার পূর্ণ হবে এপারেই-না-পরপারে—তা' সঠিক ক'রে বলা স্বয়ং শ্রীপদাতিকের পক্ষেও আজ সম্ভব নয়।

উৎসব

কাশীপুর ব্রীজের নিচে খালের ঘোলা জলে পা ডুবিয়ে পাশা-পাশি থমকে আছে প্রশস্ত দুটো কংক্রিটের রক এবং এই রকের কাঁধে পা রেখেই দাঁড়িয়ে আছে সমগ্র ব্রীজটা। বেশ সুপ্রশস্ত বলেই এ-রক দুটোকে মনে হয় পাকা বাড়ীর মেঝের মতো এবং ছাদের মতো মনে হয় ব্রীজটাকে। তাই যারা পথবাসী, যারা রাত্রি যাপন করে ফুটপাথে, পার্কে এবং গাছতলায়, তারা অনেকেই এসে আজ বসতি গড়েছে ব্রীজের নিচের এই সুপ্রশস্ত রক দুটোয়। এদের সঠিক কোনো জীবিকা নেই। এরা কেউ ভিক্ষা করে, কেউ ঘুঁটে বানায়, কেউ সারা শহরের পথ-ঘাট থেকে কুড়িয়ে আনে ছেঁড়া কাগজের টুকরো এবং কেউ কেউ সম্ভবতঃ ঝি-চাকরের কাজ করে শহরের সম্ভ্রান্ত বাড়ীতে। এরা কেউ কারো পরিচিত নয়। অথচ এরা বাস করে একসঙ্গে এবং একসঙ্গে বাস করে ব'লে দিনে দিনে ব্রীজের তলাতেই গ'ড়ে উঠেছে একটি আত্মনির্ভর পৃথিবী— যার খবর জানেন না স্বয়ং বিশ্ব-স্রষ্টাও।

আজ ব্রীজের তলার এই খুদে পৃথিবীটির মধ্যেই আনন্দের সাড়া প'ড়েছে, হাসির মুকুল ধরেছে প্রত্যেকেরই শুকনো ঠোঁটের বোঁটায়। কেউ আজ কাজে বেরোয়নি। এখানেই আজ কাজে ব্যস্ত সবাই। বিরাট হাঁড়িতে খিচুড়ি চড়িয়ে কেউ কেউ দল বেঁধে জ্বাল দিচ্ছে উনোনে। কেউ তরকারী কুটছে। কেউ শালপাতা পরিষ্কার করছে খালের জলে এবং নারীদের মধ্যে কেউ কেউ একসঙ্গে ব'সে গান গাইছে প্রাকৃত ভাষায়। আজ এদের উৎসব।

এই উৎসবমুখর পৃথিবীটির পাশে দাঁড়িয়ে সকলের সানন্দ ব্যস্ততা লক্ষ্য করছে গণেশ। পাশেই হাসিমুখে দাঁড়িয়ে তার বউ। এরাও ব্রীজের তলারই বাসিন্দা। গণেশই আজ বহন করছে উৎসবের যাবতীয় খরচ। সস্ত্রীক সে'ই আজ এ-উৎসবের উপলক্ষ্য। কারণ, তাদের স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গতিহীন সংসারে অন্য এক নূতন গ্রহের উদয়াভাস দেখা দিয়েছে।

প্রায় বছর-দশেক আগে আজকের এই গণেশ তার গরীব বাপের সঙ্গে বাস করতো নদীয়া জেলার শিব-নিবাস অঞ্চলে। বাপ ছিল গ্রামের চৌকিদার। স্ত্রী তার মারা যায় গণেশকে জন্ম দিতে গিয়েই। স্ত্রী মরার পর শিশু-গণেশকে সে অনেক কষ্টে মানুষ করে।

বাপের স্নেহ-যত্নেই শিশুকাল ও কৈশোরকাল অতিক্রম ক'রে গণেশ যখন বাইশ বছরের যুবক—ঠিক তখনই তার বিয়ের ব্যবস্থা হয়। অর্থাৎ গ্রামেরই এক বিত্তশালীর গৃহে ঝি-এর কাজ করতো একটি মেয়ে। মেয়েটির বাপ-মা বা আত্মীয়স্বজন কেউ ছিলনা। গণেশের বাপ এ-মেয়েটিকেই পছন্দ ক'রে ঘরে আনে। তারপর গণেশের সঙ্গে তার মিলন ঘটায়।

গণেশের বিয়ের বেশ কিছুদিন পর, একদিন হঠাৎ অসুখে মারা যায় তার বাপ। বাপের মৃত্যুর পর চৌকিদারীর চাকুরীটা পাওয়ার জন্য নানাদিক দিয়ে বহু চেষ্টা করে গণেশ। কিন্তু লাভ হয় না। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট তাকে ঠিক পছন্দ করলেন না বলেই ও-চাকুরীটা তার হলো না। অথচ আর অন্য কোনো কাজও সে জানে না। তাই সংসারে তার দেখা দেয় অচলাবস্থা। সীমাহীন অনটনের মুখে প'ড়ে সোহাগী স্ত্রী সহ দিন-কয়েকের মধ্যেই

হাঁপিয়ে ওঠে গণেশ। তার দিন যেন আর কিছুতেই চলতে চায় না।

গণেশদের বাড়ীর পাশেই বসবাস করতো এক মধ্যবিত্ত চাউল-ব্যবসায়ী। নাম তার নিতাই। তার টাকা-পয়সার অভাব ছিল না। গণেশের দুরবস্থা লক্ষ্য ক'রে সে তাকে মাঝে মাঝে সাহায্য করতে সুরু করে। গণেশ ভাবে, লোকটা সত্যই দরদী। তাই এ-দুর্দিনে তাকে সাহায্য করছে। কিন্তু এ-সাহায্য করার পেছনে নিতাইয়ের যে একটা কুৎসিত স্বার্থ ছিল—গণেশ তা বুঝতে পারেনি। তবে একদিন তা বুঝিয়ে দিল তার বউ-ই।

গৃহকর্মের অবসরে একদিন তার বউ তাকে নিভৃতে ডেকে বেশ একটু ভয়ে ভয়ে এবং আস্তে আস্তে বলে ঃ

—"নিতাই লোকটার মতলব খারাপ। ওর সাহায্য তুমি আর নিও না। ও-লোকটা তোমার অনুপস্থিতিতে আমার কাছে এসে কুপ্রস্তাব করে।"

বউয়ের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা শোনার পর গণেশ

প্রচণ্ড ক্ষেপে যায় এবং তৎক্ষণাৎ সে নিতাইয়ের কাছে ছুটে এসে তাকে শাসিয়ে বলে :

—"তোমার সাহায্য করার বদ-উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পেরেছি। ফের যদি তুমি আমার বাড়ীর দোর-গোড়ায় যাও এবং আমার বউয়ের সঙ্গে কোনো রকম কথা বলার চেষ্টা কর—তাহলে তোমাকে আমি প্রাণে বাঁচতে দেবো না।"

গণেশের সঙ্গে নিতাইয়ের এ-কলহের কথা ছড়িয়ে পড়ে সারা গাঁয়েই। শাসানির জন্যেই হোক অথবা মান-সম্মানের ভয়েই হোক, নিতাই গণেশের বাড়ী আসা-যাওয়া বন্ধ করে এবং সেই সঙ্গে বন্ধ করে সাহায্যও। ফলে অভাবের আগুন আবার দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে ওঠে গণেশের সংসারে।

ঠিক এমনই সময়ে, একদিন শেষ রাত্রে আকস্মিকভাবেই একটা ডাকাতি ঘ'টে যায় নিতাইয়ের বাড়ীতে। ডাকাতরা নিতাইকে নির্মমভাবে হত্যা ক'রে তার অর্থকড়ি এবং যাবতীয় অলঙ্কারাদি নিয়ে স'রে পড়ে। খবর পেয়ে ভোর বেলা হৈ-হৈ ক'রে ছুটে আসে সারা গাঁয়ের লোকজন। কেউ কেউ এসে বলাবলি করে : গণেশের সঙ্গে নিতাইয়ের বিরোধ চলছিল। সম্ভবতঃ গণেশই নিতাইয়ের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য ডাকাতদের পথ দেখিয়ে এনেছে। শুধু তাই নয়, নিতাইয়ের জন-কয়েক আত্মীয় গণেশের বাড়ীতে এসে বেশ চড়া গলায় তাকে শাসিয়ে বলে :

—"এতদিন গাঁয়ে কোনো ডাকাতি হয়নি। তোমার সঙ্গে নিতাইয়ের ঝগড়া হওয়ার পর হঠাৎ নিতাইয়ের বাড়ীতেই যখন এ-ডাকাতি ঘটলো—তখন ডাকাতদের সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার কোনো যোগ আছে। আমরা থানায় এজাহার দিতে যাচ্ছি। পুলিশের কাছে আমরা তোমার নামই বলবো।"

গণেশ কিন্তু এ-ব্যাপারে কিছুই জানে না। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু তা সত্বেও সে সাংঘাতিক ভয় পায়। কারণ গাঁয়ের লোক তার বিরুদ্ধে। সে ভাবে: যদিও ডাকাতির সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, তবুও গ্রামবাসীদের অন্যায় সাক্ষ্যে সে দোষী সাব্যস্ত

হবে এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো তার ফাঁসিও হয়ে যেতে পারে। সুতরাং লোকজন এজাহার দেবার জন্য থানার উদ্দেশে রওয়ানা হতেই সে শিউরে ওঠে এবং অগ্র-পশ্চাৎ কিছু না ভেবেই সে বাড়ী থেকে স'রে পড়ে বউকে একলা রেখে।

দিন যায়। রাত যায়। গণেশ আর ফেরে না। দিন-কয়েক একলা ঘরে অনাহারে মুখ গুঁজে থাকার পর তার বউ এবার বেরিয়ে আসে কাজের ধান্দায়। বাড়ী-বাড়ী ঘুরে সে ঝি-এর কাজের সন্ধান করে। অবশ্য গাঁয়ের কেউ কেউ কেবল ঝি-এর কাজ দিয়ে নয়, অন্য অনেক দিক দিয়েই তাকে সাহায্য করতে রাজি হয়। কিন্তু বিনিময়ে তারা যা কামনা করে— তা' অত্যন্ত অপমানকর। অতএব আর কাজের সন্ধান না ক'রে এবার বউটিও গ্রাম ছেড়ে চ'লে যায়। কোথায় যায়—তা কেউ জানে না।

ওদিকে পুলিশের যোগ্য তদন্তের ফলে ডাকাতির দায়ে ধরা পড়ে প্রকৃত অপরাধীরা। বছর-খানেক বিচার চলার পর অপ-রাধীদের কঠিন সাজা হয় এবং সেই সঙ্গে এ-কথাও প্রমাণিত হয় যে, ডাকাতির সঙ্গে গণেশের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এ-সংবাদ গণেশও পায়। তাই সে আবার ফিরে আসে তার গাঁয়ে। কিন্তু এসে দেখে ঃ ঘর তার ভেঙে গেছে, বউ তার দেশান্তরী।

দিন-কয়েক এ-গ্রাম ও-গ্রাম ঘুরে বউয়ের ব্যর্থ সন্ধান করার পর গণেশ আসে কলকাতায়। তারপর কলকাতারই কোনো এক ফুটপাথে সে আস্তানা গড়ে এবং পথ-ঘাট থেকে ছেঁড়া কাগজের টুকরো কুড়িয়ে ও পরে তা সের দরে বিক্রী করার মাধ্যমে স্মুরু করে নতুন জীবিকা।

অনেকদিন পর একদিন একটা ডাষ্টবিন ঘেঁটে নানাজাতীয় কাগজের টুকরোই সংগ্রহ করছিল গণেশ। এমন সময় তার পাশে এসে দাঁড়ায় একজন রুগ্না ভিখারিণী। গণেশ কী ভেবে চোখ তুলে তাকায়। কিন্তু ভিখারিণীর মুখের ওপর চোখ পড়তেই সে চমকে ওঠে এবং তার দিকে বেশ খানিকক্ষণ নীরবেই

তাকিয়ে থাকে বিহ্বল হয়ে। তারপর হঠাৎ এক সময় অতি অস্ফুট কণ্ঠে বলে ঃ

—"বউ!"

ভিখারিণী কোনো শব্দ করে না। এ-সম্বোধনের উত্তরে সে কেবল নীরবেই তার চোখ দুটোকে নদীর মতো ক'রে আরও কাছে এগিয়ে আসে গণেশের।

বউকে ফিরে পেয়ে নতুন প্রাণ পায় গণেশ। সেদিনই সে ফুটপাথের পুরোনো আস্তানা গুটিয়ে, কাশীপুর ব্রীজের তলায় এসে গ'ড়ে তোলে নতুন আস্তানা। তারপর স্থুরু করে বউয়ের সেবা-যত্ন। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই বউটি আবার ফিরে পায় স্বাস্থ্য এবং তার দেহের কানায় কানায় আবার উপচে ওঠে যৌবন।

তারপর বছর কয়েক ধ'রে বউয়ের সঙ্গে কাশীপুর ব্রীজের তলাতেই সংসার করছে গণেশ। আজ এখানেই তার বউ হয়েছে গর্ভবতী। তাই নতুন বাপ হওয়ার অবুঝ আনন্দে কয়েকদিনের অতি কষ্টের জমানো কয়েকটা টাকা আজ একদিনেই খরচ ক'রে উৎসবের আয়োজন করছে গণেশ।

শিশু এখনো মায়ের গর্ভেই। কে জানে, হয়তো গর্ভের মধ্যেই সে সংবাদ পেয়েছে পৃথিবীতে শান্তি নেই। স্থতরাং গর্ভের নির্ভয় আশ্রয় ছেড়ে অশান্তির নিষ্ঠুর পৃথিবীতে শিশু হয়তো আসতে চায় না। সম্ভবতঃ সেজন্যেই এ-উৎসব। এ-উৎসবের সংবাদ পেয়েই শিশু হয়তো বুঝতে পারবে দুঃখের পৃথিবীতে আনন্দেরও অভাব নেই। অতএব সে আর দ্বিধা করবে না ভূমিষ্ঠ হতে।

শীতের রাতে

বড়বাজারের বড় বড় ব্যবসায়ীরা অধিকাংশই রক্ষণশীল। তাদের এ-রক্ষণশীলতা অন্দর-মহলের অনেক গৃহিণীর মধ্যেও সংক্রামিত। অবশ্য সিন্দুকের চাবি বা সম্পত্তির দলিল গৃহিণীদের হাতে থাকে না। অতএব বিষয়-আশয় বা টাকা-কড়ি রক্ষার দায়িত্ব তাদের নেই। এমন কি, এ-সম্বন্ধে তারা বিশেষ ভাবেও না! তাদের প্রাত্যহিক ভাবনা কেবল সীমাবদ্ধ থাকে অন্দর-মহলের আসবাবপত্রের মধ্যেই। সংসারের দৈনন্দিন প্রয়োজনে পুরুষরা যা জোগাড় ক'রে আনে—তা' ব্যবহার এবং রক্ষা করার দায়িত্ব নেয় গৃহিণীরাই। বাড়ীর কোনো আসবাবপত্র দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে বিনষ্ট হলেও তা নিক্ষিপ্ত হয় না। প্রয়োজনে আসুক বা না-আসুক, আসবাবপত্রের বিনষ্ট-অংশও তারা সযত্নে রক্ষা ক'রে চলে দিনের পর দিন। তাছাড়া ছেঁড়া কাপড়, ব্যবহারের অযোগ্য পোষাক-আদি, ময়লা মাদুর, ফাটা কম্বল ইত্যাদিও তারা রক্ষা করে। সম্ভবতঃ এ-সবের প্রতিই গৃহিণীদের রক্ষণশীলতা সবচাইতে প্রখর। এক টুকরো ময়লা ন্যাকড়াও তারা বাইরে ফেলে দেয় না, জমিয়ে রাখে ঘরে। সকাল-সকাল নেয়ে-খেয়ে পুরুষরা যখন ব্যবসার খাতিরে বাইরে বেরিয়ে যায়, গৃহিণীরা তখন ঘরে ব'সে এ-সমস্ত ময়লা ন্যাকড়া, ছেঁড়া কাপড় এবং কম্বল দিয়ে তৈরী করে কাঁথা। অবশ্য এ-কাঁথা সেই নিপুণ হাতের তৈরী কাঁথা নয়—যা গ্রামীণ বাংলার কুটিরশিল্প হিসেবে পরিচিত। এ-কাঁথা কেবল নামেই কাঁথা। ময়লা ন্যাকড়া, ছেঁড়া-ফাটা কাপড় ও কম্বল পর পর সাজিয়ে, একটার সঙ্গে আরেকটাকে

কোনোমতে জুড়ে দেওয়া হয় মোটা সূতোর সাহায্যে। দিনের পর দিন এভাবেই তৈরী হয়ে ওঠে অজস্র কাঁথা।

প্রথমতঃ এগুলোকে বিছিয়ে দেয়া হয় তোষকের নিচে এবং বসবার গদিতে। তারপর দিনে দিনে গদি এবং তোষকের নিচেও যখন এগুলো ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন এগুলোকে জমিয়ে রাখা হয় কোনো এক ঘরের কোণে—যে-ঘরে সাধারণতঃ শয়ন করে বাড়ীরই কোনো বৃদ্ধা মহিলা। কিন্তু এই বৃদ্ধা মহিলা চিরদিন বাঁচে না। সময় এলেই একদিন সে দেহত্যাগ করে। ফলে সেদিন কাঁথাগুলোও আর ঘরে থাকার অধিকার পায় না। অবশ্য বের ক'রে সেগুলো ফেলেও দেয়া হয় না, পথবাসী ভিখারীদের মধ্যে বিলি ক'রে মৃতা বৃদ্ধার আত্মার জন্যেই সংগ্রহ করা হয় পুণ্য। তবে সে-পুণ্যে বৃদ্ধার পরপারের আত্মা সত্যই কোনো শান্তি পায় কি-না—তা কলিযুগের মানুষের কাছে অজ্ঞাত।

এমনই এক ব্যবসায়ী-বাড়ীর কোনো এক বৃদ্ধার মৃত্যুতে সেদিন বিলি করা হচ্ছিল খানকয়েক কাঁথা। রাত তখন সম্ভবতঃ এগারোটা। শীতের রাত। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে উত্তরের। তাই কাঁথার লোভে বাড়ীটার ঠিক নিচের ফুটপাথেই এসে জড়ো হয়েছে গণ্ডাকয়েক ভিখারী এবং জন-সাতেক ভিখারিণী। বাড়ীর দোতলার বারান্দায় কাঁথাগুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও-বাড়ীরই এক মধ্যবয়সী চাকর। ওখান থেকেই সে একে একে নিচে ফেলবে কাঁথাগুলো। তাই ওপর দিকেই তাকিয়ে আছে হতভাগ্যের দলটা।

চাকরটা কাঁথাগুলো নিচে ফেলবার আগে ফুটপাথের প্রতীক্ষমান কাঙালদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। চোখ বুলোতে গিয়েই হঠাৎ সে দেখতে পায় দলের মধ্যেই একজন যুবতী

ভিখারিণীকে। ভিখারিণীটার চোখে-মুখে দৈন্যের ছাপ স্পষ্ট হলেও স্বাস্থ্য তার সুগঠিতই বলা চলে। তার মুখের দিকে চাকরটা লোভাতুর চোখজোড়া নামিয়ে রাখে খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ এক সময় ওপর থেকেই চিৎকার ক'রে বলে ঃ—"এ্যায় ঝুমঝুমি, তুই এখানে দাঁড়িয়েছিস কেন? তোর জন্যে বেশ বড়ো আর মজবুত একটা কাঁথা আমি রেখে দিয়েছি। একটু পরে নিচে নেমে এসেই তোকে ওটা দেবো। তুই দল থেকে স'রে গিয়ে অপেক্ষা কর। কেমন?"

ভিখারিণীটার নাম ঝুমঝুমি। চাকরটার কথা শুনে সে চকিতে তার নীরব দৃষ্টি তুলে ধরে ওপরে। তারপর সত্যিই সে স'রে যায় দল থেকে। কিন্তু স'রে গিয়ে কোথাও অপেক্ষা করে না। ফুটপাথ থেকে সে রাস্তায় নামে। রাস্তা থেকে ওঠে ওপারের ফুটপাথে। তারপর ওপারের ফুটপাথ থেকেও সে কোথায় চ'লে যায় কে জানে।

এদিকে যথাসময়ে ওপর থেকে নিচের ফুটপাথে কাঁথা ফেলতে শুরু করে চাকরটা। এক-একটা ক'রে ফেলে, আর ওপর থেকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই ভিখারীদের কাড়াকাড়ি, ঠেলাঠেলি এবং তাদের এলোমেলো চিৎকার শুনে বেশ খানিকক্ষণ মজা অনুভব করে সে। তারপর আবার ফেলে। একটা কাঁথাকেই একসঙ্গে আঁকড়ে ধরে অনেকগুলো হাত। কিন্তু যার শক্তি বেশি—সে-ই শেষ পর্যন্ত সমস্ত হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় কাঁথা। হঠাৎ এভাবেই ভীড়ের মধ্যে কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে একজন বয়স্কা ভিখারিণী। কোলে ছিল তার রুগ্ন শিশু। কোল থেকে ফস্কে গিয়ে শিশুটাও ছিটকে পড়ে একদিকে। কিন্তু কে কার

দিকে তাকায়! শিশুর দেহ মাড়িয়েই কাঁথার লোভে ছুটোছুটি করে ভিখারীর দল। শিশুটা হঠাৎ আর্তনাদ ক'রে ওঠে কাতরভাবে। বয়স্কা ভিখারিণীটা কোনোমতে উঠেই শিশুটাকে কুড়িয়ে নেয়।

তারপর একটু দূরে ছুটে গিয়ে আহত শিশুটাকে শুইয়ে রাখে একটা লাইট-পোষ্টের কাছে। শিশুটা কাৎরাতে থাকে আপ্রাণ। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই ভিখারিণীটা আবার ছুটে আসে

ভীড়ের মধ্যে। এই হাঁড়-কাঁপানি শীতে কাঁথা একটা তার চাই-ই। কিন্তু একে একে ওপর থেকে প্রায় সব কাঁথাই ফেলা হলো নিচে। তবু বয়স্কা ভিখারিণীটার ভাগ্যে কাঁথা তো দূরের কথা, এক টুকরো ন্যাকড়াও জুটলো না।

কাঁথা যারা পেলো তারা তা দেহে জড়িয়ে ফুটপাথে বসেই নিজেকে উষ্ণ করতে সুরু করে। যারা পেলো না, তারা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে স'রে পড়ে। বয়স্কা ভিখারিণীটাও ব্যর্থ হয়ে ছুটে আসে তার শিশুর কাছে। তারপর শিশুটাকে কোলে নিয়ে তার বুকের একহাত আবরণ দিয়েই তাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু আহত শিশুটা তবু আর্তনাদ ক'রে চলে তারস্বরে। সম্ভবতঃ তার এই তারস্বর আর্তনাদকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যেই দারুণ শীতে কাঁপতে কাঁপতেও ভিখারিণীটা হঠাৎ গাইতে সুরু করে ঘুম-পাড়ানি গান। কে জানে—তার এ-গান সত্যই গান, না স্বার্থপর ঈশ্বরের বিরুদ্ধে করুণ অভিযোগ!

কাঁথা পায়নি একটা কিশোর ছেলেও। না পেয়ে সে হাত-দুটো বুকের মধ্যে জড়ো ক'রে হাঁটু ভেঙে ফুটপাথে বসেই কাঁপছে। একটা খোঁড়া ভিখারী দেহে কাঁথা জড়িয়ে ছেলেটার কাছে এসে বলে:

—"কিরে, গায়ে জোর আছে ব'লে খুব তো বড়াই করিস! একটা কাঁথাও আজ জোগাড় করতে পারলি না? এই তোর মুরোদ?"

ছেলেটা কথা শুনেই খোঁড়া ভিখারীটার দিকে মুখ তুলে একবার তাকায়। তারপর সে'ও এক সময় ব'লে ওঠে:

—"ধ্যেৎ, শালার মরা মানুষের কাঁথা কেউ আবার গায়ে দেয় নাকি? ওতে আমার দরকার নেই।"

এ-কথা বলেই হাঁটুর ওপর মাথা গুঁজে ছেলেটা আবার কাঁপতে

থাকে শীতে। খোঁড়া ভিখারীটা তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসে তারপর স'রে যায় খানিকটা দূরে। এমন সময় বেশ বড় রকমের একটা কাঁথা হাতে নিয়ে ওপর থেকে নেমে আসে বাড়ীর চাকরটা। এসেই সে চিৎকার ক'রে ডাকতে সুরু করে ঃ

—"এ্যায় ঝুমঝুমি! কোথায় গেলি রে?"

কিন্তু এভাবে বার-কয়েক ডাকার পরেও কোনো সাড়া পাওয়া যায় না ঝুমঝুমির। চাকরটা তাই কাঁথাটা হাতে নিয়ে সারা ফুটপাথ পায়চারী ক'রে নীরবে অনুসন্ধান করতে থাকে তাকে। চাকরটার এই অস্থির পায়চারী কিশোর ছেলেটা লক্ষ্য করে। এ-সমস্ত কাঁথা যে 'মরা মানুষের'—তা এবার ভুলে গিয়েই হঠাৎ উঠে এসে সে চাকরটার সামনে দাঁড়ায়। তারপর বলে ঃ

—"ঝুমঝুমি? ঝুমঝুমি তো চ'লে গেছে। ও আর আসবে না। আমিও কাঁথা পাইনি। ওটা আমাকে দাও।"

এ কথায় চাকরটা ক্ষেপে গিয়েই প্রচণ্ড একটা ধমক দেয় ছেলেটাকে। ছেলেটা তবু ঘাবড়ায় না। চাকরটার পাশে পাশে পায়চারী করতে সুরু করে সে'ও। হঠাৎ এমনই সময় বাড়ীর ওপর থেকে ভেসে আসে গৃহকর্তার চিৎকার। তিনি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েই নিচের চাকরটাকে উদ্দেশ ক'রে কর্কশ গলায় বলেন ঃ

—"কিরে ব্যাটা, কাঁথাটা হাতে নিয়ে এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছিস যে? আর কি কাজকর্ম নেই? ও-কাঁথাটা ওকেই (ছেলেটাকে) দিয়ে তুই ওপরে আয় তাড়াতাড়ি।"

হঠাৎ মনিবের ধমক খেয়েই চমকে ওঠে চাকরটা। ভয়েই সে কাঁথাটা ছুঁড়ে দেয় ছেলেটার দিকে। তারপর একরকম আতঙ্ক নিয়েই সে ওপরে উঠে যায় তাড়াতাড়ি।......চাকরটা ওপরে উঠে যেতেই কাঁথাটা এবার নিজের গায়ে জড়িয়ে নেয় ছেলেটা। এমন

সময় দূর থেকে সেই খোঁড়া ভিখারীটা ছেলেটাকে উদ্দেশ করে হঠাৎ বলে ওঠে :

—"কিরে, ও-কাঁথাটা তুই নিলি ? মরা-মানুষের কাঁথা নাকি গায়ে দিতে নেই ?"

ছেলেটা একবার কটমট ক'রে তাকায় খোঁড়া ভিখারীটার দিকে। তারপর ছুটে গিয়েই গায়ের কাঁথাটা মেলে ধরে তার চোখের সামনে এবং বলে :

—"ভালো ক'রে চেয়ে দেখো, কোথাও কোনো ছেঁড়া-ফাটা নেই। এটা মরা মানুষের কাঁথা নয়, বাঁচা-মানুষের। বুঝলে ?"

এ-কথা বলেই ছেলেটা আবার গায়ে জড়িয়ে নেয় কাঁথাটা। তারপর হাঁটতে স্বরু করে উল্টোদিকে ফিরে। হয়তো হাঁটতে-হাঁটতেই সে কোনো নিরাপদ জায়গার খোঁজ করবে—যেখানে শুয়ে আজকের রাতটা সে ঘুমোবে। কিন্তু ফুটপাথের সীমা পেরিয়ে আসতেই হঠাৎ তার কানে আসে সেই আহত ছেলেটার কান্না। চোখ ফেরাতেই লাইট-পোষ্টের কাছে সে দেখতে পায় সেই বয়স্কা ভিখারিণীটাকে—দেহ যার অর্ধ-নগ্ন এবং কোলে যার তারস্বরে সমানেই চিৎকার করে চলেছে উলঙ্গ শিশুটা। সেদিকে তাকিয়েই ছেলেটা হঠাৎ থেমে যায়। তারপর ভিখারিণীটার কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে :

—"বাচ্চাটা অত কাঁদছে কেন ? ঠাণ্ডায় বুঝি ? তাতো কাঁদবেই। বাপরে, যা হাড়-কাঁপানি ঠাণ্ডা।"

ছেলেটার কথা শুনেই ভিখারিণীটা মুখ তোলে এবং লোভীর মতো একবার তাকিয়ে ছাখে তার গায়ে-জড়ানো কাঁথাটা। তারপর ও-ভাবেই বলে :

—হ্যাঁ বাছা, এ-শীতে বেঁচে থাকাই দায়। ভগবানকে এত ডাকি, তবু ভগবান একবার মুখ তুলে তাকায় না।

ভিখারিণীটার এ-কথার পর ছেলেটা হঠাৎ চিৎকার ক'রে ব'লে ওঠে :

—"ভগবান মুখ তুলে তাকাবে ? আমাদের জন্যে ভগবান আবার আছে নাকি ? ভগবান তো বড়লোকদের কেনা গোলাম।

একথা বলেই সে সহসা তার গায়ের কাঁথাটা খুলে ছুঁড়ে দেয় ভিখারিণীটার দিকে। তারপর আবার বলে :

—"এই কাঁথাটা দিয়ে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে নাও। বাপরে, যা শীত!"

ভিখারিণীটা এমন ঘটনা প্রত্যাশা করেনি। তাই সে ফ্যাল্‌-ফ্যাল চোখে ছেলেটার দিকে একবার তাকায়। তারপর বলে :

—"বাছা, তোর গায়েও তো কিছু নেই! তুই থাকবি কি ক'রে ?"

এ-কথার উত্তর দেবার আগে ছেলেটা একবার হু-হু ক'রে কেঁপে ওঠে শীতে। তারপর ওভাবেই কোনো মতে বলে :

—দেখছো না ? আমি অনেক বড়ো হয়েছি। শীতে আর অত ভয় নেই আমার।

তারপর হঠাৎ সে ফুটপাথ ধ'রে দৌড় মারে সবেগে। হয়তো এভাবে দৌড় মেরেই সে তাড়িয়ে নিয়ে যায় শীতকে এবং উত্তপ্ত ক'রে তোলে তার হিমে-কাতর মনটাকে।

একদিন সমস্ত দুর্বল ও হিমে-কাতর মন যদি একসঙ্গে এভাবেই হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তাহলেও কি শীতের এই স্বৈরাচার চলবে আজব নগরীর পথে পথে ?

———

পরিবর্তন

ক্রিকেট খেলা চলছে বনেদী পাড়ার রাস্তায়। ইঁটের উইকেট লক্ষ্য ক'রে সজোরে বল ছুঁড়ছে কেউ কেউ, আর কেউ কেউ ব্যাট করছে। সরু রাস্তার সমস্ত দিক অবরোধ ক'রে ফিল্ডিং দিচ্ছে অনেকে। এরা সবাই যুবক। অবশ্য দলের মধ্যে দু'একজন কিশোরও রয়েছে। তবে যুবকদের প্রভাবই বেশি। কথা এদের কাট-কাট, ভঙ্গী এদের বেপরোয়া। সমস্ত পাড়াটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে এদেরই পায়ের চাপে। এরা প্রত্যেকেই এক-একটি দুঃশাসন। তাই আইনের খবর এরা রাখে না এবং এদেরও খবর রাখে না আইন।

সেদিন খেলা শুরু হয়েছিল সকাল থেকেই। বেলা দশটা নাগাদ খেলা যখন বেশ জ'মে উঠেছে—ঠিক তখনই ব্যাটের প্রচণ্ড ঘায়ে ক্রিকেটের শক্ত বল ছিটকে গিয়ে আঘাত করে কোনো এক দোতলা বাড়ীর কাঁচের জানলায়। ফলে জানলার কাঁচ টুকরো টুকরো হয়ে ঝ'রে পড়ে বারান্দায় এবং বারান্দা থেকে রাস্তায়। ক্রীড়ারত যুবকরা একটু হকচকিয়ে গিয়ে ওপর দিকে তাকায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পরক্ষণেই তারা আবার নিজেকে সামলে নিয়ে মন দেয় খেলায়। যেন বলের আঘাতে কাঁচের জানলা ভাঙাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমন ঘটেই থাকে। এতে অপরাধের কিছু নেই। অপরাধ যদি কিছু থেকেও থাকে, তবে তা বাড়ীওয়ালার। তাঁর উচিত ছিল জানলায় কাঁচ না লাগিয়ে ইস্পাত লাগানো। সুতরাং ও-বাড়ীতে যাঁরা বাস করেন, এ-

ব্যাপারে তাঁরা যে কেউ প্রতিবাদ করবেন না—যুবকরা এ-বিষয়ে নিশ্চিত।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাদের এ-নিশ্চিত ধারণা আজ আর টিকলো না। কারণ বাড়ীর দোতলার দরজা খুলে আজ

অপ্রত্যাশিতভাবেই বারান্দায় এসে দাঁড়ান এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। এ-ভদ্রলোক ও-বাড়ীরই একজন ভাড়াটে। তিনি নাকি কোনো

এক কলেজের অধ্যাপক এবং এ-পাড়ায় এসেছেন নতুন। তিনি ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়েই যুবকদের লক্ষ্য ক'রে সরাসরি ব'লে ওঠেন :

—"তোমাদের উচ্ছৃঙ্খলতা এখানে আর চলবে না। খেলা বন্ধ কর।"

এ-সমস্ত যুবককে লক্ষ্য ক'রে এমন দৃঢ়কণ্ঠে কেউ আদেশ করতে পারে—তা এ-অঞ্চলের কারো পক্ষে ভাবা সত্যই কল্পনাতীত। তাই এক সঙ্গে চমকে ওঠে সবাই। খানিকক্ষণের জন্য খেলা থেমে যায়। যুবকদের মিলিত দৃষ্টি চকিতে বিস্ফারিত হয় ভদ্রলোকের দিকে। হয়তো তারা অতিমাত্রায় অবাক হয় ভদ্রলোকের দুঃসাহস লক্ষ্য ক'রে। এমন সময় আরেকবার ভেসে আসে তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর :

—"এ নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। আমি বলছি, তোমরা খেলা বন্ধ কর।"

এবার যুবকদের মধ্য থেকেও তার প্রতি-উত্তর ভেসে যায়। একজন যুবক তার দেহের পেশী দুলিয়ে ভদ্রলোককে উদ্দেশ ক'রে এবার বলে ওঠে :

—"ইস, খেলা বন্ধ করবে! মামার বাড়ীর আবদার পেয়েছেন নাকি?"

এ-কথার সঙ্গে সুর মিলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন যুবকও বলে ওঠে :

—"আপনার জানলার কাঁচ ভেঙেছে ব'লে আমরা দুঃখিত। আর যাতে না ভাঙে তার চেষ্টা আমরা করবো। আপনি এবার যেতে পারেন।"

ভদ্রলোক কিন্তু যুবকদের কথায় বিন্দুমাত্রও শান্ত বা বিচলিত

হলেন না। বরং এবার আরও কয়েক মাত্রা গলা চড়িয়ে ব'লে উঠলেন :

—"আমি তোমাদের কোনো কথা শুনতে চাই না। কেবল জানতে চাই, তোমরা খেলা বন্ধ করবে কিনা ?"

যুবকরা সমস্বরে উত্তর দেয় :

"না।"

এই 'না' শব্দের সঙ্গেই সমতা রেখে ভদ্রলোক আবার বলেন :

—"খেলা তোমাদের বন্ধ করতেই হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে যুবকদের মধ্য থেকেও আবার ভেসে যায় কঠিন উত্তর :

—"মশায়, বেশি তরপাবেন না। এ-রাস্তা আপনার জরীপ করা নয়। আমরা খেলবো। আপনি যা করতে পারেন করুন। তারপর আপনার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে—আমরা দেখে নেবো।"

ভদ্রলোক তেমনই অবিচলিত কণ্ঠে আরেকবার বলেন :

—"আমি এই শেষবার বলছি, খেলা বন্ধ কর।"

কিন্তু যুবকরা ভদ্রলোকের কথায় আর কর্ণপাত না ক'রে এবার আবার নতুন ক'রে স্বুরু করে খেলা। এই নতুন ক'রে খেলা স্বুরু করার প্রতি বার-কয়েক ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বুলিয়েই ভদ্রলোক এবার অদৃশ্য হয়ে যান ওপরের বারান্দা থেকে এবং পরমুহূর্তেই তিনি আবির্ভূত হন প্রকাশ্য রাস্তায়। তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এসেই সজোরে একটা লাথি মারেন ইঁটের উইকেটে। উইকেট ভেঙে যায়। তারপর যে-যুবক স্বদেহের পেশী ফুলিয়ে খানিক আগে কথা বলছিল—তারই হাত থেকে তিনি কেড়ে নেন খেলার ব্যাটটা। তাঁর এই দুঃসাহসিক স্পর্ধায় যুবকরা এবার প্রচণ্ড রকম ক্ষেপে যায়। হৈ-হৈ করতে করতে তারা এবার এক সঙ্গেই

ছুটে আসতে থাকে ভদ্রলোকের দিকে। কিন্তু তারা কাছাকাছি আসতে-না-আসতেই ভদ্রলোক দৃঢ়ভাবে বাগিয়ে ধরেন ব্যাটটা। তারপর চিৎকার ক'রে বলেন :

—"খবর্দার! আর এক পা এগুলে, তোমাদের এক-একটি মাথা আমি গুড়ো ক'রে ফেলবো।"

যুবকরা সত্যই এবার হকচকিয়ে থেমে যায়। বিশেষ ক'রে ভদ্রলোকের হাতে ব্যাটটা বাগানো অবস্থায় দেখেই তারা আর এগুতে সাহস করে না। রাস্তার এই আকস্মিক ঘটনা লক্ষ্য ক'রে মুহূর্তেই ভীড় জ'মে ওঠে আশেপাশে এবং বিভিন্ন বাড়ীর বারান্দায় ও ছাদে। ভদ্রলোক চারদিকে বার-কয়েক দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রেই ব্যাটটা নামিয়ে রাখেন পায়ের কাছে। তারপর হঠাৎ ডান হাতের পাঞ্জাবীর হাতা গুটিয়ে ব'লে ওঠেন :

—"পেশী আমার দেহেও আছে।"

এই ব'লেই তিনি হাতের পেশী ফুলিয়ে যুবকদের একবার দেখান। তারপর আবার বলেন :

—"আমার এই এক হাতের সঙ্গে তোমরা পাঁচজনে একসঙ্গে পাঁচখানা হাত দিয়ে পাঞ্জা ল'ড়ে আগে জেতো। তারপর এসো মারামারি করতে। পারবে? মুরোদ থাকে তো এগিয়ে এসো।"

কিন্তু যুবকদের মুখে কথা নেই। তারা যে ভয় পেয়েছে তা নয়, তবে বেশ একটু ঘাব্‌ড়ে গেছে ভদ্রলোকের কথায়। অবস্থা লক্ষ্য ক'রে ভদ্রলোক এবার হাসি ফোটান তাঁর কঠিন মুখে। তারপর বলেন :

—"তোমাদের মুরোদ কত—তা' বুঝেছি। এবার আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে না থেকে যে-যার বাড়ী গিয়ে স্নান-খাওয়া-দাওয়া কর গে, যাও।"

কিন্তু যুবকদের বাড়ী ফেরা আর হলো না। কারণ পর-মুহূর্তেই পাশে এসে দাঁড়ায় একটি পুলিশের ভ্যান। ভ্যান থেকে জন-কয়েক কনেষ্টবল নেমেই যুবকদের পাকড়াও করে এবং একে একে তাদের টেনে তুলতে স্থুরু করে ভ্যানে।

ভদ্রলোক হঠাৎ এমন অবস্থা লক্ষ্য ক'রে খানিকক্ষণ কী যেন ভাবেন। তারপর সহসা তিনি ছুটে আসেন ভ্যানের কাছে। জন-কয়েক কনেষ্টবলকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিয়েই তিনি ভ্যানের মধ্যে হাত

গলিয়ে একে একে যুবকদের হাত ধ'রে তাদের আবার টেনে নামিয়ে আনেন ভ্যান থেকে। তারপর পুলিশকে লক্ষ্য ক'রে বলেন ঃ

—"কী ব্যাপার মশায় ? পাড়ার ছেলেদের এভাবে ভ্যানে তুলছেন কেন ?

ভ্যানের সামনের সিট থেকে এবার নেমে আসেন একজন

সার্জেণ্ট। তিনি এসেই ভদ্রলোকের মুখোমুখি দাঁড়ান। তারপর বলেন :

—"এরা পাড়ার শান্তি নষ্ট করছে ব'লে আপনারাই তো কেএকজন ফোন করেছিলেন থানায়। তাইতো আমরা এদের নিয়ে যাচ্ছি। আপনি বাধা দিচ্ছেন কেন ?"

ভদ্রলোক সার্জেণ্টের কথা শুনে বেশ একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই এবার বলেন :

—"দেখুন মশায়, এরা এমন কোনো মারাত্মক অশান্তি ঘটায়নি—যার জন্য এদের থানায় যাওয়ার প্রয়োজন আছে। এরা আমাদেরই ছেলে। এদের দায়িত্ব আমরাই নিতে পারবো। এ-ব্যাপারে আপনাদের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন নেই। দয়া ক'রে আপনারা চলে যান।"

এ-কথার পর পুলিশ সার্জেণ্ট ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ কী-যেন ভাবেন। তারপর কনষ্টেবলদের ভ্যানে তুলে নিয়ে সত্যই তিনি চলে যান পাড়া ছেড়ে।

পুলিশ-ভ্যানটা স'রে যেতেই যুবকরা এবার একসঙ্গে তাদের বিস্মিত দৃষ্টি মেলে ধরে ভদ্রলোকের মুখের ওপর। ভদ্রলোক তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন নীরবে। এমন সময় হঠাৎ একজন যুবক ছুটে এসেই তার পায়ের ধূলো নেয়। তারপর বলে :

—"স্যার আমাদের মাপ করুন।"

একজনকে অনুসরণ করে অনেকে। তারপর সবাই একে একে স'রে পড়ে রাস্তা থেকে। সম্ভবতঃ যুবকদের এই হঠাৎ পরিবর্তনের কথা ভেবে, বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে কেবল ভদ্রলোকই

তখনো দাঁড়িয়ে রইলেন রাস্তার মাঝখানে। হঠাৎ তাঁর চমক ভাঙলো একটি বাচ্চা মেয়ের ডাকে। কোনো এক বাড়ি থেকে মেয়েটি টুক্‌টুক ক'রে হেঁটে এসেই ভদ্রলোকের হাতে গুঁজে দেয় একটা আধ-শুকনো রজনীগন্ধার ডাল। তারপর বলে ঃ

—"তুমি আমার দাছু হবে ?"

ভদ্রলোক অতিমাত্রায় অবাক হয়ে তাঁর বিহ্বল দৃষ্টি নামিয়ে আনেন মেয়েটির মুখের ওপর। তারপর হঠাৎ এক সময় প্রচণ্ড শব্দে হেসে উঠেই মেয়েটিকে তিনি তুলে নিলেন বুকে। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সমস্ত পাড়াটা।

———

শিল্পী

শহরে বিকেল নামলেই উঁচু উঁচু প্রসাদসমূহের সারিবন্দী ছায়া যখন এলিয়ে পড়ে বিভিন্ন রাজপথে—ঠিক তখনই আবির্ভাব ঘটে সেই ছেলেটার। সে এসেই রাজপথের ধার-ঘেঁষে বসে। তারপর রোলার চাপা মসৃণ পিচের ওপর অথবা ফুটপাথের সমতল পাথরের ওপর আঁকে বিভিন্ন দেব-দেবীর অবয়ব নানা রঙের চক দিয়ে। কখনো ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মূর্তি এবং কখনো বা দশভূজা-চতুর্ভূজার নিখুঁত প্রতিমা এঁকে, সে নীরবে ব'সে থাকে পাশেই। পথ চলতে চলতে তাকে ঘিরে অনেকেই ভীড় ক'রে দাঁড়ায়। যারা শিল্প-রসিক তারা তারিফ করে তার শিল্প কর্মের; যারা ধর্মপরায়ণ—তারা হঠাৎ অবাক হয়ে নিবেদন করে ভীরু নমস্কার; যারা কৌতূহলী—তারা পাশে ব'সে নানাভাবে জিজ্ঞেস করে তার নাম-ধাম ও পরিচয়। তারপর দেখতে দেখতে কিছু খুচরো পয়সাও জ'মে ওঠে তার কোলের কাছে।

ভীড় হালকা হ'তেই ছেলেটা উঠে যায় অন্যত্র। দিনের আলো থাকলে, সে আবার অন্যপথে আঁকে অনুরূপ ছবি এবং আকর্ষণ করে অন্য পথিকদের। তারপর সন্ধ্যা ঘনালেই ধীরে ধীরে সে ফিরে আসে তার আস্তানায়। আস্তানাটা তার বড়োবাজারের কোনো এক গাড়ি-বারান্দার নিচে।

ছেলেটা আজ পেরিয়ে এসেছে কৈশোরের সীমা। আজ সে শহরের সমস্ত অংশেই পরিচিত। কারণ প্রায় পাঁচ বছর ধ'রে শহরের পথে-ঘাটে সে এভাবেই প্রত্যহ ছবি এঁকে চলেছে এবং

তারই মাধ্যমে কোনোমতে সে বাঁচিয়ে রেখেছে নিজেকে। আর এক মনে তামিল ক'রে চলেছে তার গুরুর আদেশ · যে-গুরু তার দেশান্তরী। হয়তো একদিন তিনি ফিরবেন। অতএব তাঁরই আশায় পথ-চাওয়া ছেলেটা শহরের পথে নক্‌শা এঁকে চলেছে আজও।

ছেলেটার নাম গোপাল। বয়স যখন তার বছর-পাঁচ—তখন একটা পথবাসী দলের সঙ্গে সে বসবাস ক'রতো বড়োবাজারের কোনো এক ফুটপাথে। কিছুদিন পর যে-কোনো কারণেই হোক, এই দলটা হঠাৎ ছত্রভঙ্গ হ'য়ে হারিয়ে যায়। ফুটপাথে কেবল দল-ছাড়া হয়ে প'ড়ে থাকে গোপাল। তখনো সে জানতো না তার মা-বাপ কে এবং তারা কোথায়।

বড়োবাজারের ধর্মভীরু ব্যবসায়ীদের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে তখন থেকে সে একা একা ফুটপাথেই দিন কাটাতে থাকে। আপন বলতে তার কেউ নেই। আপন জনের আদর-যত্নও সে কোনোদিন পায়নি। অর্থাৎ স্নেহ-ভালোবাসার আস্বাদ কাকে বলে তা সে বুঝতো না বলে জীবনের দুঃখ-কষ্টকেই সে মনে করতো স্বাভাবিক। যেদিন খেতে পেতো—সেদিন বেশ খুশি হয়েই সে ঘুমিয়ে পড়তো ফুটপাথে এবং যেদিন খেতে পেতো না—সেদিন মনমরা হয়ে একা একা ব'সে থাকতো নীরবে। সময়ের গতি তার ছোট্ট জীবনটির সঙ্গে এভাবেই জড়িয়ে থাকত প্রত্যহ।

ঠিক এমনই দিনে এক সময় একজন চিত্রশিল্পী আসেন বড়োবাজারে হয়তো বাজার করার উদ্দেশ্যেই। পথ চলতে চলতে হঠাৎ তিনি দেখতে পান ফুটপাথের গোপালকে। ছবি আঁকাই তার নেশা এবং পেশা। সুতরাং গোপালকে দেখেই কেন যেন তাঁর ইচ্ছে হয় গোপালের অসহায় মুখটাকে ছবিতে ধ'রে

রাখার। কিন্তু সঙ্গে তাঁর রঙ-তুলি নেই। তাই গোপালকে তিনি সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসেন নিজের আস্তানায়—যেখানে তিনিও একা বাস করেন। আর দিন-রাত কেবল ছবি আঁকেন মনের আনন্দে।

গোপালকে এনেই তার ছবি তিনি আঁকতে শুরু করেন। সম্পূর্ণ ছবিটি শেষ হ'তে প্রায় সময় লাগে সপ্তাহখানেক।

ছবি আঁকা শেষ হতেই গোপাল আবার ছুটি পায়।

ছুটি পেয়ে সে আর ফিরে এলো না বড়োবাজারের ফুটপাথে, চিত্র-শিল্পীর আস্তানাতেই সে রয়ে গেল এবং সেখানেই শুরু হলো তার নতুন জীবন।

গোপাল চিত্র শিল্পীর কাছে তাঁর একজন সাহায্যকারী

হিসেবেই অবস্থান করতে থাকে। সময়মতো সে ঘর ঝাঁট দেয়, বিছানা ঝাড়ে, রঙ-তুলি সাজিয়ে রাখে। তারপর চিত্র-শিল্পী যখন তার নির্দিষ্ট সময়ে ছবি আঁকতে স্থুরু করেন—তখন সে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশ একাগ্রমনে তা লক্ষ্য করে। তুলির প্রতিটি টান সে অবাক চোখ মেলে দেখে এবং এভাবে দেখতে দেখতেই একদিন তারও অবুঝ মনে হঠাৎ সাধ জাগে ছবি আঁকার।

গোপাল ছবি আঁকতে জানে না। তবু মনে তার প্রচণ্ড সাধ জাগে বলেই সে গোপনে গোপনে চেষ্টা করতে থাকে ছবি আঁকার। চিত্র-শিল্পী যখন কাজের তাগিদে বাইরে যান—গোপাল তখন তাঁরই রঙ-তুলি নিয়ে বাজে কাগজে রেখার পর রেখা টেনে মনের কাঁচা কল্পনাকে রূপ দেবার চেষ্টা করে এবং দিনে দিনে এ-নেশাই তাঁকে পেয়ে বসে।

এভাবেই একদিন ছবি আঁকতে গিয়ে গোপাল হঠাৎ ধরা পড়ে তার প্রভু অর্থাৎ চিত্র-শিল্পীর কাছে। চিত্র-শিল্পী বাজে কাগজের ওপর গোপালের ছবি আঁকবার অদ্ভুত প্রচেষ্টা লক্ষ্য ক'রে বেশ একটু বিস্মিত হন। তারপর স্নিগ্ধ হেসে বলেন ঃ

—"বাঃ! তোমার তো ছবি আঁকার হাত রয়েছে দেখছি। সাধনা চালিয়ে যাও। ফল একদিন নিশ্চয়ই পাবে।"

প্রভু অর্থাৎ চিত্র-শিল্পীর কাছ থেকে অভয় এবং প্রেরণা লাভ ক'রে আরও বেশি সচেতন হ'য়ে ওঠে গোপাল। সেদিন থেকে দ্বিগুণ উৎসাহে সে কাজে নামে। সারাদিন কাজ করতে করতে সে আপন মনে বিভিন্ন বিষয়ের কল্পনা করে এবং রাতের বেলা না ঘুমিয়ে সেই কল্পনাকে সে তুলির এলোমেলো টানে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। কখনো ফোটে, কখনো ফোটে না। তবু

এভাবেই সে তার সাধনা চালিয়ে যায় এবং দেখতে দেখতে সত্যিই তার কাঁচা হাত পাকতে শুরু করে ধীরে ধীরে। ধীরে ধীরে তার বিশ্বাস জন্মে—সে'ও একদিন বড়ো হতে পারবে।

কিন্তু বড়োই দুঃখের বিষয়, ঠিক এমন সময়ে তার প্রভু অর্থাৎ সেই চিত্র-শিল্পী নতুন এক চাকুরীর ডাকে হঠাৎ পাড়ি জমান দেশান্তরে। যাওয়ার সময় গোপালকে তিনি তাঁরই এক বন্ধুর

বাড়ীতে রাখার ব্যবস্থা করেন। তারপর তাকে কাছে ডেকে এ-কথাও বলে যান:

—"বছর কয়েকের মধ্যেই আমি আবার দেশে ফিরে আসবো। এ-কবছর তুমি যতো কষ্টই পাও, সাধনা থেকে কিছুতেই হটে যেও না। আমি ফিরে এসেই তোমার একটা ভালো ব্যবস্থা ক'রে দেবো।"

চাকুরীর ডাকে দেশান্তরে চ'লে গেলেন চিত্র-শিল্পী এবং তাঁরই এক বন্ধুর বাড়ীতে নতুন আশ্রয় পেলো গোপাল। কিন্তু এ-আশ্রয় তার সাধনার অনুকূল হলো না। কারণ ও-বাড়ীর লোক-জনেরা গোপালের ছবি আঁকা বেশিদিন বরদাস্ত করতে পারলেন না। তাঁরা চাইলেন গোপালকে দিন-রাত কেবল চাকরের মতো খাটাতে। অবশ্য খাটতে আপত্তি নেই গোপালের। সারাদিন অবিরাম কাজ-কর্ম ক'রে রাতের বেলা সে ছবি আঁকতে বসতো। কিন্তু বাড়ির লোকজনেরা তাতেও বাদ সাধলেন। বললেন :

—"সারারাত বাতি জ্বালিয়ে এ-সব অপকর্ম করা চলবে না।"

গোপালের মনে রয়েছে বড়ো হবার সাধ। তাই ও-বাড়ীর কড়া শাসন ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রচণ্ড চাপ সে আর সহ্য করতে পারলো না বেশিদিন। বছরখানেক পরেই সে ও-বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর এতদিন পরে আবার সে ফিরে গেল তার বাল্যকালের আশ্রয়স্থলে, অর্থাৎ বড়োবাজারের ফুটপাথে। হতাশার বুকে পা রেখে বড়ো হবার নতুন আশাকে সে মাথায় তুলে নিল। হাসতে হাসতেই গ্রহণ করলো ফুটপাথের কঠিন জীবন—যেখানে কোনো করুণা নেই, স্নেহ নেই, সহানুভূতি বা দাক্ষিণ্য নেই। আছে কেবল উপেক্ষা, অবজ্ঞা এবং কঠিন পরিহাস। কিন্তু তবু সম্ভবতঃ এ-আশ্রয় তার সাধনার অনুকূল। কারণ এখানে কোনো কড়া শাসন নেই, নেই কোনো সময়ের সীমারেখা। অতএব সাধনার মাধ্যমে এবার থেকে পথে-পথেই কাটতে লাগলো তার দুঃখের দিনগুলি।

তারপর, বছরের পর বছর কেটে গেল। কৈশোরের সীমা অতিক্রম ক'রে আরও কিছুদূর এগিয়ে এলো গোপাল। কিন্তু আজও তার প্রভু বা গুরু, অর্থাৎ সেই চিত্র-শিল্পী দেশে ফিরে

এলেন না। কবে আসবেন—গোপাল তা জানে না। কোথায় কোন্ দেশে তিনি আছেন—তার ঠিকানা আজও অজানা তার কাছে। কিন্তু গোপাল ভোলেনি তার নির্দেশ, হটে যায়নি সাধনার পথ থেকে। আজও সে বাঁচিয়ে রেখেছে, জাগিয়ে রেখেছে বড়ো হবার সাধকে। শহরের পথে পথে ফুটপাথের কঠিন পাথরে আজও অবিরাম তার সাধনা চলেছে। হতাশার বুকে পা রেখে, নতুন আশাকে মাথায় তুলে সে দাঁড়িয়ে আছে নির্ভয়ে।

———

পথের সংসার

শেয়ালদা থেকে বউবাজার ষ্ট্রীট ধ'রে খানিকটা হাঁটলেই অজস্র বাড়ীর সঙ্গে সেই বিরাট বাড়ীটাও নজরে পড়ে ডানদিকে। বাড়ীটা অনেককালের হলেও, ঘন ঘন সংস্কারের ফলে আজও দাঁড়িয়ে আছে নতুনের মতোই। তার তলায় রয়েছে একটা প্রশস্ত গাড়ী-বারান্দা। লম্বায় অন্তত পঞ্চাশ হাত। অবশ্য এটাকে গাড়ী-বারান্দা না ব'লে ফুটপাথ বললেও চলে। কারণ তা ফুটপাথেরই অংশ। এখানেই অর্থাৎ এই হাত-পঞ্চাশেক ঢাকা ফুটপাথের মধ্যেই সংসার পেতে বসেছে গোটা-কয়েক পরিবার। এ-সমস্ত পরিবারে ছ'মাসের শিশু থেকে সত্তর বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত বর্তমান। এদের গায়ে কোনো আবরণ নেই। প্রত্যেকের পরনের কাপড়ও শতছিন্ন। ফুটপাথেই এদের উনোন জ্বলে, উনোনে হাঁড়ি চড়ে। কিন্তু হাঁড়িতে প্রত্যহ কী রান্না হয় তা জানা যায় না। এদের কোনো কাজ-কারবার নেই। অথচ এরা ভিক্ষাও করে না। ভিখারী এদের মধ্যে কেউ নেই। কথা বলে বাংলায়। তাই বোঝা যায় এরা বাঙালী। কিন্তু বাঙালী হলেও ঠিক কোন্ জিলার লোক এরা এবং কেনই বা আজ ফুটপাথে এদের অবস্থান, আর এই অনিশ্চিত অবস্থানের স্থায়িত্বই বা কতদিন তা কেউ জানে না।

সেদিন ছিল শনিবারের বিকেল। ফুটপাথ ধ'রে হাঁটতে হাঁটতে অলক্ষ্যেই একবার এসে পড়েছিলাম এই সমস্ত এলোমেলো সংসারের পাশে। আনমনে এদের পাশ কাটিয়ে হেঁটে যেতেই হঠাৎ কানে আসে একটা কর্কশ গলার স্বর। শব্দ লক্ষ্য ক'রে

চোখ ফেরাতেই দেখি: ফুটপাথের আরেক প্রান্তে তিনটে ক্রন্দনরত নাবালক সন্তানকে আগলিয়ে নিয়ে ব'সে আছে একটা রুগ্ন মেয়েলোক এবং তার পাশে দাঁড়িয়ে অকথ্য ভাষায় চিৎকার করছে একটা মধ্যবয়স্ক পুরুষ। পুরুষটা যে মেয়েলোকটারই স্বামী তা' বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হলো না ওদের কথা-বার্তার ধরণ দেখে। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য সংসারের নারী-পুরুষ সবাই যে-যার

কাজে ব্যস্ত। ওদের প্রতি কারুরই কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। হয়তো সেজন্যেই লোকটা আরও বেশি সুযোগ পেয়ে গলা চড়িয়ে দিচ্ছে সপ্তমে। মেয়েলোকটাকে লক্ষ্য ক'রে সে বলছে:

—"যা খাবার ছিল তা ছেলেদের না খাইয়ে তুইই কি সব গিলেছিস? রাক্ষসী, ছেলেরা এখন খাবে কি? যেভাবেই

পারিস ছেলেদের তুই খেতে দে। নইলে তোকে আমি আস্তো রাখবো না।"

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েলোকটাও উত্তর দিল ক্ষীণ কণ্ঠে :

—"আমি গিলেছি ? এ-কথা তুমি বলতে পারলে ? যা ছিল—তা খেয়ে ছেলেদেরই তো পেট ভরেনি। তা' আবার আমি খাবো কোত্থেকে ?"

লোকটা তেমনই ঝাঁজালো স্বরে বলে :

—"নিশ্চয়ই খেয়েছিস। তুই খেয়েছিস বলেইতো ছেলেরা খেতে পায়নি। তাইতো এখন ওরা কাঁদছে।"

মেয়েলোকটা এবার অবাক চোখ তুলে তাকায় স্বামীর দিকে। দেখতে দেখতে ক্রমেই কঠিন হয়ে ওঠে তার নিরক্ত মুখমণ্ডল। ধীরে ধীরে বলে :

—"দেখো, বেশি বাড়াবাড়ি ক'রো না। ছেলেরা সেই কোন্ সকালে দু'মুঠো খেয়েছে। এতক্ষণে আবার ক্ষিধে পেয়েছে বলেই ওরা কাঁদছে। আমি নিজে তোমার খাবার ছুঁইওনি। আমাকে খেতে দেবার মুরোদ কি তোমার আছে ? না ছিল কোনোদিন ?"

লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে বলে : "আমার খেতে দেবার মুরোদ নেই ? আমি তোকে খেতে দিইনি ? তবে এতদিন বেঁচে রইলি কি ক'রে ?"

মেয়েলোকটা আবার তার ফ্যাকাসে মুখ তুলে ধরে স্বামীর চোখের ওপর। তারপর বলে :

—"আমার দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দেখোতো, এরই নাম কি বেঁচে থাকা বলে ?"

এ-কথার পর লোকটা যেন আরও বেশি ক্ষেপে যায় এবং দাঁত খিঁচিয়ে বলে :—"বেঁচে থাকা বলে না ? তবে পুরোপুরিই

মরে গিয়ে স্বর্গে যা। ওখানেই তুই খেতে পাবি। আমি তোকে আর চাই না।”

এই বলেই সে হঠাৎ মেয়েলোকটার একটা হাত ধ'রে তাকে টেনে তোলে। তারপর তার কঙ্কালসার দেহটাকে সজোরে ঠেলে দেয় রাস্তার দিকে। টাল সামলাতে না পেরে মেয়েলোকটা ছিটকে পড়ে সিমেন্টের ওপর। মাথায় প্রচণ্ড ঠোক্কর খেয়ে একবার শুধু সে আর্তনাদ ক'রে ওঠে এবং নড়েচড়ে একবার চেষ্টা করে দাঁড়াবার। কিন্তু পারে না। পরক্ষণেই আবার সে মুখ থুবড়ে পড়ে এবং অসাড় হয়ে পড়েই থাকে। এ-অবস্থা লক্ষ্য ক'রে তারস্বরে চিৎকার ক'রে ওঠে ছেলে তিনটে। সঙ্গে সঙ্গে আশ-পাশ থেকেও ছুটে আসে লোকজন। আমিও খানিকটা কাছাকাছি ছুটে এসে একটা দোকানের কাছ-ঘেঁষে দাঁড়াই। অথচ কী আশ্চর্য, নির্দয় লোকটার চোখে-মুখে তখনো কোনো ভাবান্তর নেই। তখনো সে চিৎকার ক'রে চলেছে সমানেই। উক্ত ফুট-পাথেরই জনকয়েক নারী-পুরুষ তাকে টানতে টানতে নিয়ে আসে খানিকটা দূরে। তারপর কেউ কেউ তাকে শাসাতে স্বুরু করে। ঠিক এমন সময় পাশেই এসে ব্রেক ক'ষে দাঁড়ায় একখানা পুলিশ-ভ্যান। ভ্যান থেকে নেমে আসে জন-দুই কনষ্টেবল এবং সামনের সিট থেকে নেমে আসেন একজন সার্জেণ্ট। তারা গোলমাল লক্ষ্য ক'রে ভীড়ের পাশে এসে দাঁড়াতেই লোকটাকে দেখিয়ে দিয়ে কে একজন চিৎকার ক'রে বলে ঃ

“এই লোকটা তার বউকে বিনাদোষেই মেরেছে। আমরা না থাকলে বউটাকে সে খুন করেই ফেলতো।”

এ-কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই একজন কনষ্টেবল গিয়ে হাত ধরে লোকটার। লোকটা হঠাৎ চুপ মেরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে

তার চোখে-মুখেও ফুটে ওঠে এক অদ্ভুত ভাবান্তর। কনষ্টেবল তাকে টানতে টানতে নিয়ে আসে ভ্যানের কাছে। লোকটা নিঃশব্দেই আসে।

তারপর একসময় হঠাৎ সে কনষ্টেবলের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সার্জেন্টের পায়ের ওপর এবং ওভাবেই বলে ঃ

—"বাবু থানায় যেতে আমার আপত্তি নেই। তবে আমার সঙ্গে আমার বউ আর ছেলে-তিনটেকেও দয়া ক'রে নিয়ে চলুন। নইলে আমি কিছুতেই স্বস্তি পাবো না।"

সার্জেণ্ট তাকে ধমক দিয়ে বলেন ঃ তোমার বউ, আর ছেলেরা তো কোনো অপরাধ করেনি। অপরাধ করেছ তুমি। অতএব কেবল তোমাকেই যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।"

লোকটা এবার পা' ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তারপর আবার তেমনই মিনতির স্বুরে বলতে থাকে ঃ—"না না বাবু, তা হয় না। আমি দোষ করেছি। কিন্তু থানায় গেলে তো সে-দোষের শাস্তি আমি পাবো না। বরং আজকের রাতটা আপনারা আমাকে বেশ আরামেই রাখবেন। অথচ ওরা কোনো দোষ না করেও এখানে প'ড়ে থাকবে, আর না খেয়ে কষ্ট পাবে সারারাত— এ আমি সইতে পারবো না।"

লোকটার এ-কথা বোধকরি কারুরই ঠিক বোধগম্য হলো না। তাই পুলিশ এবং ভীড়ের প্রায় প্রত্যেকেই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি সুরু করে। সম্ভবতঃ এ-অবস্থা লক্ষ্য করেই লোকটা আবার বলে ঃ

—"আমাকে থানায় নিয়ে গেলে তো আজকের রাতটা হাজতের ঘরে আটকে রাখবেন, আর যাহোক দু'মুঠো খেতেও দেবেন।

কিন্তু ওরা এই শীতের বাতাসে এখানেই প'ড়ে থাকবে অনাহারে বিশেষ ক'রে বউটা আমার সারাদিন কিছু খেতে পায় নি। না খেতে পেয়েই ওর শরীরটা দিন দিন রোগা হয়ে গেছে। রাগ সামলাতে না পেরে আজ আবার ওকে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়েছি। তার

ওপর আজকের রাতটাও যদি সে খেতে না পায়, তাহ'লে হাজতের ঘরে বসে আমি কোন্ মুখে আপনাদের দেওয়া খাবার খাবো ?"

লোকটার এ-কথার পর সত্যিই একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসে

সমস্ত পরিবেশটার মধ্যে। কিন্তু পরক্ষণেই হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে চিৎকার ক'রে ওঠে একটা বুড়ি :

"এই না বললি যে. ছেলেদের না খাইয়ে সব খাবার বউটা নিজেই গিলেছে? ওই জন্মেইতো ওকে ধ'রে তুই মারলি। এখন আবার বলছিস বউটা সারাদিন না খেয়েই আছে?"

বুড়িটার কথা শুনে লোকটা হঠাৎ তার নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে স্থুরু করে।

তারপর বলে :

—"ওগো, ওকথা আমার রাগের কথা, মনের কথা নয়। বউটা যে দিনের পর দিন না খেয়েই থাকে, তা আমি ভালো করেই জানি। কিন্তু কী করবো বলতে পার? দিনমান পথে পথে ঘুরি, মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না। একটা কানাকড়িও জোগাড় করতে না পেরে নিরাশ হয়ে সন্ধ্যাবেলা যখন ফিরে আসি, তখন সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে ওই বউটার ওপর। তখন আমি আর মানুষ থাকি না, পশু হয়ে যাই।"

এ-কথা বলেই সে খানিকক্ষণ নীরব থাকে। তারপর আবার বলে :

—"কিন্তু যখন মানুষের মতো থাকি, তখন তো বুঝতে পারি : বউটা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! না খেয়েই আমার সেবা যত্ন করছে, ছেলে-তিনটেকেও মানুষ ক'রে তুলছে।"

এই ব'লে আরেকবার সে ঝাঁপিয়ে পড়ে সার্জেণ্টের পায়ের ওপর। এবং ওভাবেই আবার বলে :—"বাবু, আপনার পায়ে ধ'রে বলছি, দয়া ক'রে আমার সঙ্গে ওদেরও নিয়ে চলুন। তাহলে আজ রাতের মতো ওরাও দু'মুঠো খেতে পাবে।"

পুলিশ-সার্জেণ্ট কী ভাবলেন জানি না। তিনি কোনো

কথা না ব'লে হঠাৎ পা ছাড়িয়ে নিয়ে ভ্যানের মধ্যে উঠে বসলেন। তারপর কনষ্টেবল দু'জনও উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে ভ্যানটা ষ্টার্ট নিয়ে চ'লে গেল। লোকটা প'ড়ে রইলো পেছনেই। খানিকক্ষণ সে চলন্ত ভ্যানটার গতিপথের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ একসময় নিজের মনেই ব'লে উঠলো ঃ

—হায়রে! কপালে এমন দুঃখই জুটেছে—যার ভয়ে পুলিশও পালিয়ে যায়!'

তারপর ওখানে আর না দাঁড়িয়ে সে ছুটে আসে বউটার কাছে। পাশে ব'সে বউয়ের মাথাটা সে আলতোভাবে টেনে নেয় কোলের ওপর এবং আরেকবার চিৎকার ক'রে বলে ঃ

—"হারে হতভাগী, ভাগ্যগুণে এমন স্বামীই পেয়েছিস—যে তোকে একমুঠো খুঁদকুড়োও দিতে পারে না।"

এমন সময় ফুটপাথের অন্যপ্রান্ত থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে একজন অথর্ব বৃদ্ধ। বৃদ্ধ তার ট্যাঁক থেকে একটা সিকি বের ক'রে ছুঁড়ে দেয় লোকটার দিকে। তারপর বলে ঃ—"যাও, ওভাবে আর ন্যাকামি না ক'রে কিছু কিনে এনে বউটাকে খাওয়াও।"

এই ব'লে আবার সে উল্টোমুখে ফিরে চলতে থাকে। কিন্তু চলতে চলতে আরেকবার ব'লে যায় ঃ

"এত দুঃখে রাগতো হবেই। কিন্তু রাগের বাজে খরচ ক'রে লাভ কি? সব রাগ জমিয়ে রাখো বুকে। তারপর একদিন

সময় এলে, এক সঙ্গেই ঝেড়ে ফেলো সমস্ত রাগের আগুন—
যাতে বেইমান দুনিয়াটা জ্বলে যায়।"

বৃদ্ধের কথা শুনেই বোধ করি পশ্চিমের রক্তপায়ী সূর্যটা ঢ'লে পড়লো সন্ধ্যার কোলে এবং অন্ধকারে দেহ ঢাকলো বেইমান দুনিয়াটা।

পয়মন্ত

পথটা বেশ প্রশস্তই। কিন্তু বস্তি এলাকা বলেই নোংরা এবং ফুটপাথহীন। রিক্সা এবং ঠেলাগাড়ী ছাড়া এ-পথ দিয়ে অন্য কোনো ভারি যান-বাহনের চলাচল বিশেষ নেই। পথের দু'দিকেই টালি-খোলার ঘর, সকাল-বিকেল এ-সমস্ত ঘরেরই ছায়া এসে পড়ে রাস্তায়। তাই রাস্তার ছায়াযুক্ত অংশে আড্ডার অন্ত নেই। বস্তিবাসীদের মধ্যে যারা বেকার—এ-আড্ডার অংশীদার তারাই। তারা রাস্তার ওপর বসেই তাস খ্যালে, দাবা খ্যালে, এমন কি মাঝে মাঝে অল্প পয়সায় জুয়াও খ্যালে প্রকাশ্যে। কেউ কেউ দল বেঁধে গাঁজায় দম দেয়। তারপর নেশাতুর চোখ মেলে রেসের বইয়ে অনুসন্ধান করে ভাগ্য-নিয়ন্তা ঘোড়া। কিন্তু প্রত্যহই এদের মনোনীত ঘোড়া ঘটনাচক্রে খোঁড়া হয়ে পড়ে ব'লে ভাগ্য এদের পোড়াই থাকে চিরকাল।

আজকাল অবশ্য সব আড্ডাকে ছাপিয়ে একটা নতুন আড্ডা গজিয়ে উঠেছে রাস্তার ওপর। এটা যেন ঠিক আড্ডা নয়, যেন একসঙ্গে ব'সে অনেক লোকের উৎসুক প্রতীক্ষা। যাকে ঘিরে এ-প্রতীক্ষা—সে একটা পক্ককেশী বুড়ি। বুড়িটা রাস্তার এক প্রান্তে ব'সে আপন মনে হাসে, কাঁদে, বিড়-বিড় ক'রে কী সব বকে। সবাই মনে করে বুড়ির এসব হাসি-কান্না, বিড়বিড় বকুনি কেবল ছলনা। এ-সমস্ত নানান অছিলার আড়ালে সে নিজেকে গোপন রাখতে চায়। আসলে সে একজন পয়মন্ত নারী। খোদ্ খোদার রহম আছে তার চোখে, বুকে আছে ঐশ্বরিক শক্তি।

সে ইচ্ছে করলেই চোখের পলকে একজনের ভাঙা কপাল জোড়া লাগাতে পারে। ধনীকে নির্ধন, আর নির্ধনকে ধনী বানাতে পারে! শুধু তাই নয়, তার পয়মন্ত মুখের এক ফুঁয়ে নাকি

দুরারোগ্য ব্যাধিও সেরে যায় এবং আলাই-বালাই দূর হয় শিশুদের। তাই প্রত্যহই তার চারপাশে জ'মে ওঠে নারী-পুরুষের ভীড়। যারা বেকার— তারা তার কাছেই কামনা করে কর্মসংস্থানের পথ। যারা রেস খেলে—তারা চায় বিজয়ী ঘোড়ার হদিস এবং যারা নির্ধন—তারা ধনী হওয়ার স্বপ্ন দ্যাখে বুড়ির আশীর্বাদে। তাছাড়া যে-সমস্ত নারী বন্ধ্যা—তারা চায় গর্ভকে উর্বর করার বর এবং বন্ধ্যা না হলেও সন্তান যাদের চিররুগ্ন—তারাও বুড়ির পাশে এসে জমে রুগ্ন সন্তানকে কোলে নিয়ে। আশা, যদি ওর কৃপাদৃষ্টির ছোঁয়ায় সন্তান তাদের নীরোগ হয়ে ওঠে।

…কিন্তু দুঃখের বিষয় বুড়ি কারুর কথাই শোনে না। আপন খেয়ালে কেবল হাসে, কাঁদে এবং মাঝে মাঝে কারো মুখের

দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে ওঠে, গালাগাল দেয়। তবু হাল ছাড়ে না ধর্মভীরু ও দৈবে বিশ্বাসী নারী পুরুষের দল। তারা বুড়িটার কাল-বিধ্বস্ত মুখের দিকে তাকিয়েই প্রতীক্ষা ক'রে থাকে প্রহরের পর প্রহর। কেউ কেউ বৃদ্ধার সামনে তুলে ধরে নানান জাতীয় খাবার, কেউ কেউ তার পা'ছুটো টেনে নিয়ে টিপতে থাকে আস্তে আস্তে এবং কেউ বা তার জটপাকানো মাথায় সযত্নে হাত বুলিয়ে প্রার্থনা জানায় অভীষ্ট সিদ্ধির। সবাই ভাবে, একদিন-না-একদিন কঠিন মন তার গলবেই। কারণ ধৈর্যেই যে মেওয়া ফলে—এ-কথা তারা জানে।

সকাল, সন্ধ্যা, এমন কি রাত-ছুপুরেও এ-পথে যদি কেউ আসেন—এ-দৃশ্য আপনার চোখে পড়বে। দৈবে যাদের বিশ্বাস নেই, এমন পরম করুণাময় ঈশ্বরকেও যারা অত্যন্ত করুণার চোখে ছাখে, এমন কিছু লোক এ-অঞ্চলেও আছে। এদেরই কোনো একজনকে ওই বৃদ্ধা এবং বৃদ্ধার চারপাশের ওই ভীড় সম্বন্ধে যদি কিছু জিজ্ঞেস ক'রে বসেন, তাহলে সে তৎক্ষণাৎ বলবে ঃ

—মশায়, ও-বুড়িটা একটা পাগল এবং তার চারপাশে প্রত্যহ যারা ভীড় ক'রে থাকে, তারা তার চাইতেও পাগল। ওটা একটা পাগলের আড্ডা। ও-পথে যাবেন না।

তার এ-কথায় আপনি যদি সন্তুষ্ট না হন, যদি সঠিক রহস্য জানার জন্য তাকে আরও বেশি চাপ দেন এবং তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করেন, তাহলে সে'ই আপনাকে বলবে ওই পাগলি বুড়িটার একটা ইতিহাস এবং সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করবে ছু'একটি ঘটনা ও উপঘটনা। তা থেকেই আপনি বুঝতে পারবেন ঃ পাগলির প্রতি আজ অত লোকের আকৃষ্ট হওয়ার কারণ কি ঃ

এ-পাড়ার এই বস্তির মধ্যেই আজও বেঁচে আছে একটা বুড়ো। বুড়োটার নাম আলিজান। পাগলি বুড়িটা এই আলি-জানেরই বউ। নাম তার ময়নাবিবি। ময়নাবিবি পাগল হয়েছিল যৌবনকালেই। যৌবনকালে আলিজান ছিল অত্যন্ত সন্দেহ-প্রবণ। কেবল সন্দেহবশেই সে নানা প্রকার নির্যাতন চালাতো ময়না-বিবির ওপর। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ময়না বিবির অটল ভক্তি ছিল স্বামীর প্রতি এবং ভক্তি ছিল বলেই সে স্বামীর সব অত্যাচার সহ্য করতো মুখ বুজে। কোনো প্রতিবাদ করতো না। অথচ প্রতিবাদ না করার ফলে অত্যাচারের মাত্রা দিন-দিন কেবল বাড়তোই, কমতো না।

একদিন কাজ থেকে ফিরে এসে আলিজান হঠাৎ দেখতে পায়ঃ ময়নাবিবি পাড়ার একটা অবিবাহিত যুবকের সঙ্গে হাসতে হাসতে কথা বলছে। সন্দেহপ্রবণ আলিজানের পক্ষে এ-দৃশ্য সহ্য করা সম্ভব হয়নি। তাই সে তৎক্ষণাৎ ময়নাবিবির চুলের মুঠি ধ'রে তাকে হিড়-হিড় ক'রে টেনে আনে ঘরের ভেতর। তারপর তার পেটের ওপর সজোরে মারে গোটা-কয়েক লাথি। ময়নাবিবির পেটে ছিল পাঁচ মাসের বাচ্চা। ফলে তার রক্তস্রাব স্থুরু হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে ঢ'লে পড়ে অজ্ঞান হয়ে। তারপর দিন-কয়েক বাদে তার গর্ভ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে পাঁচ মাসের মৃত ভ্রূণ। এ-অবস্থায় ময়নাবিবি কোনোমতে বেঁচে উঠলেও, তার রক্তশূন্য শরীরে এসে আশ্রয় নেয় দুরারোগ্য ব্যাধি। ফলে তাকে দীর্ঘদিনের জন্য গ্রহণ করতে হয় শয্যা।

তারপর দীর্ঘকাল পরে শয্যা ছেড়ে যেদিন উঠে দাঁড়ালো ময়নাবিবি, সেদিন সে আর ময়নাবিবি নয়, সম্পূর্ণ পাগল। স্থুতরাং

স্বামীর ঘরে পাগলি বউয়ের আর স্থান হলো না। তাকে নেমে আসতে হলো পথে। সেই থেকে পথে-পথেই সে ঘুরছে এবং ঘুরতে ঘুরতেই সে আজ এসে দাঁড়িয়েছে শেষ কালের মাথায়। আজ সে পক্ককেশী বুড়ি।

পাগল বা পাগলি দেখলেই পাড়ার উচ্ছৃঙ্খল ছোটো ছেলেরা বেশ মেতে ওঠে এবং পেছনে লাগে। অনেক সময় ছোটোদের সঙ্গে বড়োরাও যে সমান তালে তাল মেলায়—তার প্রমাণ আছে এ-পাড়াতেই। আজ যারা পাগলি বুড়িটার চারপাশ ঘিরে ব'সে
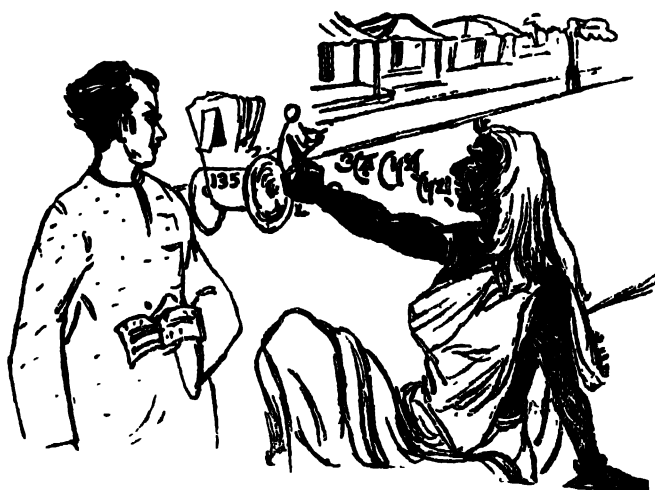
থাকে অভীষ্ট সিদ্ধির আশায়—মাত্র মাস তিনেক আগে তারাই পাগলিটাকে লক্ষ্য ক'রে ঢিল ছুঁড়তো। পাগলিটা তাতে ক্ষেপে উঠলে, কাঁদলে বা গালাগাল দিলে তারা আরও বেশি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতো এবং এভাবেই কী এক উৎকট আনন্দলাভ করতো দিনের পর দিন।

কিন্তু আজ ? আজ তারা বুঝতে পেরেছে বুড়িটা পাগলি নয়, ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন সিদ্ধবাক মানবী। তার সামান্য এক ইশারাতেই অনেক কিছু ঘ'টে যেতে পারে। তাই আজ তারা নিজ নিজ মনস্কামনা নিয়ে বুড়ির চারপাশ ঘিরে ব'সে থাকে, তার পা টেপে, খাবার এনে দেয় এবং কেউ কেউ সেলামি হিসেবে কিছু মুদ্রাও রাখে তার পায়ের কাছে। ···হায়রে ভাগ্যবাদী, হায়রে কলিকালের নির্বোধ বিশ্বাস !

পাগলিটা রাতারাতি পয়মন্ত দেবী বা দরবেশ হয়ে ওঠার কারণটা বড়ো চমৎকার। মাত্র মাস-কয়েক আগে—সেদিন ছিল শনিবার। পাগলিটা সকালের দিকে রাস্তার ওপর শুয়ে ছিল এবং পাগলিটার কাছ থেকে কিছু দূরে একটি ইঁটের ওপর ব'সে একজন বেকার যুবক রেস-বুকের পাতা উল্টিয়ে ঘোড়ার নম্বর দেখছিল। এমন সময় একখানা রিক্সা এসে শুয়ে থাকা পাগলিটার পায়ের ওপর দিয়ে চ'লে যায়। রিক্সায় সোয়ারী ছিল না। তাই পাগলিটার পায়ে তেমন আঘাত লাগেনি। কিন্তু আঘাত না লাগলেও, পাগলিটা তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়ায় এবং হঠাৎ রিক্সাটার প্রতি দূরের যুবকটির দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে চিৎকার ক'রে ব'লে ওঠে ঃ—"ওরে দ্যাখ দ্যাখ !"·········অর্থাৎ চেয়ে দ্যাখ—মুখপোড়ার রিক্সাটা তাকে মাড়িয়ে গেল।

যুবকটার মন ছিল রেস-বুকের পাতায়। কোন্ বাজীর কত নম্বর ঘোড়া সে খেলবে—এ-কথা ভাবতে ভাবতেই সে পাগলিটার আকস্মিক চিৎকারে রিক্সাটার দিকে চোখ ফেরায়। চোখ ফেরাতেই তার নজরে পড়ে রিক্সার পেছনে লেখা রিক্সার নম্বরটা। নম্বরটা ছিল ১৩৫। সে হঠাৎ মনে করে পাগলিটা বুঝি রিক্সার

নম্বরটাকেই দেখিয়ে দিচ্ছে। বুড়িটা পাগলি হলেও, হয়তো খোদার দোয়ায় অনেক কিছুই জানে কিংবা জানতে পেরেছে। তাই তৎক্ষণাৎ সে রিক্সার নম্বরটা টুকে নেয়। নম্বর ১৩৫ হলেও রেস-বুকের নম্বর অনুসারে ও-নম্বরটাকে সে মনে করে ১, ৩ এবং ৫! অতএব উক্ত দিনের ত্রিপ্‌ল্‌-টোটের নির্দিষ্ট বাজিগুলোর প্রথম বাজিতে ১, দ্বিতীয় বাজিতে ৩ এবং তৃতীয় বাজিতে ৫ নম্বর ঘোড়া বেছে নিয়ে সে রেসের মাঠের দিকে রওয়ানা হয়। ঘটনা-চক্রে সেদিন উক্ত নম্বর ঘোড়াগুলোই জেতে এবং একশ' বা দু'শ নয়, একেবারে হাজার-দুয়েক টাকা হাতে আসে যুবকটার। সঙ্গে সঙ্গে খবরটাও ছড়িয়ে পড়ে বাতাসের মুখে। পাড়ার লোকেরা যুবকটার ভাগ্যের কথা ভেবে যেমন ঈর্ষান্বিত হয়, তেমনই অতিমাত্রায় বিস্মিত হয় যুবকটারই মুখে পাগলিটার ক্ষমতার কথা শুনে। তারা দলে দলে ছুটে আসে পাগলির পাশে এবং সেদিনই তারা হঠাৎ আবিষ্কার করে: বুড়িটা পাগল নয়, ও সত্যই কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পন্না দেবী অথবা দরবেশ।

এ-ব্যাপারে কেউ কেউ অবশ্য সেদিনও হাসাহাসি করেছিল এবং হাসাহাসি করে আজও। এদের বিশ্বাস: ঘোড়া জেতার ঘটনার সঙ্গে পাগলিটার কোন সম্বন্ধ নেই। ও-ঘটনাটা কেবল ঘটনাচক্রেই ঘটেছে। এ-কথা আজকাল পাগলির বৃদ্ধ স্বামী আলিজানও বলে। কিন্তু প্রত্যহ দুপুর রাত্রে আজকাল আলি-জানকেও দেখা যায় পাগলিটার পাশে। রাত-দুপুরে যখন একে একে সবাই স'রে যায় পাগলির কাছ থেকে, তখন নিঃশব্দেই এগিয়ে আসে আলিজান। কিছুক্ষণ পাগলির কাছ ঘেঁষে ব'সে

থাকে। তারপর একসময় পাগলির কোল থেকে সারাদিনের সেলামির পয়সা-কড়িগুলো কুড়িয়ে নিয়ে স'রে পড়ে। পাগলি কোনো আপত্তি করে না।

যে-বউটার ওপর নির্মম নির্যাতন চালিয়েছিল আলিজান— সে-বউটারই অটল ভক্তি ছিল স্বামীর ওপর। তাই অমানুষিক অত্যাচার স'য়েও, বউটা নানাভাবে শান্তি দিয়ে এসেছিল স্বামীকে। বউটা আজ বুড়ি এবং পাগলি। কিন্তু পাগলি হলেও, হয়তো স্বামীভক্তি সে ভোলেনি। তাই সারাদিনের সেলামির পয়সা-কড়িগুলো দিয়ে আজও সে শান্তি দিয়ে চলেছে স্বার্থপর আলিজানকে।

———

সব হারিয়ে

লোকটার নাম রাজেন। আজ দু'দিন থেকে সে ঘুমোতে পারছে না। কেবল তাঁতীবাগানের পথে-পথে অস্থির-পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। তার ঘুম না হওয়া বা তার এই অস্বাভাবিক অস্থিরতার যে-ব্যাধি—তা' দৈহিক নয়, মানসিক। আজ মনটা তার অতিমাত্রায় চঞ্চল এবং নির্ঘুম চোখের দৃষ্টিও তাই দিশেহারা। কারণ, মাত্র দু'দিন আগে তার বেশ একটা সর্বনাশ হয়ে গেছে।

অবশ্য এ-সর্বনাশের জন্য সে যে নিজেই অনেকাংশে দায়ী—সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।·· সর্বনাশটা তার যে-ভাবে ঘটেছে—তা' শুনলে মনে হবে গল্প। কিন্তু গল্প নয়, অতি বাস্তব ঘটনা। কলকাতার পথে-ঘাটে একটু রকম-ফের অবস্থায় এমন ঘটনা প্রায়ই ঘ'টে থাকে এবং তা' ঘটেছে এর বেলাতেও।

রাজেন চট্টগ্রামের লোক। দেশ-বিভাগের পর সে তার বউ ও অনেকগুলো কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে কলকাতায় এসেছে এবং এখানেই বসবাস করছে স্থায়ীভাবে। সে ঘড়ি মেরামতের কাজ জানতো পাকিস্থানে থাকতেই। তাই এখানেও সে ছোটো-খাটো একটা কাজ পেয়েছে ঘড়িরই কারখানায়। যা' মাইনে পায়—তাতে সংসার ঠিক চলে না, তবু সে চালিয়ে যায় কোনো মতে। তবে সংসারের মধ্যে হঠাৎ কোনো অসুখ-বিসুখ দেখা দিলে, প্রায় ক্ষেত্রেই চিকিৎসা করার মতো অর্থ তার হাতে থাকে না। ফলে মাঝে-মাঝেই সংসারের অবস্থা খুব দুঃসহ হয়ে দাঁড়ায়, যেমন দাঁড়িয়েছে বর্তমানেও। অর্থাৎ বউ তার অসুস্থ।

হয়তো অন্যান্যবারের মতো এবারের এই চরম অবস্থাকেও সে

কাটিয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু ইতিমধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘ'টে গেল—যার ফলে এই দুঃসহ অবস্থার অবসান আর ঘটবে কিনা—তা' ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অর্থাৎ বুঝতে পারছে না রাজেন। তাই সে আজ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে পায়চারী করছে তাঁতীবাগানের অলিতে-গলিতে।

আজ থেকে মাস-দুয়েক আগে হঠাৎ যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তার বউ, তখন সে ভেবেছিল এ-অসুখ আপনা থেকেই সেরে যাবে। তাই সে বউয়ের চিকিৎসাদির কোনো ব্যবস্থাই করেনি।

কারণ চিকিৎসা করানোর মতো ক্ষমতা তার ছিল না। কিন্তু দিনে-দিনে প্রায় মাস-দুয়েক কেটে যায়। তবু বউয়ের অসুখ আর সারে না। বরং দিনের পর দিন এমন মারাত্মকভাবে তা' বৃদ্ধি পায় যে, রাজেনের প্রতিবেশীরা পর্যন্ত ঘাবড়ে যায়। বউয়ের চিকিৎসা না করানোর জন্য প্রতিবেশীদের অনেকেই রাজেনকে একটা নির্বোধ পাষণ্ড বলেও অভিহিত করে।

সুতরাং এবার নিরুপায় হয়েই ডাক্তার ডাকে রাজেন। ডাক্তার রোগিণীকে পরীক্ষা ক'রে যা' রায় দেন, তাতে রাজেনেরও অন্তরাত্মা এবার কেঁপে ওঠে। ডাক্তার বলেন ঃ রোগিণীর অসুখ দুরারোগ্য। দীর্ঘদিন চিকিৎসা না করানোর ফলেই এমন ঘটেছে। অতি সত্বর উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে রোগিণী নাকি আর বাঁচবে না।

ডাক্তারের কথা শুনে রাজেনের দু চোখে নেমে আসে দুঃস্বপ্ন। বউয়ের চিকিৎসা করানোর জন্য এবার সে তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু ডাক্তার যে-সমস্ত ওষুধের নাম লিখে দিয়ে যান—তার দাম অনেক। রাজেনের তিন মাসের মাইনে একত্র করলেও ওষুধের দাম কুলোবে না। অথচ এ সমস্ত ওষুধ না কিনলে বউকে বাঁচিয়ে তোলা শক্ত। তাই বাধ্য হয়েই সে কোনো এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে গোটাপঞ্চাশেক টাকা ধার করে। তাছাড়া সে ঘড়ির কারিগর বলেই তার বাড়ীতে গোটাকয় পুরোনো ঘড়ি ছিল। এগুলো বিক্রি করলে নাই-নাই করেও অন্ততঃ শ'-দুয়েক টাকা হাতে আসতে পারে। তাই অনেক ভেবে, প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার করা পঞ্চাশ টাকা এবং সেই পুরোনো ঘড়িগুলো পকেটে নিয়ে সে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। উদ্দেশ্য ঃ ঘড়িগুলো বিক্রি করার পর ধার করা পঞ্চাশ টাকার সঙ্গে মিলিয়ে যা হবে—তা দিয়েই

বড়োবাজারের কোনো এক দোকান থেকে প্রথমতঃ সে ওষুধ কিনবে এবং ওষুধ কেনার পর যে-টাকা বাঁচবে—তা সে নিয়ে আসবে রোগিণীরই পথ্য কেনার জন্য।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাঁতীবাগানের সরু একটা গলি দিয়ে বেশ একটু চিন্তিত মনেই হেঁটে যাচ্ছিল রাজেন। হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকটা যখন এগিয়ে এসেছে সে—ঠিক তখনই কোথা থেকে একটা হাফ-প্যাণ্ট পরা পাহাড়ী লোক ছুটে এসে তার সামনে থেকে দুটো সোনার মতো চকচকে কী-যেন জিনিষ কুড়িয়ে নেয়। তারপর এদিক-ওদিক ভীরু চোখে বার-দুয়েক তাকিয়ে হঠাৎ একদিকে ছুটে পালিয়ে যায়। তার সেই জিনিষ কুড়িয়ে নেবার এবং তারপর পালিয়ে যাওয়ার ভঙ্গীটা এমনই যে, সেদিকে তাকিয়ে বেশ একটু অবাক হয় রাজেন। অবাক হয়েই সে মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে পড়ে রাস্তার ওপরই। এমন সময় তার পাশে এসে দাঁড়ায় অন্য একটা লুঙ্গি পরা লোক। লোকটা এসেই রাজেনকে জিজ্ঞেস করে:

—"ওই হাফ-প্যাণ্ট পরা পাহাড়ী লোকটা আপনার সামনে থেকে কী-জিনিষ কুড়িয়ে নিয়ে গেল?"

রাজেন লোকটার দিকে ফিরে উত্তর দেয়:

—"ঠিক জানি না তো!"

লোকটা আবার বলে:

—"নিশ্চয়ই কারো কোনো দামী জিনিষ প'ড়ে গিয়েছিল। ওই পাহাড়ী লোকটা তা দেখতে পেয়েই কুড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে গেল।"

লুঙ্গি পরা লোকটার এ-কথার পরেই ঠিক অপর দিক থেকে মূল্যবান স্যুট পরিহিত একজন ভদ্রলোক ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে ওদের

দিকেই ছুটে আসেন। কাছে এসে তিনি রাজেনকেই জিজ্ঞেস করেন ঃ

—"আমার পকেট থেকে ছুটো সোনার বাঁট অসাবধানবশতঃ প'ড়ে গেছে। ওগুলোর দাম প্রায় হাজার তিনেক টাকা। আপনারা কেউ দেখেছেন কি ?"

ভদ্রলোকের কথা শুনেই রাজেনের হঠাৎ মনে হয় ঃ তার সামনে থেকে হাফপ্যাণ্ট পরা পাহাড়ী লোকটা যা কুড়িয়ে নিয়ে পালায়—তা'ই সোনার বাঁট। সুতরাং সে উত্তর দেয় ঃ

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইমাত্র একটা পাহাড়ী লোক আমার সামনে থেকে ছুটো সোনার বাঁট কুড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে গেল।"

রাজেনের কথা শুনেই ভদ্রলোক এবার কেঁদে ফেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতেই আবার জিজ্ঞেস করেন ঃ

—"লোকটা কোন্ দিকে গেল ?"

যে-রাস্তা ধ'রে পাহাড়ী লোকটা পালিয়েছে, ঠিক সেই রাস্তার দিকে ভদ্রলোককে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে দেখিয়ে দেয় রাজেন। ভদ্রলোক সেদিকে তাকিয়ে আরেকবার কাঁদো-কাঁদো স্বরে ব'লে ওঠেন ঃ

—"মশায়, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। হাজার তিনেক টাকার ছু-ছুটো সোনার বাঁট যদি সত্যই আর না পাই, তাহলে আমি প্রাণে বাঁচবো না।"

এ-কথা বলেই তিনি রাজেনের নির্দেশিত পথে ছুটে যান এবং খানিকবাদেই অদৃশ্য হন।

ভদ্রলোক অদৃশ্য হতেই সেই লুঙ্গি পরা লোকটা এবার রাজেনকে বলে ঃ

—"সেই পাহাড়ী লোকটাকে দেখলে আপনি চিনতে পারবেন ?"

—"নিশ্চয়ই পারবো।"

—"তাহলে চলুন, তাকে খুঁজে বার করি। তিন হাজার টাকার সোনার বাঁটগুলো নিয়ে সে পালিয়ে যাবে—এ কিছুতেই হতে পারে না।"

কী-ভেবে লোকটার কথায় রাজী হয়ে যায় রাজেন। তারপর দু'জনে মিলে সত্যই অনুসন্ধান স্থুরু করে পাহাড়ী লোকটার।

খানিকক্ষণ এ-গলি ও-গলি ধ'রে পায়চারী করার পর সত্যই এক সময় খুঁজে পাওয়া যায় পাহাড়ী লোকটাকে। দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়েই হঠাৎ চিৎকার ক'রে ওঠে রাজেন ঃ

—"ওই যে, ওই লোকটা। ওই লোকটাই সোনার বাঁট দুটো নিয়েছে।"

রাজেনের কথা শুনেই লুঙ্গি পরা লোকটা এবার সবেগে ছুটে গিয়ে পাহাড়ী লোকটার হাত ধরে। সঙ্গে সঙ্গে রাজেনও ছুটে গিয়ে পাহাড়ী লোকটাকে উদ্দেশ ক'রে ব'লে ওঠে ঃ

—"এ্যায় ব্যাটা, তুই ভদ্রলোকের দুটো সোনার বাঁট রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছিস। তোকে আমরা পুলিশে দেবো।"

রাজেনের কথা শুনে পাহাড়ী লোকটা ভীষণ ঘাবড়ে যায়। তারপর কাঁপতে,কাঁপতে বলে ঃ

—"দোহাই বাবু, আমাকে পুলিশে দেবেন না। আমি তো চুরি করিনি, রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি।"

রাজেন আবার বলে ঃ

—"কুড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে আসা চুরি করারই সামিল। তোকে, তোকে আমরা পুলিশেই দেবো।"

পাহাড়ী লোকটা এবার সাংঘাতিক রকমের ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলে। কাঁদতে কাঁদতেই সে বলে :

—"বাবু, আমি গরীব মানুষ, দয়া ক'রে আমাকে পুলিশে দেবেন না। আপনারা যদি চানতো সোনার বাঁটগুলো আপনারাই নিয়ে নিন। তবে আমাকেও কিছু দিন। অন্ততঃ কিছু টাকা।"

পাহাড়ী লোকটার এ-কথার পরে রাজেন বেশ ধমকের সুরে কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই লুঙ্গি পরা লোকটা রাজেনের একটা হাত ধ'রে মৃদু একটা চাপ দেয়। তারপর পাহাড়ী লোকটাকে উদ্দেশ ক'রে বলে :

—"এ্যায় ব্যাটা, তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাক।"

এ-কথা বলেই লুঙ্গি পরা লোকটা রাজেনকে টেনে নিয়ে আসে খানিকটা দূরে। তারপর কানে কানে বলে :

—"এই সোনার বাঁটগুলো যে-ভদ্রলোকের—তিনি অত্যন্ত ধনী। তিন হাজার টাকার মাল হারালে তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমরা গরীব, তিন হাজার টাকা আমাদের অনেক কাজে লাগবে। ওই পাহাড়ী লোকটা ভয় পেয়ে সোনার বাঁটগুলো যখন আমাদেরই দিয়ে দিতে চাচ্ছে—তখন বরং ওকে কিছু টাকা দিয়ে ওগুলো আমরা নিয়ে নিই।"

টাকার অভাবে বউয়ের চিকিৎসা হচ্ছে না রাজেনের। চারদিকে কেবল অভাব আর অভাব। অভাবই গ্রাস করতে চলেছে তাকে। সুতরাং ঠিক এই সময়ে ওই সোনার বাঁটগুলোর লোভ সম্বরণ করা সত্যিই সম্ভব হলো না তার পক্ষে। লুঙ্গি পরা

লোকটার কথায় খুব সহজেই সে রাজী হলো এবং পাহাড়ী লোকটাসহ তারা তিনজনেই স'রে এলো একটা অন্ধকার গলির কাছে। সেখানেই তিনজনে মিলে খানিক্ষণ আলোচনার পর রাজেন তার পকেট থেকে সেই পুরোনো ঘড়িগুলো ও সেই সঙ্গে ধার করা পঞ্চাশটা টাকা বের ক'রে পাহাড়ী লোকটার হাতে দেয় এবং তার বদলে হস্তগত করে বাঁট দুটো।

টাকা এবং ঘড়িগুলো পেয়েই স'রে পড়ে পাহাড়ী লোকটা।

পাহাড়ী লোকটা স'রে পড়তেই লুঙ্গি পরা লোকটা এবার রাজেনকে উদ্দেশ ক'রে বলে ঃ

—"টাকা এবং ঘড়িগুলো তো আপনিই ওকে দিলেন। আমি কিছুই দিতে পারলাম না। আমার কাছে আজ টাকা নেই। বাঁট দুটো আজ আপনিই নিয়ে যান। তবে দয়া ক'রে আপনার ঠিকানাটা দিন। আমি আগামীকাল আপনার বাড়ীতে কিছু

টাকা পৌঁছে দিয়ে একটা বাঁট নিয়ে আসবো। আশা করি আপনি ভদ্রলোক, নিশ্চয়ই বেইমানী করবেন না।"

রাজেন আর বাক্যব্যয় না ক'রে, খুশি হয়েই তাকে তার ঠিকানা লিখে দেয়। ঠিকানাটা হাতে নিয়ে লুঙ্গি পরা লোকটা রাজেনকে একটা সেলাম ঠুকে স'রে পড়ে।

লুঙ্গি পরা লোকটা স'রে পড়ার পর রাজেনও এবার বড়ো রাস্তায় এসে ট্রাম ধরে বড়োবাজারের উদ্দেশে। দুটো বাঁটের অন্ততঃ একটা আজই তাকে বিক্রি ক'রে ওষুধ কিনতে হবে রুগ্ন বউয়ের জন্য।

বড়োবাজারে নেমেই সে সরাসরি ছুটে যায় কোনো একটা সোনার দোকানে। তারপর বিক্রি করার উদ্দেশ্যে একটা বাঁট সে দোকানদারের হাতে দেয়। দোকানদার বাঁটটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেশ খানিকক্ষণ ধ'রে পরীক্ষা করেন। তারপর হঠাৎ এক সময় হেসে উঠে বলেন:

—"এতো সোনা নয়, স্রেফ পেতল। পেতলের ওপর সোনার জলের কাজ করা।"

কথা শুনেই চমকে ওঠে রাজেন। তারপর সে দ্বিতীয় বাঁটটাও বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু ওটার বেলাতেও ওই একই কথা ভেসে আসে দোকানদারের কাছ থেকে।

দোকানদারের সব কথা শুনে দোকানের মধ্যেই প্রচণ্ড শব্দে আর্তনাদ ক'রে ওঠে রাজেন। তারপর সে নেমে আসে রাস্তায়। রাস্তায় নামার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত আকাশটা ভেঙে পড়ে তার মাথায় এবং ভেঙে পড়া আকাশটাই যেন তাকে জানিয়ে দেয়:

হাফ-প্যান্ট পরা লোক, লুঙ্গি পরা লোক ও মূল্যবান স্যুট পরা ভদ্রলোকের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। তারা সবাই মিলে তাকে ঠকিয়েছে।

এ-ঘটনার পর দুদিন কেটে গেছে। রুগ্ন বউয়ের জন্য ওষুধ কেনা আজও হয়নি। সম্ভবতঃ হাঁড়িও চড়েনি বাড়ির উনোনে। সব হারিয়ে বিভ্রান্ত রাজেন, দুর্বৃত্তদের ব্যর্থ সন্ধানে তাঁতীবাগানের অলিতে-গলিতে আজ দুদিন ধ'রে কেবল নিস্তেজ পায়ে হাঁটছে আর হাঁটছে। কে জানে—এ-হাঁটার শেষ হবে তার কবে!

কলের ধারে

রাস্তার ধারে একটাই পানীয় জলের কল। এ-কলটাই সুদূর টালা ট্যাঙ্কের একমাত্র প্রতিনিধি এদিকে এবং এরই ওপর নির্ভর ক'রে থাকে পাশের বৃহৎ বস্তিটা। তাই সাত-সকাল থেকে দীর্ঘ লাইন পড়ে কলের পাশে। যারা লাইন দেয়— তারা সবাই বস্তিবাসী স্ত্রীলোক। পুরুষেরা জলের জন্য বড়ো একটা আসে না। তারা সকাল হলেই বেরিয়ে যায় যে-যার কাজে এবং ফিরে আসে রাত্রে। ঘর-কন্নার দায়িত্ব মেয়েদেরই। সুতরাং জলের জন্যেও কলের ধারে এসে লাইন দিতে হয় তাদেরই। তারাই কেউ ঘড়া, কেউ কলসী এবং কেউ কেউ নানা-আকারের বালতী হাতে নিয়ে লাইনে এসে দাঁড়ায় এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অতিকষ্টে সংগ্রহ করে সামান্য জল—যে-জলে তৃষ্ণা মেটে না সারাদিনের।

কলের সরু নলে জলের স্রোত নামে সকাল থেকেই। কিন্তু এ-স্রোত অব্যাহত নয়। ঘণ্টা-দেড়েক পর থেকেই জলের গতি ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে থাকে এবং কোনো এক বিশেষ সময়ে সেই ক্ষীণ গতিও থেমে যায় সম্পূর্ণ।……

জলের স্রোত থেমে গেলে, বস্তির মেয়ে-বউরা লাইন থেকে স'রে যায়। কিন্তু কলের ধারেই পর পর সাজিয়ে রেখে যায় তাদের ঘড়া, কলসী এবং অজস্র বালতি। দুপুরের পর কলে আবার জলের স্রোত নামার সময় হলেই নিজ নিজ ঘড়া, কলসী ও বালতির পাশে অবার তারা ফিরে আসে। জলের গতি দিনে দিনে এভাবেই নিয়ন্ত্রিত করে এদের জীবনের গতিকে।

সেদিন বেলা তিনটের কিছু পূর্বেই ভীড় জ'মে ওঠে কলের ধারে। কলে জল তখনও আসেনি। সকালে যে-জল এসেছিল—তা প্রতিদিনের মতো সাড়েদশটার মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। আবার জল আসবে বিকেল সাড়েতিনটের সময়। তাই কলের ধারে লাইন পড়েছে তিনটের আগেই। অবশ্য ঘড়া, কলসী ও বালতি সকাল সাড়েদশটা থেকেই পর পর সাজানো ছিল কলের ধারে। এখন কেবল এগুলোরই পাশে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে

বস্তির মেয়ে-বউরা। জল আসবে আরও আধ ঘণ্টা পরে। তাই লাইনে দাঁড়িয়েই গল্প জুড়ে দিয়েছে কেউ কেউ এবং কেউ কেউ উৎসুক চোখে কেবল তাকিয়ে আছে কলের সরু নলটার দিকে।

ঠিক এমনই সময় বস্তির দিক থেকে কলের কাছে ছুটে আসে আরও একটি অল্প বয়স্কা বউ। সে এসেই লাইনের পুরোভাগের একজন বয়স্কা বউকে লক্ষ্য ক'রে বলে :

—"আমার বালতিটা সরিয়ে দিয়ে তুই যে বড়ো আগে

এসে দাঁড়িয়েছিস। সেই কোন্ সকালে আমার বালতিটা আমি কলের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। আমি আসতে-না-আসতেই তুই তা' সরিয়ে দিয়ে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালি ? বলি তোর গায়ের জোর কি বেশি হয়েছে ?''

পূরোভাগের বয়স্কা বউটির কোলে ছিল একটি দু'বছরের শিশু। অল্প বয়স্কা বউটির এ-ধরণের কথা শুনেই সে তার শিশুটিকে কোল থেকে নামিয়ে রাখে মাটিতে। তারপর শাড়ির এলোমেলো আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিয়েই বেশ চড়া গলায় সে উত্তর দেয়ঃ

"—খুব যে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শিখেছিস! বলি তোর অত কথার ধার ধারে কে শুনি ? তোর বালতি কোথায় ছিল-না-ছিল তা আমি কি ক'রে জানবো রে মুখপুড়ি। আমি আমার বালতির পাশেই এসে দাঁড়িয়েছি।"

বয়স্কা বউটির এ-কথা বলার পর অল্প বয়স্কা বউটি এবার আরও ক্ষেপে যায়! সম্ভবতঃ বয়স তার অল্প বলেই তেজ তার অনেক বেশি। দাঁতে দাঁত চেপে সে আরও কাছে এগিয়ে আসে বয়স্কা বউটির। তারপর বলেঃ

—"সাবধান। বেশি কথা বললে কিন্তু ঘাড় মটকে দেবো! আমাকে তুই ভেবেছিস কি ? ভালো চাসতো তোর বালতিটা নিয়ে সামনে থেকে স'রে যা।"

সঙ্গে সঙ্গে বয়স্কা বউটিও খন্‌খনে গলায় ব'লে ওঠেঃ

—"ইস, স'রে যাবে! কলটা তোর মরদের কেনা নাকি ?''

অপর পক্ষ থেকেও উত্তর আসেঃ

—"তবে কি তোরই মরদের কেনা ? তাই এত দেমাক দেখাচ্ছিস! আমি কারো দেমাকের ধার ধারি না। সোজা কথায়

স'রে যাবি তো যা, নইলে কিন্তু অবস্থা গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে।"

বয়স্কা বউটি এবার তার বালতিটাকে কলের আরও কাছে এগিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তারপর বলে :

—"বলি অবস্থাটা এমন কি গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে শুনি? আমি তো দাঁড়িয়েই আছি, কী করতে চাস কর না! তারপর আমিও তোকে তোর বাপের নাম ভুলিয়ে দিতে পারি কি না—দেখবি।"

দেখতে দেখতে ঝগড়াটা বেশ দানা বেঁধে ওঠে। উভয়ের ঝগড়ার ভাষা ক্রমেই নেমে আসে চরম অশ্লীলতার পর্যায়ে। লাইনের অন্যান্য মেয়ে-বউরা কেউ ঝগড়াটা থামিয়ে দেবার চেষ্টা করে না। বরং ঝগড়ার কুৎসিৎ ভাষার দিকে কান রেখে সময় কাটানোর একটা মস্ত সুযোগ পায় সবাই। এমন কি, ঝগড়াটা যাতে সহজে থেমে না যায়—তার জন্য কেউ কেউ লাইন থেকেই টিপ্পনি কেটে ইন্ধন জোগাতে থাকে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, ঝগড়াটা হঠাৎ এক সময় থেমে যায়। কেবল ঝগড়াটাই থামে না, লাইনের প্রত্যেকটি মেয়ে-বউ হঠাৎ এক সঙ্গেই চমকে ওঠে রাস্তার একটা আকস্মিক ঘটনা লক্ষ্য ক'রে :

বয়স্কা বউটি ঝগড়ায় মত্ত ছিল। তাই তার কোলের যে-শিশুটিকে সে নামিয়ে রেখেছিল মাটিতে—তার দিকে এতক্ষণ সে খেয়াল রাখতে পারেনি। শিশুটি সুযোগ পেয়েই টুকটুক করে হেঁটে নেমে আসে রাস্তায়। সম্ভবতঃ একা একা রাস্তার মধ্যেই সে খেলা করছিল। হঠাৎ দক্ষিণ দিক থেকে ছুটে আসে একখানা সোয়ারী বোঝাই রিক্সা। রিক্সাওয়ালা শিশুটিকে ঠিক লক্ষ্য করেনি এবং সম্ভবতঃ শিশুটিও রিক্সাটার দিকে তাকায়নি

বলেই রিক্সার ডানদিকের চাকাটা এসে সজোরে ধাক্কা দিয়েই শিশুটির গায়ে। ধাক্কা খেয়েই শিশুটি চিৎ হয়ে ছিটকে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গেই আর্তনাদ ক'রে ওঠে তারস্বরে। সুতরাং এদিকে তাকিয়েই বউ দুটির ঝগড়া হঠাৎ থেমে যায় এবং লাইনের অন্যান্য মেয়ে-বউরাও চমকে ওঠে।

চাকার ধাক্কা খেয়ে শিশুটি ছিটকে পড়ার পরেও, রিক্সা কিন্তু থামে না। রিক্সাওয়ালা ভয়েই হোক, অথবা যে কোনো কারণেই হোক, আরো জোরে পা চালিয়ে স'রে পড়ে রিক্সা নিয়ে। অথচ শিশুটি রাস্তার ওপর ওভাবেই ছটফট করতে থাকে কাতর-ভাবে। লাইনের মেয়ে-বউরা নিজের জায়গা হারাবার ভয়ে আহত শিশুটির কাছে কেউ ছুটে আসে না। এমন কি, শিশুটির মা, অর্থাৎ সেই বয়স্কা বউটিও হয়তো ভাবে যে, সে শিশুটির কাছে ছুটে এলেই তার জায়গা অধিকার ক'রে নেবে অল্পবয়স্কা বউটি। তাই সে'ও শিশুটির কাছে না এসে কেবল সেখান থেকে শিশুটির জন্য বিলাপ করতে থাকে কাতর স্বরে।

সব অবস্থা লক্ষ্য ক'রে শেষ পর্যন্ত অল্পবয়স্কা বউটিই কী ভেবে ছুটে আসে শিশুটির কাছে। শিশুটিকে সে বুকে তুলে নিয়েই সস্নেহে হাত বুলোতে থাকে তার পিঠে। অবোধ শিশু আদর পেয়েই শান্ত হয় এবং দুটি কচি কচি হাত দিয়ে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে অল্পবয়স্কা বউটির গলা।

এ-দৃশ্য দেখে শিশুটির মা অর্থাৎ সেই বয়স্কা বউটিও এবার ছুটে আসে এবং এসেই সে অল্পবয়স্কা বউটিকে লক্ষ্য ক'রে অত্যন্ত চড়া গলায় ব'লে ওঠে ঃ

—"ঢের হয়েছে, আমার বাচ্চাকে অত আর আদর করতে

স'রে না। তুই একটা ডাইনী। তোর নিঃশ্বাস লাগলেই বাচ্চাটার আমার অমঙ্গল হবে।"

এ-কথা বলেই সে শিশুটিকে কেড়ে নেবার জন্য হাত বাড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে অল্পবয়স্কা বউটিও বাচ্চাটাকে নিজের বুক থেকে ছাড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে দেবার চেষ্টা করে এবং বলে :

—"তোর বাচ্চাকে আদর করার দায় পড়েছে আমার? নিয়ে যা তোর বাচ্চাকে।"

কিন্তু অবাক কাণ্ড! দুরন্ত শিশুটি অল্পবয়স্কা বউটির গলা এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে যে, সহজে তাকে বুক থেকে বিচ্ছিন্ন

করা গেল না। শিশুটির মা অর্থাৎ বয়স্কা বউটি শিশুটির বাহু ধ'রে বার-কয়েক টানাটানি করার পর ব্যর্থ হয়। তারপর খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে সে শিশুটির দিকে তাকিয়ে থাকে। এই সুযোগে শিশুটি একবার অল্পবয়স্কা বউটির

গলা ছেড়ে ঘাড় বেঁকিয়ে মায়ের দিকে তাকায় এবং তাকিয়েই হেসে ওঠে খিল্‌খিল্‌ ক'রে। তার হাসি লক্ষ্য ক'রে হঠাৎ মুচকি হেসে ওঠে অল্পবয়স্কা বউটিও।

কিন্তু শিশুটির মা অর্থাৎ বয়স্কা বউটি এ-অবস্থায় আরও ক্ষেপে যায় এবং যে ক'রেই হোক, শিশুটিকে ছিনিয়ে নেবার জন্য সে তেড়ে আসে অল্পবয়স্কা বউটির কাছে। কিন্তু শিশুটি কী ভেবে আরেকবার হেসে ওঠে এবং পরক্ষণেই আবার নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে অল্পবয়স্কা বউটির গলা। এ-অবস্থা লক্ষ্য ক'রে বয়স্কা বউটিও এবার প্রচণ্ড রেগে কী একটা বলতে গিয়েই হঠাৎ হেসে ফেলে এবং তার দিকে তাকিয়েই একসঙ্গে হো-হো ক'রে হেসে ওঠে লাইনের অন্য সমস্ত মেয়ে-বউ ও সেই সঙ্গে অল্পবয়স্কা বউটি।

হঠাৎ হাসির হিল্লোলেই দুলতে দুলতে রঙীন হ'য়ে ওঠে চৈত্রের রোদ, পরিবেশটা পাল্টে যায় এবং পরক্ষণেই হাসতে হাসতে জলের স্রোত নামে কলে। বিকেলটা হঠাৎ মধুর হয়ে ওঠে।

সেই লোকটা

রাস্তার শিব-মন্দিরের আশে-পাশেই বিচরণ করে শিবের বাহনটা। আর প্রত্যহ বিকেল হলেই সেই প্রৌঢ় লোকটা আসে। সে এসেই প্রথমতঃ বাহনটাকে কিছু খেতে দেয়। কারণ ও-জন্তুটা যথার্থই বাহন। নইলে দিন-রাত কেবল মন্দিরের পাশেই ওটা পড়ে থাকবে কেন? লোকটা জানে: শিবের মহিমা কিঞ্চিৎ বাহনের মধ্যেও বর্তমান। অতএব ওটারও সেবা করা দরকার। ওটাকে খেতে দিয়েই লোকটা এসে মন্দিরের রকে বসে। তারপর আপন মনেই খানিকটা অভিমানের সুরে শিবকে উদ্দেশ ক'রে বলে:

—"হায় ভোলানাথ! আমি কী ছিলাম, আর আজ কী হয়েছি! আমার দিকে তাকিয়ে কিছুই কি তুমি দেখতে পাচ্ছো না? চোখে কি তোমার ছানি পড়েছে?"

আরও অনেক কথাই সে বলে। কিন্তু তার সব কথা শোনার অবকাশ থাকে না লোকের। কারণ তার ধূলি-ধূসর বেশ, চোখ-মুখের নিষ্প্রভ দীনতা এবং তার প্রাত্যহিক ব্যবহার লক্ষ্য ক'রে লোকে তাকে মনে করে পাগল। অতএব প্রত্যহ মন্দিরের পাশে দাঁড়িয়ে এমন একটা পাগলের প্রলাপ শোনার ধৈর্য বা উৎসাহ কারো না থাকাই স্বাভাবিক। অবশ্য কেউ কেউ বলেন: লোকটা পাগল নয়। জীবন-যুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে হেরে গিয়েই আজ সে হতাশ হয়ে পড়েছে এবং একই কারণে আজ তার চিন্তা-ভাবনাও হয়ে পড়েছে এলোমেলো। শিবের ভক্ত সে চিরকালই ছিল। তাই আজও তার হতাশ মন নিয়ে শিব-মন্দিরের রকে এসেই সে মাথা

খোঁড়ে, হা-হুতাশ করে এবং শিবকে উদ্দেশ করেই সে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে কাতর ভাবে: কেন এমন হলো!

কেন এমন হলো? কারণ অবশ্যই আছে। লোকে বলে:

চিরকাল সে এমন ছিল না। কলকাতার বুকেই তার বাড়ী ছিল এবং পূর্বপুরুষের জমা কিছু টাকাও ছিল ব্যাঙ্কে। আর ছিল মনোহারী একটা দোকান--যার পসার ছিল ভালোই। তার

পরিবার বলতে কেউ ছিল না। সারা সংসারে সে ছিল একা। টাকা, বাড়ী, আর দোকান নিয়েই তাকে ব্যস্ত থাকতে হতো সারাক্ষণ। তাই হয়তো প্রথম যৌবনে কারো সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার অবকাশ সে পায়নি। কিংবা হয়তো অভাববোধ করেনি ব'লে,ও-কথা সে ভাবেইনি। কিন্তু যৌবনের শেষ ধাপে পা দিয়েই একদিন হঠাৎ সে অনুভব করে জীবনের একটা অস্থির নিঃসঙ্গতা। তাই সেদিন কেবল মনের তাগিদেই সে ঘরে আনে এক অল্প বয়সের রূপসীকে। বাড়ী-ঘর সে নতুন ক'রে সাজায়। তারপর সংসারের সমস্ত কর্তৃত্ব সে অর্পণ করে তারই ওপর—যে তার বউ, বয়স যার কাঁচা এবং মনের অধিকাংশ জানালা যার বন্ধই রয়েছে তখনো।

এতদিন লোকটি ছিল একা। তাই সে ধর্মভীরু হয়েও পূজা-অর্চনার দিকে তেমন মন দিতে পারেনি। কিন্তু বিয়ের পর বাড়ীর ভেতরের পুরোনো আমলের শিব-মন্দিরটি সে সংস্কার করে। তারপর নতুন ক'রে পূজোর আয়োজনাদি ক'রে তারও ভার সে অর্পণ করে বউটির ওপর—যাতে বউটির মন ধর্মের প্রভাবে খাঁটি থাকে চিরকাল।··· অবশ্য শাড়ী-গয়না-ঐশ্বর্যের অতি উচ্ছল জৌলুস এবং সেই সঙ্গে পূজা-অর্চনার নতুন মাদকতায় বউটির কাঁচা মন বেশ সুখীই হয়েছিল বলা যায়। অন্ততঃ বছর-কয়েক বউটি কোনো অভাব বোধ করেনি এবং লোকটাও ছিল সব দিক দিয়েই সুখী। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে, দিনে দিনে বউটির কাঁচা মন যখন পাকা হয়ে ওঠে, বিচিত্র চাহিদা বাড়ে প্রবৃত্তির এবং ভরা-শ্রাবণের নদীর মতোই তার দেহের তট ছুঁয়ে উপচে ওঠে পূর্ণ যৌবন, অথচ অন্যদিকে লোকটার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে বয়সের

স্পষ্ট ছাপ, ঠিক তখনই ওদের সংসারে আবির্ভাব ঘটে কোনো এক তরুণ ডাক্তারের। ডাক্তার অবশ্য বউটির কোনো এক অসুখের চিকিৎসা-সূত্রেই এসেছিল। কিন্তু এসেই সে লোভাতুর হয়ে ওঠে বউটির বাঁধ না-মানা যৌবনের দুরন্ত ঢেউ লক্ষ্য ক'রে। তাই সে দেহের সঙ্গে মনের চিকিৎসাও শুরু করে এবং চিকিৎসার ফল পায় অচিরেই। বউটির চোখের সামনে খুলে যায় কামনার এক নতুন দিগন্ত। ভুলে যায় পূজা-অর্চনা, সংসার ধর্ম এবং স্বামী-সেবার নৈতিক রীতি। রক্তের শিরায় শিরায় তার নেচে ওঠে নতুন আস্বাদের উন্মাদনা। যতই দিন যায়, ততই যেন তার কাছে অসহ্য ঠেকে প্রৌঢ় স্বামীর ক্লান্ত সঙ্গ। সুতরাং স্বল্প আয়াসেই জয়ী হয় ডাক্তার। বউটি তার যৌবনের সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে ধরা দেয় তার নেশাতুর বাহুতে। যুগটা হঠাৎ যেন পাল্টে যায়, হাওয়ায় হাহাকার ক'রে ওঠে নিরপরাধ ক্লান্ত সময়।

তারপর ? তার পরের ঘটনা সংক্ষেপ। স্বামীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে বউটি। ডাক্তার তাকে নিয়ে নাকি নতুন ঘর বাঁধে শহর থেকে দূরে। বউয়ের এই আকস্মিক বিশ্বাসঘাতকতায় লোকটা আঘাত পেয়েছিল প্রচণ্ড। সে দিশেহারা হয়ে প্রথমতঃ আছড়ে পড়েছিল শিব-মন্দিরের দরজায়। তারপর কাতর-বিলাপের সুরে একবার বলেছিল :

—"হে ঠাকুর, এ-কী করলে আমার। তুমি কী পাপে এ-শাস্তি আমাকে দিলে ?" কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঠাকুরের কাছ থেকে সেদিন কোনো উত্তর পায়নি লোকটা।

লোকটার ঘর ভাঙে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনেও আসে বৈরাগ্য।

মনোহারী দোকানটা সে বিক্রি ক'রে দেয়। তারপর বাড়ীর দরজায় তালা ঝুলিয়ে সে নেমে আসে পথে। পায়ে-পায়ে সে পরিক্রমা করে সারা ভারতের সমস্ত তীর্থস্থান। কিন্তু মনের

শান্তি কোথাও পায় না। যেখানেই যায়, সেখানেই যেন এক অস্থির শূন্যতায় প্রতিধ্বনিত হয় তার নিঃসঙ্গ মনের হায়-হায় বিলাপ। তাই কিছুদিন পর আবার সে বাধ্য হয়েই ফিরে আসে

কলকাতায়। তারপর ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে মনকে ডুবিয়ে দেয় মদে এবং জীবনের অঢেল সময়কে সে ন্যস্ত করে শেয়ার-মার্কেট ও রেসের মাঠে।

দিনে দিনে মাস যায়, মাসে মাসে বছর এবং বছরে বছরে কেটে যায় দীর্ঘ সময়। রেসের মাঠ এবং শেয়ার-মার্কেটই নিঃশেষে টেনে নেয় তার ব্যাঙ্কের পুঁজি। তারপর দিনে দিনে দেনা বাড়ে এবং দেনার দায়ে শেষে একদিন বাড়ীটাও হয় হাতছাড়া। নিঃস্ব, ভগ্ন-স্বাস্থ্য এবং আঘাতে আঘাতে শতধাবিচ্ছিন্ন হৃদয় নিয়ে সে চিরকালের মতোই নেমে আসে পথে। দিন তার পথে-পথেই কাটছে। বাড়ীর সঙ্গে বাড়ীর শিব-মন্দিরটিও তার হাতছাড়া হওয়ায় আজ সে বেছে নিয়েছে রাস্তার মন্দির।

জীবনের সর্বস্ব হারিয়ে লোকটা আজ যখন পথবাসী, তখন সে আকস্মিকভাবেই আবার খবর পেয়েছে সেই বউটির। বউটি দীর্ঘকাল ডাক্তারের সঙ্গেই ছিল শহর থেকে দূরের কোনো জায়গায়। কিন্তু ডাক্তারের জীবন-সঙ্গিনীর মর্যাদা সে নাকি আজও পায়নি। শুধু তা'ই নয়, ডাক্তারের চোখে আজ সে পুরোনো এবং পুরোনো বলেই উপেক্ষিতা। তাই শোকে-দুঃখে সে'ও নাকি ভেঙে পড়েছে হতাশায় এবং তারও নাকি বিতৃষ্ণা জন্মেছে নিজ জীবনের প্রতি।

লোক মারফৎ এতদিন পরে সে নাকি পরোক্ষে খবর পাঠিয়েছে: সে আবার ফিরে আসতে চায় তারই কাছে—যে তাকে দিয়েছিল সহধর্মিনীর পবিত্র মর্যাদা এবং মরতে চায় তারই সংসারের ছায়ায়।

কিন্তু আজ তার সেই স্বামী কেবল ভাগ্যহারাই নয়, সর্বস্বহারা। সে আজ তাকে গ্রহণ করবে কোন্ মনে এবং রাখবেই

বা কোথায়। মরবার বা মরতে দেবার সামান্য ঠাঁইও যে আজ তার নেই।

তাই আজও যখন প্রত্যহ বিকেল নামে এবং শহরের ধূলি-ধূসর আবহাওয়ার মধ্যেও রাস্তার ওই মন্দিরটার চূড়োয় ঠিকরে পড়ে সূর্যের বিদায়ী বিলাস, ঠিক তখনই লোকটা নিয়মিত আসে মন্দিরের রকে এবং বিগ্রহের প্রতি বার বার নিক্ষেপ করে তার আকুল প্রশ্ন : কেন এমন হলো ?··· কিন্তু যে-নির্বোধ লোকটা সামান্য এক নারীর শোকেই ভাসিয়ে দিয়েছে সর্বস্ব এবং জলাঞ্জলি দিয়েছে জীবনের অন্য সমস্ত দিক—আজ তারই অসহায় ও অর্থহীন জিজ্ঞাসার উত্তর দেবাদিদেব কি দেবেন বা দেবার সময় তাঁর আছে ?

———

গঙ্গার ধারে

সেদিনের বিকেলটা ছিল মেঘলা। রোদের তেজ বিশেষ নেই। কিন্তু হাওয়ারও বালাই নেই। তাই অনুভূত হচ্ছিল গুমোট গরম। এই গরম ঘরে বা রেস্তোর াঁর আড্ডায় টিকে থাকা একরকম দায় হয়ে পড়েছিল বলেই সেদিন একা উদাসভাবে ঘুরতে ঘুরতে রওয়ানা হই গঙ্গার দিকে। উদ্দেশ্য ঃ গঙ্গার স্নিগ্ধ পরশ মেখে দেহের জ্বালা জুড়াবো এবং তার ভরাট বুকের দিকে তাকিয়ে মন ভরাবো কোনো অচিন কল্পনায়। সময়টা বেশ কেটে যাবে। বাগবাজার থেকে হাঁটতে হাঁটতে সেদিন গঙ্গা-তটের ঠিক যে-অংশে এসে উপস্থিত হই, সে-অংশে কোনো ঘাট নেই। তাই পরিবেশটা বেশ নিরিবিলি। সেখানে গঙ্গা অনেক দূর পর্যন্ত প্রশস্ত বলেই তার আবহাওয়া যেমন স্নিগ্ধমদির, তেমনই তার এপার-ওপারের দৃশ্যটাও বেশ কাব্যিক। অতএব আর বেশিদূর অগ্রসর না হয়ে সেখানেই পা ছড়িয়ে ব'সে পড়ি ঘাসের ওপর। তারপর এলোমেলো উদাস দৃষ্টি অকারণেই নিক্ষেপ করতে থাকি এদিকে-ওদিকে।

আশে-পাশে অনেকদূর পর্যন্ত কেউ নেই, কিছু নেই। কেবল আমার কাছ থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে চারটে সরু বাঁশের খাটো খুঁটির ওপর কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছে হাত-ছয়েকের একটা দরমার একচালা। একচালাটার তিনটে দিক ছেঁড়া চট ও ময়লা কাপড় দিয়ে ঢাকা। একটা দিক খোলা। আমি যেখানে বসেছি, সেখান থেকে একচালার এই খোলা দিকটাই নজরে পড়ে।

সুতরাং এলোমেলো ভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে গিয়ে হঠাৎ সেই খোলা দিকটার পথ বেয়েই একচালাটার ভেতরে প্রবেশ করে আমার দৃষ্টি। দেখলাম: সেখানে ব'সে গাঁজার কলকেতে বেশ
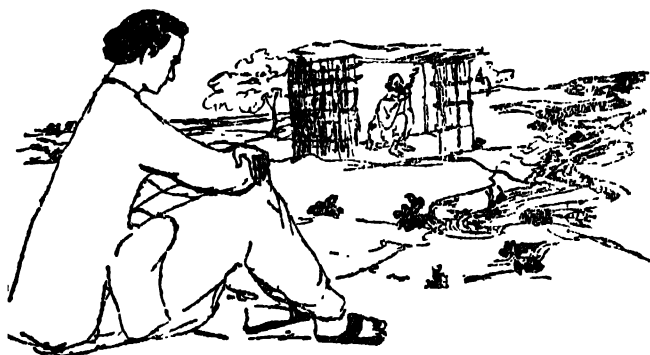
আরামে দম দিচ্ছে এক প্রৌঢ় বোষ্টম। তার পরনে গেরুয়া পোষাক। মাথায় জট পাকানো লম্বা চুল। মুখেও লম্বা দাঁড়ি। দূর থেকেও বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়: এই প্রৌঢ় বয়সেও দেহের গঠন তার মজবুতই রয়েছে। বয়সের ভার তাকে কাবু করতে পারেনি এবং তার মনটাও সম্ভবতঃ ক্লান্ত হয়ে প'ড়েনি জীবনের দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে গিয়ে।

আমি গঙ্গার ভরাট বক্ষ বা তার পরপারের মেঘ-মেদুর দিগন্তের দিকে না তাকিয়ে কেন যেন তাকিয়ে রইলাম কেবল বোষ্টমটার দিকেই। বোষ্টমটা তার গাঁজার কলকেতে সুদীর্ঘ টান মেরে যখন একসঙ্গে ধোঁয়া ছাড়ছে— তখন তার হাঁ-করা মুখটাকে মনে হচ্ছে যেন কারখানার চুল্লী। ধোঁয়া ঘুরপাক খেতে খেতে একচালার ভেতর থেকে বাইরে আসছে। তারপর কুণ্ডলী পাকিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। দৃশ্যটা বেশ লাগছে। যেন

গাঁজার নেশার মতোই এক নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে। তাই দুচোখ প্রসারিত ক'রে সেদিকেই তাকিয়ে আছি তন্ময় হ'য়ে। সময়ের খেয়াল নেই।

হঠাৎ আমার চমক ভাঙে মেঘের ডাকে। আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বিদীর্ণ ক'রে চমকে ওঠে বিদ্যুৎ। শিউরে ওঠে প্রশান্ত গঙ্গার ভরাট বক্ষ এবং উভয় পারের তটভূমি। তারপর বৃষ্টি নামতে স্থরু করে।

সারাদিনই গুমোট ভাব ছিল সত্য, কিন্তু এভাবে হঠাৎ বৃষ্টি নামবে—এমন কোনো প্রতিশ্রুতির আভাস ছিল না আকাশের কোথাও। তাই এসেছিলাম গঙ্গার ধারে। কিন্তু এখন দেখছি সমূহ বিপদ। আমার অলক্ষ্যেই বাদল মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ এবং তা থেকে প্রায় মুষলধারেই নেমে আসছে বৃষ্টি! এখন যাই কোথায়! দিন-কয়েক আগেই সর্দিজ্বর থেকে উঠেছি। এখন আবার এভাবে বৃষ্টিতে ভিজলে, এর পরিণাম যে কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়, তাই আমি বেশ অস্থির হয়ে উঠি। কিন্তু কোথাও কোনো আশ্রয়ের আভাসমাত্র নেই। যা আছে—তা অনেক দূরে। অতদূর পর্যন্ত যেতে যেতেই ভিজে শেষ হ'য়ে যাবো। তাই আর উপায়-গতিক না দেখে শেষে বোষ্টমের একচালাটার উদ্দেশেই ছুটে যাই। বোষ্টম অবশ্য কোনো আপত্তি করলো না। আমি যেতেই সে গাঁজার কলকেটা একপাশে রেখে একটা হোগলাপাতার আসন আমার দিকে এগিয়ে দিল।

মাত্র হাত-ছয়েকের একচালা। এর উচ্চতা হাত-পাঁচেক। তিনদিকে ঝুলছে ছেঁড়া চট ও ময়লা কাপড়। নিচে ছড়ানো রয়েছে ভাতের ফ্যান, তরকারীর খোসা ইত্যাদি। সব মিলিয়ে অতিশয় একটা ভ্যাপসা গন্ধ ফুলে ফুলে উঠছে। এ-গন্ধে টিকে

থাকা দায়। তবু একটা কোণ ঘেঁষে ওখানেই ব'সে পড়ি। কারণ বাইরে তখন স্বুরু হয়েছে মুষলধারে বৃষ্টি—যার প্রচণ্ড ছাঁট এসে ছিটকে পড়ছে একচালার ভেতরেও।

খানিক বাদে বৃষ্টির ছাঁট থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য আমি যখন আরেকটু ভেতরের দিকে স'রে আসার চেষ্টা করি—ঠিক তখনই ভিজে প্রায় জবুথবু হয়ে একচালাটার মধ্যে প্রবেশ করে আরও দু'জন। একজন যুবক বোষ্টম এবং অন্যজন যুবতী। সম্ভবতঃ সে-ও একজন বোষ্টমী। তাদেরও উভয়ের পরিধানে গেরুয়া পোষাক। তারা প্রবেশ করা মাত্রই ভেতরের প্রৌঢ় বোষ্টম একটু ন'ড়ে চ'ড়ে বসে। তারপর গাঁজার নেশাজড়িত চোখ মেলে যুবক বোষ্টমের দিকে তাকায় এবং ব'লে ওঠে :

—"কি-রে, এত দেরী হলো কেন ?"

যুবক বোষ্টম উত্তর দেয় :

—"দেরী তো হবেই। বারো দুয়ারী কি এখানে ? যেতে-আসতে সময় লাগবে না ?"

এ-কথা বলেই সে ঝোলার ভেতর থেকে একটা আনকোরা দেশী মদের বোতল বের ক'রে মাটিতে রাখে। এমন সময় প্রৌঢ় বোষ্টম হঠাৎ যেন চমকে উঠে মেয়েমানুষটার দিকে তাকিয়ে। তাকে হয়তো এতক্ষণ সে দেখতেই পায়নি। তার দিকে চোখ রেখেই যুবক বোষ্টমকে সে জিজ্ঞেস করে :

—"একে আবার কোত্থেকে জোটালি ?"

যুবক বোষ্টম এবার হাসতে হাসতে উত্তর দেয় :

—"এ-ও একজন বোষ্টমী। পথে আলাপ হলো। এর কেউ নেই। তাই সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলাম, আমাদের সঙ্গেই থাকবে।"

প্রৌঢ় বোষ্টম এবার আরও অবাক হয়ে মেয়েমানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর দেখতে দেখতে তার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে চকচকে খুশির ভাব। খানিক বাদে চোখ নামিয়ে মেয়েমানুষ-টাকে উদ্দেশ ক'রে সে বলে ঃ

—"তা বেশ, বেশ। আমাদেরও তো কেউ নেই। তুই আমাদের সঙ্গেই থাকবি।"

এ-কথা বলেই প্রৌঢ় বোষ্টম এবার আনকোরা বোতলটার ছিপি খোলে এবং যুবক বোষ্টম তার ঝোলা থেকে বের করে আস্তো একটা শশা এবং তিনটে মাটির ভাঁড়। মাটির ভাঁড়গুলো মাটিতে রাখতে রাখতেই হঠাৎ সে চোখ ফেরায় আমার দিকে এবং বেশ একটু চমকে ওঠে। প্রৌঢ় বোষ্টম তাকে অভয় দিয়ে বলে ঃ

—"ও-বাবু ভালো লোক। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে ব'লে আমাদের এখানে এসে বসেছে। চিন্তার কোনো কারণ নেই।"

প্রৌঢ় বোষ্টমের কথায় যুবক বোষ্টম এবার আশ্বস্ত হয়ে শশাটাকে তিনটুকুরো করে। মেয়েমানুষটা অর্থাৎ সেই বোষ্টমীও এবার তার গেরুয়া শাড়ির আঁচলটা নিঙড়ে নিয়ে, আবার ঝেড়ে গায়ে দেয়। তারপর একধারে বেশ আপনজনের মতো নিশ্চিন্তে ব'সে পড়ে। মদ ঢালা হয় মাটির ভাঁড়ে। তারপর শশা সহযোগে তা গিলতে শুরু করে বোষ্টমদ্বয়। বোষ্টমী মদ খায় না কেবল শশা চিবোয়। বাইরে তখন অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। তাই এদের এমন একটা পরিবেশের মধ্যে আমাকেও ব'সে থাকতে হয় বাধ্য হয়ে।

বোতলের মদ যখন নিঃশেষ হয়ে আসে, তখন নেশাও বেশ জ'মে ওঠে উভয়ের। নেশা উঠতেই তারা তাদের স্বাভাবিক জ্ঞান

হারিয়ে ফেলে এবং আশে-পাশে যে কেউ আছে, তা ভুলে যায়। বিশেষ ক'রে নির্লজ্জ হয়ে ওঠে প্রৌঢ় বোষ্টম। সে হাত বাড়িয়ে বোষ্টমীকে টেনে নেয় পাশে। তারপর তার মুখের কাছে মুখ রেখে ধরা-গলায় বলে ঃ

—"তোর কোনো ভয় নেই। তুই আমাদের কাছেই থাকবি। আমি তোকে বিয়ে করবো।"

তার এ কথার পর যুবক বোষ্টম হঠাৎ প্রচণ্ড রকম ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার ক'রে বলে ওঠে ঃ—

—"তুমি বিয়ে করবে মানে ? আমি ওকে নিয়ে এলাম, আর তুমি বিয়ে করবে ?"

প্রৌঢ় বোষ্টমও ঠিক তেমনিইভাবেই উত্তর দেয় ঃ

—"হ্যাঁ আমিই একে বিয়ে করবো। নইলে কি তুই করবি ? তোর তো বউ আছে। বউকে ছেড়ে পালিয়ে এসেছিস, আবার বিয়ে করবি কোন মুখেরে কুলাঙ্গার ?"

যুবক বোষ্টম এবার টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। তারপর ওভাবেই বেশ তীক্ষ্ম কণ্ঠে বলে ঃ

—"আমি আমার বউকে কেবল ছেড়েই এসেছি, প্রাণে মারিনি। কিন্তু তুমি? তুমি তো তোমার বউকে গলা টিপে মেরে ফেলে আজ ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছো। আবার একে বিয়ে ক'রে একদিন একেও তুমি মেরে ফেলবে। তুমি একটা জল্লাদ।"

প্রৌঢ় বোষ্টমও এবার উঠে দাঁড়ায় এবং যুবক বোষ্টমকে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে বলে ঃ

—"চুপ কর শয়তান। আমার সেই বউ ছিল কলঙ্কিনী। তাই তাকে মেরে ফেলেছি। আমার এই বউ হবে সতী-লক্ষ্মী। একে আমি ভালোবাসবো।"

যুবক বোষ্টমও আবার ধরাগলায় চিৎকার ক'রে ব'লে ওঠে ঃ

"না, তা হবে না। একে আমি এনেছি। সুতরাং আমিই একে বিয়ে করবো।

এ-কথা বলেই সে বোষ্টমীর একটা হাত ধ'রে তাকে টেনে নেয় কাছে। প্রৌঢ় বোষ্টম তা সহ্য করতে না পেরে এবার ঘুষি মারে যুবক বোষ্টমের মুখে। যুবক বোষ্টমও ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রৌঢ় বোষ্টমের ওপর। তারপর চলতে থাকে ধ্বস্তাধ্বস্তি।

এ-অবস্থায় আমার কী কর্তব্য—আমি ঠিক ভেবে পাচ্ছিলাম না। ওদিকে বোষ্টমী সাংঘাতিক ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায়। তারপর তাদের ধ্বস্তাধ্বস্তিব দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, হঠাৎ এক সময় নিজের ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে বৃষ্টিতেই বেরিয়ে আসে বাইরে। তারপর ছুটে পালিয়ে যেতে থাকে একদিকে।

আমি একবার তার পালিয়ে যাওয়ার দিকে এবং একবার

বোষ্টমদ্বয়ের ধ্বস্তাধ্বস্তির দিকে তাকাই। কিছুতেই কিছু বুঝে উঠতে পারি না—কী করবো। এমন সময় হঠাৎ ওদের ধ্বস্তাধ্বস্তির ধাক্কাতেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে সমগ্র একচালাটা।

বৃষ্টিতে ভেজার ভয়েই আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম একচালায়। এবার সেই আশ্রয়টাই যখন ভেঙে পড়লো—তখন আর অপেক্ষা ক'রে লাভ নেই। সুতরাং বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আমিও এবার পালিয়ে আসি।

পেছনে মাতামাতি তখনো চলতে থাকে এবং সে-মাতামাতির দিকে তাকিয়েই খলখলিয়ে হাসতে থাকে ভরাট ভাগীরথী।

———

পঞ্চানন খুড়ো

প্রচণ্ড দুপুর। সারা আকাশে আসন পেতেছে চণ্ডাল সূর্য। বাতাসে তারই রুদ্র-নিঃশ্বাস। শহর কলকাতা জ্বলছে, গলছে পথের রোলারচাপা পিচ। পিচের তপ্ত ক্লেদে পা ফেলে রিক্সা টেনে চলেছে রিক্সাওয়ালা, ঠেলাগাড়ি ঠেলছে হিন্দুস্থানী যুবক, কাক ডাকছে বিজলি বাতির তারে। লাঠিতে মাথা গুঁজে, মোড়ে মোড়ে বৈশাখের তপোভঙ্গ দেখছে বিকলাঙ্গ ভিখারী এবং ফলের ঝুড়িতে ঠেস দিয়ে সময়ের ভয়ঙ্কর মুখ দেখছে ক্লান্ত ফেরিওয়ালা— মনটা যার পরপারের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

এমনই এক খাই-খাই পরিবেশে, বউবাজারের ফুটপাথে আজ মাথা খুঁড়ছে পঞ্চানন খুড়ো। সে কেবল কাঁদছে আর কাঁদছে। সে সম্পূর্ণ অন্ধ। তার অন্ধ চোখের ঘোলা জল আজ শুষে নিচ্ছে ফুটপাথের উত্তপ্ত পাথর। কান্নার নিস্ফল প্রতিধ্বনি তার হারিয়ে যাচ্ছে ট্রাম-বাসের মুখর দুঃস্বপ্নে। পাশে তার সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই।

পঞ্চানন খুড়োর বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। সে আজ অন্ধ হলেও, ভিখারী বা পথবাসী নয়। মস্তিষ্কেও তার বিন্দুমাত্র বিকৃতি ঘটেনি। বউবাজার এলাকাতেই তার বাসাবাড়ী আছে। অবশ্য বাসাবাড়ীতে একমাত্র তার বয়স্কা স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। অতীতে সে সরকারী চাকুরী করতো এবং সেই সূত্রেই আজ সে পেন্সন ভোগ করে। মাসে মাসে পেন্সনের যে-টাকা আসে—তাতেই স্বামী-স্ত্রীর জীবন বেশ কেটে যায়। মোট কথা,

দুটো জীবনের ছোট্ট সংসার বেশ নির্ঝঞ্ঝাটই বলা চলে। অথচ তা সত্ত্বেও, বৈশাখের প্রচণ্ড দাহ মাথায় নিয়ে পঞ্চানন খুড়ো আজ অসহায়ের মতো মাথা খুঁড়ছে প্রকাশ্য ফুটপাথে। তার আজকের এই অবস্থা সত্যই খুব কৌতূহলজনক নয় কি ?

পঞ্চানন খুড়ো চিরকাল অন্ধ ছিল না। আগেই বলেছি, সে সরকারী চাকুরী করতো। অতএব অতীতে সে যে চক্ষুষ্মান

ছিল—তা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। শৈশবকাল থেকেই তার পিতামাতা বা নিকট আত্মীয় কেউ ছিল না। তার পিতা তার জন্য রেখে গিয়েছিলেন সামান্য অর্থ। তা দিয়েই সে

বোর্ডিং-এ থেকে লেখাপড়া শেখে। তারপর যৌবনের প্রথম ধাপে পা রেখেই সে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে গ্রহণ করে সরকারী চাকুরী।

চাকুরী-জীবন বেশ কিছুদিন কেটে যাবার পর, পঞ্চানন খুড়ো তার জীবনে অনুভব করে এক বিরাট নিঃসঙ্গতা! তাই বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শে সে বিয়ে করে এবং বোর্ডিং জীবনে ইস্তফা দিয়ে সে নতুন বাসাবাড়ী নেয় বউবাজার এলাকায়। তারপর দিনে দিনে সেখানেই গ'ড়ে ওঠে তার সংসার।

সময় এগিয়ে চলে। স্বামী-স্ত্রীর নতুন সংসার দিনে দিনে পুরোনো হলেও জীবনে তেমন অস্বাচ্ছন্দ্য দেখা দেয় না। তবে বছর-কয়েক পর স্ত্রীর মনে এক ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এ-ক্ষোভটা বিশেষ। অর্থাৎ বিয়ের পর বেশ কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পরেও সংসারে কোনো সন্তানাদির আবির্ভাব না ঘটায় স্ত্রীর মনে অশান্তি দেখা দেয়। স্বামীকে সে দুঃখ ক'রে বলে ঃ

—"ওগো, আমাদের কী হলো বল তো! ছেলে-পিলের মুখ কি আমরা দেখবো না? বুড়ো হলে কে আমাদের দেখবে?"

ছেলে-পিলের মোহ কিন্তু পঞ্চানন খুড়োর তেমন ছিল না। বরং সে ভাবতো ঃ সংসারে ছেলে পিলের আবির্ভাব ঘটলেই খরচের মাত্রা বাড়বে। সরকারী চাকুরীর সামান্য মাইনেয় ছেলে-পিলেকে মানুষ করা তো যাবেই না, অন্য দিকে সংসারেও দেখা দেবে অচলাবস্থা। সুতরাং তার চাইতে সন্তানহীন জীবনই অনেক ভালো। কারণ তাহলে কোনো ঝামেলাই থাকবে না। কিন্তু তার এ-মত বউয়ের কাছে সে প্রকাশ করলো না। অন্যদিক দিয়ে বউকে সে বুঝিয়ে বললো ঃ

—"সন্তান আসা-না-আসা ভগবানের হাত। এ নিয়ে দুঃখ ক'রে লাভ নেই। একমনে ভগবানের সেবা করো। তাঁর ইচ্ছা হলেই সন্তানের মুখ একদিন দেখতে পাবে।"

স্বামীর উপদেশ মন দিয়ে শোনে বউ এবং সেদিন থেকে আরও গভীর একাগ্রতার সঙ্গে সে সুরু করে ভগবানের সেবা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেখতে দেখতে কেটে যায় বছরের পর বছর; চুলে পাক ধরে স্বামী-স্ত্রীর; মেয়াদ শেষ হওয়ায় চাকুরী থেকেও অবসর গ্রহণ করে পঞ্চানন খুড়ো। তবু সন্তুষ্ট হলো না ভগবান, একটি সন্তানেরও আবির্ভাব ঘটলো না তাদের সংসারে।

বৃদ্ধ বয়সে কেবল বউকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যেই পঞ্চানন খুড়ো কোনো এক দূর-আত্মীয়ের বাড়ী থেকে নিয়ে আসে একটি দশ বছরের কিশোর ছেলেকে। তারপর বউকে বলে:

—"এই তোমার ছেলে। বুকের ভেতর স্নেহ-মমতা যা জ'মে আছে, তা এবার উজাড় ক'রে এই ছেলেটাকেই তুমি মানুষ ক'রে তোলো।"

আর অন্য পথ নেই ব'লে শেষ পর্যন্ত দশ বছরের এই কিশোর ছেলেটাকেই বুকে জড়িয়ে, বউ তার দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে সুরু করে। পঞ্চানন খুড়ো ছেলেটাকে ভর্তি করিয়ে দেয় স্কুলে। উদ্দেশ্য: তাকে লেখা পড়া শিখিয়ে উপযুক্ত ক'রে তুলবে।

কিন্তু ছেলেটা অতিমাত্রায় দুরন্ত। স্কুল সে যেতে চায় না। জোর ক'রে পাঠালেও, পালিয়ে আসে। শুধু তাই নয়, পাড়া থেকে সে সংগ্রহ ক'রে আনে একটা দেশী কুকুরের বাচ্চা এবং দিন কাটায় তারই সঙ্গে। তার এ-অবস্থা লক্ষ্য ক'রে

পঞ্চানন খুড়ো তাকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু বোঝেও বোঝে না ছেলেটা। দিন দিন তার দুরন্তপনা কেবল বেড়েই চলে। সব ভেবে, তার সঙ্গে মেলামেশা করতে পাড়ার ছেলেদের বারণ ক'রে দেয় পঞ্চানন খুড়ো। কিন্তু তাতেও তার কোনো ক্ষতি হলো না। কারণ কুকুরের বাচ্চাটাই তার সব চাইতে বড়ো সঙ্গী। ওটার সঙ্গেই সে মেতে থাকে দিনমান।

ছেলেটার এ-ধরণের আচরণ সহ্য করতে না পেরেই পঞ্চানন খুড়ো তাকে একদিন দু'এক ঘা মারে।

আশ্চর্য ! এই সামান্য মার খেয়েই হঠাৎ অসুখে পড়ে ছেলেটা। সে শয্যা নেয়। তারপর মাস-খানেক পর একদিন ওই শয্যাতেই সে ত্যাগ করে তার শেষ নিঃশ্বাস।

পরের ছেলে হলেও, ছেলেটার শোক অত সহজে ভুলতে পারে না পঞ্চানন খুড়ো এবং তার বউ। ছেলেটার প্রতি অপরিসীম মমতাবোধের জন্যেই হোক, অথবা যে-কোনো কারণেই হোক, পঞ্চানন খুড়োও এবার আদর করতে সুরু করে ছেলেটার সেই কুকুরের বাচ্চাটাকে এবং তার বউও কুকুরের বাচ্চাটার জন্য দুধ-ভাতের ব্যবস্থা রাখতে সুরু করে প্রত্যহ। কে জানে, হয়তো এভাবেই তারা খানিক অংশে ভুলে থাকার চেষ্টা করে তাদের বুকভরা দুঃসহ যন্ত্রণাকে।

এবার থেকে কুকুরের বাচ্চাটাই হলো পঞ্চানন খুড়োর নিত্যসঙ্গী। দেখতে দেখতে বাচ্চাটা বড়ো হয়ে ওঠে। পঞ্চানন খুড়ো এবার তার গলায় পরিয়ে দেয় চামড়ার বেল্ট এবং বেল্টের

সঙ্গে জুড়ে দেয় লোহার সৌখিন শেকল। তারপর তাকে নিয়ে সে ঘুরে বেড়াতে স্থুরু করে মাঠে-ঘাটে, বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীতে। এমন কি পেন্সন আনার জন্য যখন অফিসে যেতে হয়, তখনও সঙ্গে যায় কুকুরটা।

সম্ভবতঃ এভাবেই দিনে দিনে কুকুরটা বেশ অনুগত ও শিক্ষিত হয়ে ওঠে এবং পঞ্চানন খুড়োর পরিচিত সব মহলই তার চেনা হয়ে যায়। তাই কোনো বাড়ী বা জায়গার নাম করা মাত্রই কুকুরটা এবার সজাগ হয়ে উঠতে স্থুরু করে এবং পা বাড়ায় প্রভুর আগে আগে।

ঠিক এমনই সময়ে পঞ্চানন খুড়ো বৃদ্ধ বয়সে হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে পড়ে টাইফয়েড রোগে। এ-রোগ সারতে সময় লাগে প্রায় তিন মাস। অত্যন্ত দুঃখের কথা, তিন মাস পর শয্যা ছেড়ে সে সেদিন উঠে দাঁড়ায়—সেদিন সে বুঝতে পারে রোগটাই তার চোখের দৃষ্টি নিয়ে গেছে।

পঞ্চানন খুড়ো সেদিন থেকেই সম্পূর্ণ অন্ধ। প্রভুর এই নিদারুণ অবস্থা কুকুরটা হয়তো বুঝতে পারে। তাই সেদিন

থেকে কুকুরটাই পথ দেখাতে সুরু করে তার প্রভুকে। কোথাও যাবার প্রয়োজন হলেই অন্ধ পঞ্চানন খুড়ো কুকুরটার গলায় বাঁধা দীর্ঘ শেকলের শেষাংশ হাতে তুলে নিতো। তারপর ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র কুকুরটাই আগে আগে পা ফেলে পঞ্চানন খুড়োকে টানতে টানতে নিয়ে যেতো তার গন্তব্য স্থানে। কুকুরটার কাছে পঞ্চানন খুড়োর সব মহলই পরিচিত।

অন্যান্য দিনের মতো আজও দুপুর বেলা কুকুরটাকে নিয়ে পথে বেরিয়েছিল পঞ্চানন খুড়ো কিন্তু আজ কুকুরটার ভাগ্য তার অনুকূলে ছিল না সম্ভবতঃ। তাই কুকুরটা যখন পঞ্চানন খুড়োকে টানতে টানতে পার হতে যাচ্ছিল বউবাজারের রাস্তা—তখন আকস্মিক ভাবেই একখানা যাত্রীবাহী বাস এসে চাপা দেয় কুকুরটাকে। কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গেই মরে, ভাগ্যচক্রে বেঁচে যায় কেবল পঞ্চানন খুড়ো।

কুকুরটার অন্তিম চিৎকার সে শুনেছে এবং বুঝতে পেরেছে কুকুরটা আর নেই। অতএব আজ থেকে সে সম্পূর্ণ অন্ধ, সম্পূর্ণ নিঃস্ব। বৈশাখের প্রচণ্ড দাহ মাথায় নিয়ে তাই সে মাথা খুঁড়ছে বউবাজারের ফুটপাথে। হায়, এবার থেকে কে তাকে পথ দেখাবে।

বন্ধুবেশে অবাধ গতি

শনিবারের কফি-হাউস। কফির গন্ধে ও সিগারেটের ধোঁয়ায় অবিরাম দোল খাচ্ছে একটানা গুঞ্জন। কোথাও ছেলে কোথাও মেয়ে, আবার কোথাও ছেলে-মেয়ে একসঙ্গেই জমিয়েছে অবসরের আড্ডা। শীতকাল বলেই পাখা বন্ধ। বাতাস নেই। কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসের উষ্ণ হাওয়ায় যেন অকাল বসন্তের হাহাকার। তবু এখানেই ধরা পড়েছে শনিবারের বিকেল।

এক কাপ কফির লোভে আমিও এখানে এসেছি। তবে সঙ্গী আমার কেউ নেই। সঙ্গীহীন ব'সে আছি এককোণে। বেয়ারা এক কাপ কফি রেখে গেল। কাপটা হাতে নিয়ে চুমুক দিতে যাবো—এমন সময় অন্য টেবিল থেকে একব্যক্তি উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন এবং হাসিমুখে একটা নমস্কার ঠুকে বললেন: "ভালো আছেন?"

কাপটা টেবিলে রেখে খানিকটা অবাক হয়েই তার দিকে তাকালাম। ঠিক যেন চিনতে পারছি না। কোথাও দেখেছি বলেও মনে পড়ছে না। সম্ভবতঃ আমার ভাবগতিক লক্ষ্য করেই তিনি আবার বললেন: "চিনতে পারলেন না তো? আমার নাম দেবকী দাস। আপনার সঙ্গে একবারই আমার পরিচয় হয়েছিল বিডন পার্কের রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে। সেই যে প্রমোদবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর প্যাণ্ডেলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের চায়ের দোকানে এক সঙ্গে চা খাওয়া হলো—মনে পড়ছে না?"

তিনি এতকিছু নজির উপস্থিত করা সত্ত্বেও, আমার কিছুই

তেমন স্মরণ হলো না। তবু ভদ্রতার খাতিরে বলতেই হলো:

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, হয়তো হবে। অনেক দিনের কথা তো, ঠিক মনে রাখতে পারিনি। আপনি বসুন।"

তিনি পাশের চেয়ারেই বসলেন। বললাম: "কফি চলবে?"

এ-কথার উত্তরে তিনি অবশ্য না-ই বললেন। কিন্তু তাঁর না-টা খানিকটা হ্যাঁ-এর মতো, অর্থাৎ কফি পানে ইচ্ছে নেই, তবে এক কাপ পেলেও মন্দ হয় না। সুতরাং বেয়ারাকে ডেকে আরেক কাপ কফির অর্ডার দিলাম। তার আগে অবশ্য পকেট হাতড়ে একবার দেখতে হলো—আরেক কাপের দাম দিয়ে ট্রাম ভাড়াটা ঠিক বাঁচবে কিনা।

কফির অর্ডার দিতেই তিনি চেয়ার টেনে আরেকটু কাছ ঘেঁষে বসলেন এবং বেশ একটু উৎসাহের সঙ্গেই বললেন: "এত দিনে আপনার দু'একখানা বই নিশ্চয়ই বেরিয়েছে। আমাকে কিন্তু কম্‌প্লিমেণ্টারী কপি দিতে হবে। কারণ আমি আপনার বিশেষ ভক্ত, অর্থাৎ আপনার 'লেখার' একজন একনিষ্ঠ অনুরাগী। কলকাতার গুটিকয় মাসিক পত্রিকার সঙ্গে আমি যুক্ত রয়েছি। যদি চান তো একসঙ্গে সবকটি পত্রিকাতেই আপনার বইয়ের সুচিন্তিত আলোচনা আমি প্রকাশ করবো। তারাশঙ্কর, নরেন মিত্র, এমন কি লোকন্তরিত মাণিকবাবুর বই পর্যন্ত আমি ইতিপূর্বে অনেকবার রিভিউ করেছি। আপনি বন্ধু লোক। আপনার বই সম্বন্ধে বেশ একটু গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করবো—যাতে সেলের দিকটা সুবিধে হয়।

তাঁর কথা শুনে, তাঁকে আমার বইয়ের কম্‌প্লিমেণ্টারী কপি দেওয়া উচিত বলেই আমার মনে হলো। কারণ আমার মতো

একজন অখ্যাত লেখকের সস্তা বই এক সঙ্গে অনেক কটি পত্রিকাতে আলোচিত হবে—এর চাইতে আনন্দের আর কী আছে। কিন্তু তাঁকে যে বই দেবো—তার উপায় নেই। কারণ বই আমার ছাপা হয় নি। ভবিষ্যতে আমার লেখা কবে যে বই আকারে প্রকাশ পাবে—তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু তাঁর কাছে এ-কথা প্রকাশ করতে কেমন যেন একটু বাধো-বাধো ঠেকলো। তাই বললাম :—"বই আমার যন্ত্রস্থ। আশা করা যায় কিছু দিনের মধ্যেই বেরুবে। বেরুলেই আপনার কাছে দিয়ে আসবো। দয়া ক'রে আপনার ঠিকানাটা দিন।"

আমার কথা শুনে খানিকক্ষণ কী যেন তিনি ভাবলেন। তারপর বললেন : "বেশ-বেশ, বেরুলেই দেবেন। আমার ঠিকানা রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং আপনার ঠিকানাটাই দিন, আমিই আপনার সঙ্গে দেখা করবো।" —এই ব'লে তিনি কফির কাপে চুমুক দিয়ে একটা সস্তা ব্র্যাণ্ডের সিগারেট ধরালেন।

এমন সময় অন্য টেবিল থেকে উঠে এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালো একটি সুদর্শন তরুণ। তার লক্ষ্য অবশ্য আমি নই, দেবকীবাবু। সে দেবকীবাবুকেই লক্ষ্য ক'রে বললো :

—"দিদি আপনাকে ডেকেছে।"

দেবকীবাবু বেশ একটু উৎসাহ ভরেই তরুণটির একটি হাত চেপে ধ'রে বললেন :

—"কেন রে ? কি হলো তোর দিদির ?"

সে আবার বললো : "দিদি বি-এ পরীক্ষা দেবার পর তার পুরোনো বইগুলো আপনি নিয়ে এসেছিলেন কোনো একটি গরীব ছাত্রীকে সাহায্য করবেন ব'লে। কিন্তু দিদি তো এবার পাস করতে পারেনি। তাই বইগুলো আবার দরকার।"

তরুণটির কথায় দেবকীবাবু বেশ একটু অবাক হয়েই ব'লে উঠলেন : "বলিস কিরে ? তোর দিদি পাশ করতে পারেনি ? কিন্তু ফেল করার মেয়ে সে তো নয়। সে নিশ্চিত পাশ করবে জেনেই তো তার বইগুলো এনে একটি গরীব মেয়েকে দিয়েছি। সে মেয়েটিও তো পড়াশুনা আরম্ভ করেছে। এখন কি করেই বা তার কাছ থেকে বইগুলো ফেরৎ নিই বলতো ?"

এই ব'লে দেবকীবাবু অত্যন্ত গভীরভাবেই কি যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ একসময় বললেন : "আচ্ছা-আচ্ছা, সে দেখা যাবে। তোর দিদিকে বলিস, দিন-কয়েকের মধ্যেই আমি তার সঙ্গে দেখা করছি।"

তরুণটি সায় দিয়ে চ'লে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আরেক ব্যক্তি আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। তাঁরও লক্ষ্য দেবকীবাবু। তিনি দেবকীবাবুকে একটা নমস্কার ঠুকেই বললেন : "কী, দাদা ! আমার বইটা তো ফেরৎ পেলাম না !"

দেবকীবাবু যেন একটু চমকে উঠেই বললেন : "কোন্ বইটা ভাই ?"

—"সেই যে সেক্সপীয়রের কম্‌প্লিট ওয়ার্কস-টা ! প্রায় বছর-খানেক আগে আমার বাসা থেকে নিয়ে এসেছিলেন—মনে নেই ?"

—"ও হ্যাঁ হ্যাঁ। নিশ্চয়ই মনে আছে ! সেক্সপীয়র তো আমার আগেই পড়া ছিল। সে-সময় সেক্সপীয়র সম্বন্ধে একটা আলোচনা লেখার প্রয়োজন হয়েছিল বলেই ওটা নিয়েছিলাম। এতদিন তোমার দেখা পাইনি ব'লে বইটা আর ফেরৎ দিতে পারিনি।"

—"কেন, আমার সঙ্গে তো রাস্তা-ঘাটে প্রায়ই আপনার দেখা হয়। তাছাড়া আমার বাসার ঠিকানা তো আপনার অজানা নয়।"

দেবকীবাবু তাঁর এ-কথায় বিশেষ গুরুত্ব না দিয়েই বললেন ঃ

"তোমার বাসায় যে যাবো, সে-সময় কোথায় ? নানান ঝঞ্ঝাটে ব্যস্ত আছি। আর রাস্তা-ঘাটে তোমার সঙ্গে দেখা হয় সত্য, কিন্তু দেখা যে নিশ্চিত হবেই—তা কি আগে থেকে ভাবা যায় ? তাছাড়া রাস্তা-ঘাটে বই নিয়ে চলাফেরা করার বিপদও আছে। কোনো বন্ধু-বান্ধব দেখলেই চেয়ে বসতে পারে। দিতে না চাইলে হয়তো জোর করেই নেবে বন্ধুত্বের খাতিরে। এভাবে অনেক বন্ধুই আমার অনেক বই নিয়েছে—যা' আজও ফেরৎ পাইনি। তাই সাধারণতঃ বইপত্র হাতে নিয়ে রাস্তা-ঘাটে বেরোই না। তোমার বইটা বাড়ীতেই আছে। ভয় নেই। এবার দিন-কয়েক পরে সুযোগ মতো তোমার বাসায় গিয়েই বইটা দিয়ে আসবো। তুমি এখন যাও। আমরা একটা জরুরী আলোচনায় ব্যস্ত আছি।"

ভদ্রলোক চ'লে গেলেন। কিন্তু যেতে যেতে আবার ব'লে গেলেন ঃ "বইটা আমার নয় দাদার। তাঁর কাছ থেকে রোজই তাড়া খাচ্ছি। দয়া ক'রে দু'এক দিনের মধ্যেই দিয়ে আসবেন কিন্তু।"

দেবকীবাবু তার কথায় আর কর্ণপাত না ক'রে আমাকেই লক্ষ্য ক'রে বলতে লাগলেন ঃ "সারা জীবন ধ'রেই পড়াশুনা করছি। পৃথিবীর সব সাহিত্যই আজ আমার নখদর্পণে বলা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুযোগের অভাবে কিছুই তেমন ক'রে উঠতে পারলাম না।

আমার হাতে বিশেষ সময় ছিল না। তাই সেদিনের মতো দেবকীবাবুর কথায় আর তেমন মনোযোগ না দিয়ে সবিনয়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং বললাম ঃ "পরে আবার দেখা হবে। আজ চলি।"

প্রায় মাসখানেক পরের এক বিকেলের কথা। শ্যামবাজারের

ট্রাম বা বাস ধরবো ব'লে দাঁড়িয়ে আছি প্রেসিডেন্সী কলেজের পাশের ফুটপাথে। ট্রাম এবং বাস ফিরছে অফিস-ফেরৎ যাত্রী নিয়ে। অত্যধিক ভীড়। কিছুতেই কোনো বাস বা ট্রামে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। তাই কেটে যাচ্ছে প্রহরের পর প্রহর। আমার পেছনেই প্রেসিডেন্সী কলেজের সমস্ত রেলিং জুড়ে পুরোনো বইয়ের দোকান। হঠাৎ সেদিক থেকেই একটা হৈ-চৈ ভেসে এলো। হৈ-চৈ লক্ষ্য ক'রে খানিকটা কৌতূহলী হ'য়েই এগিয়ে গেলাম। কিন্তু এগিয়ে যেতেই যা নজরে পড়লো—তাতে বিস্মিত হলাম আরও বেশি ঃ

ফুটপাথের একটা পুরোনো বইয়ের দোকানের সামনে একজন কনষ্টেবল সহ দাঁড়িয়ে আছেন জনৈক পুলিশ সার্জেণ্ট। তাঁর পাশে প্রায় জনদশেক স্বাস্থ্যবানযুবক অবিরাম আস্ফালন ক'রে চলেছে। এ-আস্ফালন বা নির্মম কটূক্তি বর্ষিত হচ্ছে যার উদ্দেশে, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন অধোমুখে। তাঁর হাতে ডাক্তারী শাস্ত্রের একটা বিরাট 'এ্যানাটমী' বই—যার বর্তমান মূল্য পঁচাত্তর টাকা থেকে আশি টাকার কোঠায়। ইনি আমার অপরিচিত নন। ইনিই সেই দেবকীদাস—যিনি আমার একজন পরমতম ভক্ত। কী ব্যাপার—তা' খানিকটা অনুমান করতে পারলেও, পুরোপুরি তখনো ঠিক ঠাহর হলো না। তার আগেই দেবকীবাবুকে ভ্যানে তুলে নিয়ে কনষ্টেবল সহ পুলিশ সার্জেণ্ট এবং সেই সঙ্গে যুবকরাও চ'লে গেল। যে-দোকানের সামনে ব্যাপারটা এতক্ষণ ঘটছিল—সে-দোকানের দোকানদার তখনো দাঁড়িয়ে আছে দেখে—শেষ পর্যন্ত তাকেই জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে যা বুঝতে পারলাম, তার মর্মার্থ এই ঃ

দেবকীবাবু এ-অঞ্চলের পুরোনো বইয়ের প্রত্যেক দোকানেই সুপরিচিত। প্রায় প্রত্যহই তিনি কিছু-না-কিছু বই এনে এ-সমস্ত

দোকানে বিক্রী ক'রে থাকেন। দোকানদাররা সরল বিশ্বাসেই তাঁর কাছ থেকে বই কেনে এবং পরে তারাও বিক্রী করে অন্য লোকের কাছে। অন্যান্য দিনের মতো দেবকীবাবু আজও এসেছিলেন সেই বিরাটকায় এ্যানাটমী বইটা বিক্রী করতে। দোকানদারের সঙ্গে দরদাম হচ্ছিল—এমন সময় কোনো এক মেডিকেল হোস্টেলের জনকয়েক যুবক এসে দেবকীবাবুকে চ্যালেঞ্জ করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ডাকে। দোকানদার ও পুলিশের কাছে যুবকদের বক্তব্যে প্রকাশ : দেবকীবাবুর সঙ্গে তাদের পরিচয় অনেকদিনের। দীর্ঘ পরিচয়ের সূত্রে দেবকীবাবু প্রায় দিনই যাতায়াত করতেন তাদের হোস্টেলে এবং প্রায় দিনই একটা-না-একটা বই হোস্টেল থেকে উধাও হতো। কিন্তু দেবকীবাবুর বাহ্যিক ব্যবহার ও তাঁর গতিবিধি এত বেশি মার্জিত যে উক্ত হোস্টেলের যুবক বা ছাত্ররা ঘুণাক্ষরেও তাঁকে সন্দেহ করতে পারতো না। কিন্তু দিন-কয়েক আগে জনৈক ছাত্রের এ্যানাটমী বইটাও যখন হোস্টেল থেকে হারিয়ে যায়, তখন তারা আর সহ্য করতে না পেরে এ-ব্যাপারে অনুসন্ধান শুরু করে এবং অতি সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখে পুরোনো বইয়ের দোকানগুলোর প্রতি। তাদের এ-সতর্ক লক্ষ্যের ফলেই আজ হাতে-নাতে ধরা পড়েন তাদেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু দেবকীদাস। হায়রে ভাগ্যের পরিহাস!

ইনিই সেই দেবকীদাস—যিনি আমার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন বিডন পার্কের রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে এবং যিনি প্রত্যাশা করেন আমার বইয়ের কমপ্লিমেণ্টারী কপি। ইনিই সেই পরোপকারী জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তি—যিনি জনৈক তরুণের দিদির কাছ থেকে বি-এ ক্লাসের পাঠ্য-পুস্তকগুলো চেয়ে এনেছেন কোনো এক গরীব

ছাত্রীকে সাহায্য করবেন ব'লে এবং সম্ভবতঃ যিনি আজও ফেরৎ দেননি জনৈক ভদ্রলোকের সেক্সপীয়রের কম্‌প্লিট ওয়ার্কস। বি-এ ক্লাসের পাঠ্য-পুস্তক এবং সেই সঙ্গে সেক্সপীয়রের কম্‌প্লিট ওয়ার্কস যে এ-সমস্ত দোকানেরই মারফৎ হস্তান্তরিত হয়েছে অনেকদিন আগেই—তার সঠিক খবর তরুণটির সেই দিদি এবং সেই জনৈক ভদ্রলোক হয়তো আজও জানতে পারেন নি।

পরে আরও অনেক অনুসন্ধান ক'রে জানা গেছে : দেবকী-দাসের মতো লোক কেবল একজন নয়, অনেক আছেন কলকাতায়। এদের পরিচিতির ব্যাপ্তি সর্বস্তরেই। বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে গায়ে পড়েই পরিচিত হওয়া এদের স্বভাব। বাহ্যিক ব্যবহারের গুণে এরা সময়ে অসময়ে সাহিত্যিকদের লেখার ঘর থেকে কলেজ হোস্টেল এবং বিত্তশালীদের বৈঠকখানায় পর্যন্ত আড্ডা জমাতে সক্ষম হন। সাহিত্যিকদের লেখার ঘরে থাকে গবেষণামূলক দামী দামী বই, হোস্টেলে থাকে ছাত্রদের পাঠ্য-পুস্তক এবং বিভিন্ন বাড়ীর বৈঠকখানায় প্রখ্যাত লেখকের নানান জাতীয় বই সাজানো থাকে সেলফে। এ-সমস্ত জায়গা থেকে দেবকীবাবুর মতো বন্ধুবেশী লোকেরা অতি সুকৌশলে দামী-দামী বই সরিয়ে এনে সরবরাহ করেন পুরোনো বইয়ের দোকানে। কোনো কোনো সময় অবশ্য চেয়েও আনেন। এরাই অজস্র তরুণের অজস্র দিদির কাছ থেকে আই-এ, বি-এ ক্লাসের পাঠ্য পুস্তক এবং একাধিক ভদ্রলোকের কাছ থেকে সেক্সপীয়র, গ্যয়টে, বার্নার্ড শ' বা জোলার কম্‌প্লিট ওয়ার্কস নানা অজুহাতে চেয়ে আনেন। তাছাড়া সাহিত্যিকদের কাছে এরা কখনো সমালোচক ও কখনো পরম ভক্ত সেজে জোর করেই আদায় করেন কম্‌প্লিমেণ্টারী কপি

এবং মাঝে মাঝে ক্যানভাসারের বেশ ধ'রে প্রকাশকদের কাছ থেকেও বাগিয়ে নেন স্কুল-কলেজের পাঠ্য-পুস্তক—যা অর্ধ মূল্যেই বিক্রী করেন পুরোনো বইয়ের দোকানে। দিন চলে এদের অভাবেই।

———

বেকার

ঘরে উনোন জ্বলেনি গত কয়েকদিন। একাধিক দিনের নিভন্ত উনোন আজ জ্বালাবে বলেই আশা করেছিল বনমালী। কিন্তু ভাগ্যে তার তা'ও সইলো না। মহাজনকে নানা-কথায় বুঝিয়ে, আজ সকালেই আলুর যে-বস্তাটা সে এনেছিল—খানিক আগে রাস্তার পাশে তা' খুলে বসতেই হঠাৎ ধরা পড়েছে সে। সারা-রাস্তায় ছড়িয়ে গেছে আলুগুলো, পিষ্ট হয়েছে একাধিক গাড়ির চাকায়। কিছু-কিছু অক্ষত আলু উধাও হয়েছে রাস্তা থেকে, যেমন দিনে-দিনে বনমালীর সংসার থেকেও হারিয়ে গেছে অনেকদিনের অসংখ্য আশা।...

একটু পরেই আবার হয়তো ফিরে আসবে বনমালী। এসেই সে দেখবে: আলুর সঙ্গে গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়েছে তার ভাগ্যটাও এবং তার উনোন জ্বালাবার সংকল্পও আজ লাঞ্ছিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়।

বাড়ীতে তার আশা-পথ চেয়েই অপেক্ষা করছে অনেকগুলো অশান্তির চোখ এবং শূন্য ঘরে প্রহর গুণছে একাধিক দিনের নিভন্ত উনোনটাও। হয়তো বাড়ীময় তার বাতাস নেই, কেবল দীর্ঘশ্বাস। হয়তো কথা নেই, কেবল কান্না। তাই হয়তো দ্বিধা-কম্পিত পায়ে আজ সে বাড়ীর দিকে এগুতে পারবে না। দিনের এই প্রখর আলোতেও তার চোখের সামনে নেচে উঠবে দুঃস্বপ্নের নির্বাক ছায়া—যেমন মাস-ছয়েক আগে ছাঁটাই-নোটিশের কালো-

কালো অক্ষরগুলো ঠিক এমনি করেই ভূতের মতো নেচেছিল তার চোখের সামনে।

বনমালীর বাপ ছিল পাট-কলের শ্রমিক। বাপের মৃত্যুর পর অনেক তদ্বিরের ফলে সে-কাজটাই পেয়েছিল বনমালী। যেদিন

সে প্রথম কাজে ঢোকে—সেদিন এত দায়-দায়িত্ব তার ছিল না। কারণ সেদিন সংসারে ছিল কেবল সে, আর তার স্ত্রী। অতএব যা মাইনে পেতো—তাতেই স্বচ্ছন্দে চলতো সংসারের খরচ এবং কিছু-কিছু জমতোও। কিন্তু বছর-কয়েকের মধ্যে এ-স্বাচ্ছন্দ্যে তার ভাঁটা পড়ে। কারণ এক-একটি ক'রে অনেককটি সন্তানের আবির্ভাব

ঘটায় সংসারের পরিধি বাড়ে, হার বাড়ে খরচের। ফলে তাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখা দেয় অনটন এবং এ-অনটন একদিন সত্যই দুঃসহ হয়ে ওঠে—যেদিন স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানাদি মিলে সমগ্র পরিবারটার সংখ্যা দাঁড়ায় আট। অবশ্য তবুও কোনোমতে চালিয়ে যাচ্ছিল বনমালী। তার প্রথম ছেলে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত হয়তো এভাবেই সে চালিয়ে যেতো—যদি কারখানায় মালিক আর মজুর শ্রেণীর মধ্যে হঠাৎ সেই বিবাদটা না সুরু হতো। বিবাদটা সুরু হয়েছিল শ্রমিকদের মাইনে বৃদ্ধি নিয়েই। বনমালী শ্রমিক। অতএব শ্রমিক দলের আন্দোলনে যোগদান করেছিল সে'ও। আন্দোলন বেশ জোরদারই হয়েছিল। তাই মালিক শ্রেণী শেষ পর্যন্ত মিটমাট করতে বাধ্য হয় এবং মাইনেও বাড়ায়। কিন্তু এই মাইনে বাড়ানোর ফলে লভ্যাংশ থেকে যে-পরিমাণ অর্থ তাদের খ'সে পড়ে—তা তারা পুষিয়ে নেয় অন্যদিক থেকে। অর্থাৎ মিটমাটের পরেই নানান অছিলায় তারা ছাঁটাই করে প্রায় পঞ্চাশজন শ্রমিককে। বনমালী এই পঞ্চাশজনেরই একজন।

ছাঁটাই হওয়ার পর অনেক ধরাধরি, বহুদিক দিয়ে বহু তদ্বিরের পরেও পুনরায় আর কাজে বহাল হতে পারেনি সে। ফলে সেদিন থেকেই তার সংসারে নেমে আসে কেবল অনটন নয়, হাহাকার।

অন্য জায়গায় চাকুরীর জন্য বহু চেষ্টা করে বনমালী। কিন্তু ব্যর্থ হয়। তাই দিন-কয়েক শেয়ালদা ষ্টেশনে এসে সে শুরু করে কুলির কাজ। কিন্তু এ-কাজে সে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাই রোজগারের দিকটায় বিশেষ সুবিধে হয় না। তাছাড়া এ-কাজে তার শরীরটাও অথর্ব হয়ে পড়ে দিনকয়েকের মধ্যেই। ফলে

সংসারের অচল অবস্থা সত্যই খুব মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়ায় দিনে-দিনে। যা সামান্য গয়না ছিল বউয়ের—তা প্রথমতঃ বাঁধা পড়ে, তারপর বিক্রী হয়। শুধু তাই নয়, বছর-কয়েক আগে সখ ক'রে যে সোনার হারটি গড়িয়ে প্রথম সন্তানের গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিল বনমালী, তাও তাকে হারাতে হয় পেটের দায়ে। শেষ পর্যন্ত বিক্রী করার যখন আর কিছুই থাকে না, তখন বাঁধা পড়ে ঘটি-বাটী এবং একে একে ঘটি-বাটীও যখন নিঃশেষ হয়—তখন দিন চলতে থাকে অনাহারে। উনোনে আগুন নেভে, কিন্তু আগুন জ্ব'লে ওঠে এক সঙ্গে অনেকগুলো পেটে—যার প্রচণ্ড তাপ প্রকাশ হয়ে পড়ে বাইরেও। ফলে অসহ্য জ্বালায় দিন-কয়েকের মধ্যেই কালো হয়ে ওঠে সমস্ত সংসারটা।

পাড়ারই একজন প্রতিবেশী বনমালীর এই অবস্থা লক্ষ্য ক'রে তাকে উপদেশ দেয় ব্যবসা করার। কিন্তু ব্যবসা করতে হলে পুঁজি চাই। সে-পুঁজি বনমালীর নেই। পুঁজি সংগ্রহের জন্য বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, এমন কি কোনো কোনো অনাত্মীয়ের দ্বারেও সে ধর্না দেয়, কিন্তু লাভ হয় না। ব্যবসায় অনভিজ্ঞ বনমালীকে সহজে কেউ বিশ্বাস করলো না এ-ব্যাপারে। তাই সে বাধ্য হয়ে বাজারের একজন মহাজনের হাতে-পায়ে ধ'রে আজ বাকিতে এক বস্তা আলু এনেছিল। তার লাইসেন্স নেই। তাই বাজারে দোকান সাজানোর অধিকার থেকেও সে বঞ্চিত। অতএব অন্য ত্নএকজন ফেরীওয়ালার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ফুটপাথেই সে আলুর বস্তা খুলে বসে। কিন্তু বসতে-না-বসতে পাশেই এসে ব্রেক ক'ষে দাঁড়ায় পুলিশের ভ্যান। অন্যান্য ফেরীওয়ালারা এ-ব্যাপারে অভিজ্ঞ। সুতরাং দূর থেকেই পুলিশের ভ্যান আসার সংকেত

পেয়ে সামান্য মালপত্র নিয়ে তারা স'রে পড়ে তাড়াতাড়ি। বনমালী ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে আলুর বস্তা খুলে ব'সে থাকে ফুটপাথেই। তাছাড়া মণ-দুয়েকের বস্তাটা কাঁধে নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে পালাবার উপায়ও তার নেই। অতএব ফুটপাথে বে-আইনীভাবে দোকান সাজানোর অপরাধে পুলিশ

এসে তাকেই পাকড়াও করে হাতে-নাতে এবং টেনে তোলে ভ্যানে। আলুর বস্তাটাও ভ্যানে তুলে নেয়ার চেষ্টা হয়, কিন্তু অসাবধানে তুলতে গিয়ে সব আলুই গড়িয়ে পড়ে রাস্তায়। সারা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়া আলুগুলো আবার যথাযথ কুড়িয়ে ভ্যানে তোলার সময় নেই পুলিশের। সুতরাং আলু ফেলে কেবল

বনমালীকেই নিয়ে স'রে পড়ে তারা। এদিকে একাধিক গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয় সারা-পথের আলু এবং আলুর সঙ্গে যেন নিষ্পেষিত হয় বনমালীর ভাগ্যটাও।

কিছুক্ষণ হাজতে আটক রেখেই পুলিশ তাকে ছেড়ে দেবে। হয়তো ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবার ফিরে আসবে বনমালী। কিন্তু ফিরে এসে দাঁড়াবে কোথায়? ফুটপাথে? না। ফুটপাথের সব আশাই তার মিশে গেছে ধূলোয় এবং সে-ধুলোও আজ কদর্য হয়েছে অজস্র পিষ্ট আলুর রসে। পথেও কোনো করুণা নেই। দিনের হলুদ রোদ তার চোখে নিষ্ঠুর মরীচিকার মতো এবং মাথার ওপরের আকাশটাও যেন একটা বিশালকায় শূন্যপেট—যা হায়-হায় করছে দুঃসহ ক্ষুধায়। তাই ফুটপাথে সে দাঁড়াবে না, পায়চারী করবে না পথে-পথেও।... তবে কি বাড়ী যাবে? হয়তো যাবে। কিন্তু তারপর? তারপর একাধিক অনাহারীর নিষ্প্রভ চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যন্ত্রণায় ফেটে যাবে তার বুক। ফাটা বুকে আহত আত্মাটা তারস্বরের একবার স্মরণ করবে বিধাতাকে। কিন্তু কোনো উত্তর পাবে না। সমস্ত পেটের আগুন আবার জ্ব'লে উঠবে দ্বিগুণ হয়ে, তবু উনোন থাকবে নিভন্ত।

তাহলে উপায়? উপায় শুধু একটাই আছে। পেটের আগুনে উনোন না জ্বললেও, জ্বালাতে হবে মন—যে-মনের লেলিহান শিখা দাহ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বাতাসের আগেও ছুটে যাবে উৎসের কাছে, যে-উৎস অন্যায়ের অবিচারের এবং পাপের।

———

বারো বছর আগে ও পরে

পরিচিতির বৃহৎ গণ্ডীতে দিনে দিনে অজস্রের সমাগম ঘটে। আবার অজস্রের মধ্যে অনেকেই হারিয়ে যায় সময়ের ব্যবধানে। কেউ স'রে যায় অনেক, অনেক দূরে। মন থেকে মুছে যায় তাদের স্মৃতিও। তারপর চলমান জীবনের দীর্ঘ পরিক্রমার পথে আকস্মিকভাবেই আবার আবির্ভূত হয় হারিয়ে-যাওয়া কেউ কেউ, যারা বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে নতুন ক'রে জাগিয়ে তোলে বহুকাল আগের একটা পুরোনো জগৎ অথবা পুরোনো একটা অধ্যায়।...

প্রায় বারো বৎসর পর আমার চোখের সামনে ঠিক এমনিভাবেই সেদিন ভেসে ওঠে হারিয়ে যাওয়া বীণাদি। সে তার মনের আলোয় জ্বালিয়ে দেয় আমার স্মৃতির নক্ষত্র— যার স্নিগ্ধ উদ্ভাসে হঠাৎ সেদিন চম্‌কে ওঠে অনেক কালের নির্বাক অতীত।

ধর্মতলা ষ্ট্রীটের ফুটপাথ ধ'রে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের গেটের সামনেই বীণাদির দেখা পেলাম। তাকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে থমকে যাই আমি কিম্বা বীণাদিই আমার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ থামিয়ে দেয় আমাকে। বারো বৎসরের ব্যবধান হলেও, তার মুখচ্ছবি আমি ভুলে যাই নি। কারণ আমার কাছে তা' ভোলার নয়। হয়তো বীণাদিও আমাকে ভুলতে পরে নি। তাই সে'ই প্রথম তার বিস্ময়ভরা চোখ দুটি আমার সর্বাঙ্গে বুলিয়ে স্মিত-মুখেই হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে ওঠে:

—"কি রে, তুই কি কলকাতাতেই থাকিস?"—এই ব'লে দ্বিধাহীন চিত্তেই সে আমার একটা হাত ধ'রে চাপ দেয়। তারপর আবার বলে:

—"ইস, তুই যে আজকাল লায়েক হয়ে উঠেছিস দেখছি! হাঁ রে, আমার কথা কি তোর মনে নেই?"

তার এই আবেগ-কম্প্র প্রশ্নে আমার চোখের সামনে হঠাৎ নেচে ওঠে বারো বছর আগেকার কোনো এক পুরোনো পরিবেশ। চোখে চোখ রেখেই মৃদুকম্পিত কণ্ঠে আমিও বলি:

—"বীণাদি! তোমাকে, তোমাকে আমি ভুলে যাবো—এও কি সম্ভব?"

আমার এ-কথা শুনে বীণাদি এবার নিঃশব্দেই হেসে ওঠে। এ-হাসির তুলনা নেই। গাঁয়ের নির্জন মাঠে ধানের শীষে শীষে অলক্ষ্যেই যে সোনালী আভা স্নিগ্ধ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে অঘ্রাণের ঊষায়—সম্ভবতঃ তার সঙ্গেও কোনো তুলনা হয় না এ-হাসির। এ-হাসি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আজ তার চোখের কোণে কালি জমেছে। ললাটে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একাধিক রেখা। মাথার চুল শুকনো, এলোমেলো। পরনে আধ-ময়লা একখানা সাধারণ শাড়ি। তার সব-কিছুর মধ্যেই একটা পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। অথচ কী আশ্চর্য, আজও কোনো পরিবর্তন আসে নি তার হাসিতে, পরিবর্তন নেই তার কথায় এবং পরিবর্তন ঘটেনি তার মনটিতেও। আমি তার দিকে তাকিয়ে বেশ খানিকক্ষণ বিহ্বল হয়ে থাকি। তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে বীণাদিকেই আবার পাল্টা প্রশ্ন করি:

—"আজ এত দিন পরে এভাবেই তোমার সাক্ষাৎ পাবো—স্বপ্নেও ভাবি নি বীণাদি! তুমি কি আজকাল কলকাতাতেই থাকো?"

বীণাদি এ-কথার জবাব দেয় হাসতে হাসতেই:

—"না রে। কলকাতায় আমি থাকি না, থাকি ব্যাণ্ডেলে।

তবে রোজই প্রায় কলকাতায় আসতে হয়। এখন আবার ব্যাণ্ডেলেই ফিরে যাচ্ছি। চল্‌ হাঁটতে হাঁটতে চৌরঙ্গী পর্যন্ত যাওয়া যাক। আমি ওখান থেকেই হাওড়ার ট্রাম ধরবো।"

আমি নিঃশব্দেই হাঁটতে শুরু করি বীণাদির পাশাপাশি।

তার নির্মল সান্নিধ্যে স্মৃতির পাড়ায় আবার ভীড় ক'রে আসে অনেক কাল আগের পুরোনো দিনগুলি ঃ

জলপাইগুড়ি একটি ছোটো-খাটো সাজানো শহর। এর পূর্ব প্রান্তে আপন লাবণ্যে লাবণ্যময়ী তিস্তা। পশ্চিম প্রান্ত থেকে শহরের বুক চিরে তিস্তায় এসে মিলিত হয়েছে আরেকটি ছোটো নদী। এ-নদীর নাম করলা। করলা নদীর উত্তর তটের পাড়ায় বসবাস করতো বীণাদিরা। আমিও সেই পাড়ারই ছেলে। বীণাদি

যখন ফ্রক প'রে স্কুলে যাতায়াত করতো—তখন আমিও অনেক ছোটো এবং তখন থেকেই তার সঙ্গে আমার সদ্ভাব। কেবল আমি নই, আমার মত ছোটদের প্রত্যেকেরই প্রিয় ছিল বীণাদি তাকে ছাড়া আমাদের দিন কাটতো না, খেলাধূলা জমতো না। অতি ছোটোকাল থেকেই সে ছিল অত্যন্ত কোমলহৃদয়া এবং নম্রস্বভাবা। তাকে কেউ কোনোদিন রাগ করতে দেখেনি। তার অনুপম ঠোঁট দুটিতে সব সময়ই জেগে থাকতো হাসি এবং সে-হাসির নিষ্কলঙ্ক মুকুরেই প্রকাশ হয়ে পড়তো তার সুন্দর মনটি। তাই কেবল ছোটোদের কাছে নয়, বড়োদের কাছেও সে ছিল অত্যন্ত স্নেহভাজন। পাড়ার নিষ্কর্মা বুড়ো-বুড়িরাও আনন্দে মুখর হয়ে উঠতো তার সান্নিধ্য লাভে। কারণ সমগ্র পাড়ার মধ্যে সে ছিল সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

বীণাদি যখন ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরতে সুরু করে এবং দেখতে দেখতে আমরাও বড়ো হয়ে উঠি—তখনো আমাদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। তখনো বীণাদির সঙ্গে আমরা অবাধেই মেলামেশা করতাম। বড়ো হয়ে, আমাদের প্রতি বীণাদির স্নেহ যেন আরও বেশি গাঢ় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্র জয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী, এমন কি পূজা-পার্বণের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বীণাদিই থাকতো পুরোধা। তাকে ঘিরেই জ'মে উঠতো আমাদের উৎসব, সাড়া পড়তো আনন্দের।

আমার জীবনের সঙ্গে বীণাদির জীবনের একটা বিশেষ মিল ছিল। বীণাদি ছিল পিতৃ-মাতৃহীনা। ও-পাড়ায় তার কাকার বাড়ীতে থেকেই সে মানুষ হচ্ছিল। আর আমিও শিশুকালেই আমার মা-বাপকে হারিয়ে, ও-পাড়াতেই কোনো এক পরিচিত পরিবারে আশ্রয় নিয়ে লেখাপড়া শিখছিলাম। হয়তো এ-কারণেই

আমার প্রতি বীণাদির স্নেহ ছিল অপরিসীম এবং আমারও একটা বিশেষ টান ছিল বীণাদির প্রতি। তাছাড়া আরও একটা কারণ ছিল। বীণাদির বয়স যখন আঠারো কিম্বা উনিশ, আমার বয়স তখন পনেরো। সেই সময় আমি একবার চিকেন পক্সে আক্রান্ত হই। গায়ে গুটির প্রকাশ দেখে কেউ আমার কাছে ভেড়ে না। আমি প'ড়ে থাকি বাইরের ঘরে। আর অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে থাকি দিনরাত। যে-বাড়ীতে ছিলাম—সে-বাড়ীর লোকেরা আমার এ-আর্তনাদ সেদিন শুনেও শোনেনি। এমন কি বন্ধু-বান্ধবদের কানেও পৌঁছয় নি আমার সেই তীব্র হাহাকার। কানে পৌঁছয় কেবল একজনের, সে বীণাদি। খবর পেয়েই সে ছুটে আসে, নির্ভয়ে বসে আমার বিছানার পাশে। তারপর দীর্ঘ পনেরো দিন এক নাগাড়ে শুশ্রূষা ক'রে আমাকে নিরাময় ক'রে তোলে। এজন্য বীণাদিকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয় তার কাকার কাছে। শুধু তাই নয়, আমাকে ওভাবে শুশ্রূষা করার ব্যাপারটা অনেকের চোখেই সে-দিন অশোভন ঠেকে এবং একটা মুখরোচক আলোচনার সূত্রপাত ঘটে পাড়ার মধ্যে। বিশেষ ক'রে এ-জন্যেই তার কাকা আরও বেশি ক্ষেপে যায় এবং দিন-কয়েকের মধ্যেই বীণাদির বিয়ের ব্যবস্থা করে কোনো এক রেল-কর্মচারীর সঙ্গে। বীণাদি কোনো আপত্তি করে না। কাকার সব ব্যবস্থাই সে মেনে নেয় নীরবে।

বীণাদির বিয়ে যেদিন সুসম্পন্ন হয়, ঠিক সেদিনই একটা চাপা গুজব রটে পাড়ায়ঃ বীণাদির স্বামী নাকি মদ্যপায়ী এবং দুশ্চরিত্র। এ-কথা বীণাদির কানেও ওঠে। কিন্তু বীণাদি কোনো ভ্রূক্ষেপ করে না। পাড়া থেকে সে নিঃশব্দেই চ'লে যায় তার স্বামীর সঙ্গে। যেদিন যায়—সেদিন ঘোমটার আড়াল থেকে

একবার বুঝি তাকিয়েছিল আমার দিকে, বুঝি ইশারায় কাছে ডেকে আমার ভেজা চোখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলেছিল :

—"ছিঃ, ছেলে-মানুষী করিস নে। আমি তো আবার আসবোই।"

কিন্তু বীণাদি আর আসে নি। কিম্বা এলেও আমি আর তার খবর পাই নি। কারণ সে-বছরেই আমি জলপাইগুড়ি ছেড়ে চ'লে আসি কলকাতায় এবং কলকাতাতেই বসবাস করতে থাকি স্থায়ীভাবে।

দীর্ঘ বারো বছর পর আজ আবার আকস্মিকভাবেই কাছে পেলাম আমার বীণাদিকে। ধর্মতলা ষ্ট্রীটের ফুটপাথ ধ'রে এগিয়ে চলেছি পাশাপাশি। পেছনে-পেছনেও পাশাপাশি এগিয়ে আসছে আমাদের উভয়ের ছায়া। চলতে চলতে বীণাদি আমার মুখের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে, আর বলছে তার ছেলের কথা। তার একটি ছেলে আছে। বয়স নয় বছর; ভারি নাকি দুরন্ত হয়েছে ছেলেটা।

কথা প্রসঙ্গে আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করি :

—"বীণাদি, তোমার স্বামী কেমন আছেন?"

সে নির্বিকার ভাবেই উত্তর দেয় :

—"জানি না।"

—"জানো না? তার মানে?"

—"মানে সহজ। সে আমার কাছে থাকে না। যেবার সে আমাকে নিয়ে ব্যাণ্ডেল বদলী হয়ে আসে, ঠিক সেবারই তার জীবনে এসে জোটে আরেকটা মেয়ে। আজকাল সেই মেয়েটাকে নিয়েই সে বসবাস করছে বর্ধমানে। আর আমি আমার ছেলেকে নিয়ে পড়ে আছি ব্যাণ্ডেলেই।"

বীণাদি এই কথাগুলো অতি সহজভাবেই ব'লে যায়। যেন আমার কাছে তার কিছুই বলার বাধা নেই। আমি অতি-মাত্রায় বিস্মিত হয়ে বলি :

—"তিনি কি আবার বিয়ে করেছেন ?"

—"আমাকে ডাইভোর্স না ক'রে আইনতঃ আরেকটা বিয়ে সে করতে পারে না। তাই সম্ভবতঃ বিয়ে আজও করে নি। তবে তারা স্বামী-স্ত্রীর মতোই থাকে।"

—"তোমাকে খরচ দেয় ?"

—"খরচা ? আইনের সাহায্য নিয়ে তা হয়তো আদায় করতে পারি। কিন্তু যে-ব্যক্তি আমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয় না, তার কাছ থেকে খরচা নিয়ে নিজেকে ছোটো করবো কেন ?"

—"তাহলে তুমি চলছো কি ক'রে ?"

—"কেন ? রোজগার করছি। সে-জন্যেই তো কলকাতায় যাতায়াত করি রোজ।"

এ-কথা বলেই বীণাদি চুপ ক'রে যায়। আমার মনে হলো : আজ বারো বছর পর তাকে কাছে পেয়েও আনন্দ পাওয়া গেল না। কারণ আমার সমস্ত মন ভ'রে ওঠে এক অপরিসীম বেদনায়। চলতে চলতে আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে একবার তাকাই। তারপর বলি :

—"তাহলে বারো বছর আগে বিয়ের দিন তোমার স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে পাড়ায় যে-গুজব রটে, আজ মনে হচ্ছে তা সত্য।"

আমার এ-কথার পর কেন জানি না, বীণাদি সহসা গম্ভীর হয়ে ওঠে। হয়তো এ নিয়ে বেশি জের টানার ইচ্ছে তার নেই। তাই পরক্ষণেই কথার মোড় ঘুরিয়ে সে বলে :

—"আমি রোজই প্রায় আর্ট কলেজে আসি। ওখানে এলেই আমাকে পাবি। আসবি তো ?"

—"নিশ্চয়ই আসবো। তুমি কি আর্ট কলেজে ছবি আঁকা শিখছো ?"

—"ছবি আঁকা শিখবো কি রে ? ছবি আঁকা শিখতে হলে তো আর্টকলেজকেই পয়সা দিতে হয়। আমি আর্ট কলেজ থেকে পয়সা নিই।"

—"তাহলে কি ছাত্র-ছাত্রীদের ছবি আঁকা শিখাও ?"

—"ছবি আঁকা শিখলাম কবে যে ছবি আঁকা শিখাবো ?"

—"তবে আর্ট কলেজে কী করো তুমি ?"

আমার এই অতি উৎসুক প্রশ্নে বীণাদি এবার সশব্দে হেসে ওঠে। তারপর হাসতে হাসতেই বলে ঃ

—"তুই দেখছি এখনও সেই ছেলেমানুষই রয়ে গেছিস। আমার এত কথার পরেও কি বুঝতে পারছিস না—ওখানে আমি কী করি ? আমি আর্ট কলেজের মডেল। দৈনিক দুটাকা ক'রে পাই। মাসে এ-ভাবেই আমার রোজগার হয় পঞ্চাশ, ষাট টাকা এবং তা দিয়েই আমি আমার সংসার চালাই, বুঝলি ?"

আর্ট কলেজের মডেল ! যেন প্রচণ্ড আঘাতে দেহের সমস্ত রক্তচাপ আমার থেমে যায়।.........

আমরা এসপ্লানেডে এসে পড়েছি। বীণাদি ধীরে ধীরে ট্রাম লাইনের কাছে এসে দাঁড়ায়। আমি নিঃশব্দে এগিয়ে আসি পাশে। আমার জিভ দিয়ে যেন কোনো কথাই স'রছে না। তবু অতি কষ্টে একবার বলি ঃ

—"বীণাদি, দৈনিক মাত্র দু'টাকার জন্যেই তুমি আজ আর্ট কলেজের মডেল ?"

তেমনি নির্বিকার ভাবেই সে উত্তর দেয় ঃ

—"কি আর করি বল! আমার মত অশিক্ষিতাকে কেউ চাকুরী দেবে না। স্বামী বিরূপ, ছেলে নাবালক। এ-পথ ছাড়া আমার আর উপায় কি? তবু তো রোজগার একটা হচ্ছে।"

এমন সময় হাওড়ার ট্রাম আসে। বীণাদি ট্রামে উঠতে উঠতেই আবার বলে ঃ —"ছেলে একা আছে। আজ চলি। তুই আর্ট কলেজে আসিস কিন্তু।"

এ-কথা বলেই সে ট্রামে উঠে গ্রহণ করে আসন। তারপর জানালা দিয়ে আমার দিকে তাকায়। তার শুকনো ঠোঁটের ক্লান্ত বৃন্তে আবার ফুটে ওঠে সেই হাসির ফুল—যার তুলনা নেই।

ট্রাম চলতে থাকে। সেদিকে তাকিয়ে আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি খানিকক্ষণ। তারপর চোখ তুলতেই দেখি ঃ আমার মাথার ওপর থমকে আছে শরতের সুন্দর আকাশ। তার সমস্ত অবয়বে ছড়িয়ে পড়েছে অস্তগামী সূর্যের আরক্ত বেদনা।

রবীন্দ্র জয়ন্তী

সমগ্র কলকাতায় কবিগুরুর জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপনের আয়োজন চলছে। সাড়া পড়েছে পাড়ায় পাড়ায়। যাঁরা সংস্কৃতিবান—তাঁদের লেখনী আজ কথা বলছে নতুন ভাষায়। শিল্পী ও শিল্প-রসিকদের মধ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে এবং যুবকগোষ্ঠীর মধ্যেও জেগেছে এক নতুন কর্মচাঞ্চল্যের প্রেরণা। মনে হচ্ছে: যেন জাতীয় জীবনের এক মহান উৎসব আজ আসন্ন। তাই প্রচণ্ড বৈশাখেও নতুন বেশে অপরূপ হয়ে উঠছে মহানগরী এবং তার দিকে তাকিয়েই চির নতুনেরে আহ্বান জানাচ্ছে গোধূলির এয়োতি আকাশ।

এবার আমাদের দক্ষিণ পাড়ার যুবকরাও মেতে উঠেছে। গুরুদেবের জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে তারা পাড়াতেই ব্যাপকভাবে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে ব'লে সবাই বিশেষ উদ্যোগী। তাই আজ সভা ডাকা হয়েছে। এ-সভাতেই গ্রহণ করা হবে আগামী উৎসবের কর্মসূচী এবং সেই সঙ্গে স্থির করা হবে উৎসবের অনুষ্ঠান-সূচীও।

আমিও এই পাড়ার বাসিন্দা। যুবকদের সঙ্গে আমারও মেলামেশা আছে। তাই তাদের ডাকে আজ আমিও এসে যোগ দিয়েছি সভায়। আমি বিশিষ্ট কেউ নই। আমি কেবল শ্রোতাই অথবা ভীড় বাড়ানোর দলে। ভীড়ে হারিয়ে গিয়েই সভাটার এক কোণায় আমি ব'সে পড়েছি নিঃশব্দে।

সভাটা কিন্তু কোনো ঘরে বা দরদালানে অথবা কোনো বাড়ীর উঠোনে ব'সেনি, বসেছে রাস্তায়। কারণ এ-পাড়ার বয়স্ক

সমাজ যুবকদের বিশেষ ভালো চোখে দেখেন না। যুবকরা নাকি দিনরাত কেবল রকে ব'সে আড্ডা দেয়। রকে বসেই বিভিন্ন চিত্রাভিনেত্রীর চরিত্র বিশ্লেষণ করে এবং অশ্লীল আলোচনার মধ্যে মশগুল হয়ে সময় কাটায়। মাঝে মাঝে গুণ্ডামি, ইতরামিও নাকি তারা করে। অতএব এ-সমস্ত যুবকের দ্বারা পাড়ায় কোনো ভালো কাজ হতে পারে—এ-ধারণা বয়স্ক সমাজের নেই। তাই যুবকদের এই সভা করার জন্য কোনো ঘর, দরদালান বা বাড়ীর

কোনো উঠোন তারা ছেড়ে দেয়নি। যুবকেরা তাই বাধ্য হয়েই নেমে এসেছে রাস্তায়। দুইদিকে ঘন বাড়ী; মধ্যে ছায়াযুক্ত একটা সরু গলি। এ-গলিতে কোনো যানবাহনের যাতায়াত নেই। এমন কি, পায়ে-হাঁটা লোকজনও বড় একটা চলাফেরা করে না। তাই গলিটা প্রায় সব সময়ই নিরিবিলি থাকে বলেই যুবকরা আজ সভা ডেকেছে এখানেই।

সভার পরিচালনা করছে কলেজে পড়া একটি যুবক।

এ-ব্যাপারে তারই উৎসাহ বেশি। সে-ই প্রথম সবাইকে উদ্দেশ ক'রে বলে ঃ

—"রবীন্দ্র জন্ম-জয়ন্তীর বিরাট তোড়জোড় চলছে কলকাতার সর্বত্রই। এবার যদি আমাদের পাড়াতেও আমরা কিছু না করি, তাহলে শিক্ষিত সমাজের কাছে আমরা আর মুখ দেখাতে পারবো না। যেভাবেই হোক, আমাদেরও কিছু করতে হবে। এসো সবাই আলোচনা ক'রে ঠিক করি—কী করা উচিত।"

যুবকটির এ-কথার পর সভায় প্রথমতঃ গুঞ্জনধ্বনি, তারপর গুঞ্জনধ্বনির পর কথা কাটাকাটি এবং কথা কাটাকাটির পর শেষে ঝগড়াঝাটিও স্থুরু হয়। তবে সবশেষে সবাই একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছয়। সেটা হলো এই যে, পাড়ারই কোনো মাঠে প্যাণ্ডেল তৈরী ক'রে অনুষ্ঠান করা হবে। অনুষ্ঠানে একটি নাটক, একটি নৃত্যনাট্য এবং বিখ্যাত শিল্পীদের দ্বারা কিছু গান ও আবৃত্তি পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকবে। তাছাড়া রবীন্দ্র-সাহিত্যে যাঁরা বিশেষভাবেই বিশারদ, এমন দু'একজন সাহিত্যিক বা কবিকে আনা হবে আলোচনা করার জন্য।

এ-সিদ্ধান্ত নেয়ার পরই যাবতীয় খরচের হিসেব করা হয়। হিসেবে দেখা যায়ঃ নাটক, নৃত্যনাট্য ও বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পীদের বাবদ খরচা হবে প্রায় পাঁচশ' টাকা এবং তিনশ টাকার মতো খরচ হবে প্যাণ্ডেল তৈরী করতে। তাছাড়া মঞ্চসজ্জা, আলো এবং মাইক বাবদ প্রয়োজন হবে আরও দু'শ' টাকার। সব মিলিয়ে প্রথমতঃ হাজার খানেক টাকার দরকার।

কাজটা খুব কঠিন নয় এবং টাকার পরিমাণও বেশ সামান্যই বলা চলে। অতএব আজ থেকেই কাজে নামা হোক, এ-মত প্রকাশ করে সবাই।

কিন্তু এ-মত প্রকাশ করার ঠিক পরক্ষণেই সভার শেষ প্রান্ত থেকে ভেসে আসে অন্য একটি যুবকের কণ্ঠ। এ-যুবকটি এতক্ষণ শান্তভাবেই ব'সে ছিল। এ-পর্যন্ত সে একটিও কথা বলেনি। এবার সভার কাজ প্রায় সমাপ্তির সীমায় এসে ঠেকেছে দেখেই সে উঠে দাঁড়ায়। তারপর বলে ঃ

—"হাজার-খানেক টাকা সামান্য হলেও, এ-টাকা আসবে কোত্থেকে—তা' কেউ ভেবেছ কি ?"

সভার পরিচালক এ-কথার উত্তর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেয় ঃ —"কেন ? পাড়া থেকেই তুলবো। আমাদের পাড়ার প্রায় প্রত্যেকেরই অবস্থা ভালো। বেশির ভাগ লোকেরই নিজের বাড়ী-গাড়ী আছে। এমন একটা ভালো কাজে এ-টাকাটা তাঁরাই জোগাবেন।"

এ-কথার পর শেষ প্রান্তের যুবকটি আবার বলে ঃ

—"কিন্তু পাড়ার বয়স্করা আমাদের খুব ভালো চোখে দেখেন না। আমাদের দ্বারা কোনো ভাল কাজ হতে পারে—এ-কথাও তাঁরা বিশ্বাস করেন না। সুতরাং তাঁরা যে এ-ব্যাপারে আমাদের চাঁদা দেবেন—এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। যদি তা' থাকতো তাহলে আজকের এই সভা আমাদের রাস্তায় বসাতে হতো না।"

যুবকটির এ-কথার পর এবার কিন্তু সত্যই একটা থমথমে নিস্তব্ধতা নেমে আসে সমগ্র সভায়। দীর্ঘ নিস্তব্ধতার পর ধীরে ধীরে জেগে ওঠে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি। হয়তো সবাই মনে মনে ভাবে ঃ যুবকটির কথা মিথ্যা নয়। পাড়ার লোক যেখানে বিরূপ, সেখানে এমন একটা পরিকল্পনা সার্থক হতে পারে না।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে সেই কলেজে পড়া যুবকটি, অর্থাৎ সভার পরিচালক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলে :

—"তাহলে আমাদের সব পরিকল্পনাই কি ভেস্তে যাবে ? এ-পাড়ায় কবিগুরুর জন্ম-জয়ন্তী পালন করার কোনো উপায়ই কি নেই ?"

এবার সভার আরেক প্রান্ত থেকে অন্য আরেকটি যুবকের কণ্ঠ ভেসে আসে। সে ভিন্ন পাড়ার একজন বিশেষ বিত্তশালী ব্যক্তির নাম উল্লেখ ক'রে বলে :

—"ওই ব্যক্তিকে আমরা যদি অনুষ্ঠানের সভাপতি ক'রে নিয়ে আসি, তাহলে খরচের টাকাটা হয়তো তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে।"

সভার পরিচালক উক্ত যুবকটির এ-কথার প্রতিবাদ ক'রে বেশ দৃঢ়স্বরেই খানিকক্ষণ বক্তৃতা ঝাড়ে :

—"না, তা হতে পারে না। ওই ব্যক্তি ধনী হতে পারেন, কিন্তু জ্ঞানী নন। রবীন্দ্রনাথ তিনি পড়েননি এবং সাহিত্যের ধারে-কাছেও তিনি আসেননি কোনোদিন। অতএব এমন একটা উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁকে সভাপতির পদে বরণ করা কোনোক্রমেই উচিত হবে না। তাছাড়া তাঁকে সভাপতি করলেও, তিনি যে অনুষ্ঠানের সব খরচই বহন করবেন—তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ প্রথমে তাঁর কাছে আমরা টাকা চাইতে পারবো না। তাঁকে আমরা অনুষ্ঠানের সভাপতি করবো—এ-প্রস্তাবটাই প্রথমতঃ তাঁর কাছে পেশ করতে হবে। তারপর তিনি রাজী হলেই আমরা হয়তো পরে একদিন তাঁর কাছে গিয়ে চাঁদা চাইতে পারি। কিন্তু তখন তিনি খরচের সব টাকাটাই চাঁদা হিসেবে দেবেন বা তাঁকে দিতে হবে—এমন কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। হয়তো মাত্র

পঞ্চাশটা টাকা ঠেকিয়ে দিয়েই তিনি আমাদের বিদায় করবেন। তখন ওই পঞ্চাশ টাকা আমাদের অনুষ্ঠানও হবে না, আর তাঁকেও সভাপতির পদ থেকে বাদ দিতে পারবো না। তার চাইতে এ-পাড়ায় আর রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন ক'রে কাজ নেই।"

পরিচালকের এ-বক্তৃতার পর অনেকেই সমস্বরে ব'লে ওঠে :

—"হাঁ, হাঁ, তাই ঠিক। এ-পাড়ায় কিছু হবে না। আমরা এ-পাড়ায় কিছু করতে চাই না।"

সভা ভঙ্গ হয়। চোখে-মুখে দারুণ একটা হতাশার ভাব ফুটিয়ে, উঠে দাঁড়ায় সবাই। ঠিক এমন সময় আকস্মিকভাবেই একটা ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ কোনো এক পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর ওপরতলা থেকে হঠাৎ একটা কাগজের মোড়ক এসে ছিটকে পড়ে যুবকদের সামনে। যুবকদের কেউ একজন ছুটে গিয়েই তা' কুড়িয়ে নেয় এবং দ্রুত আঙ্গুল চালিয়ে তার ভাঁজ খোলে। খুলতেই মোড়কটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে আস্তো এক শ' টাকার একখানা নোট এবং সেই সঙ্গে ভাঁজ করা একখানা ছোট্ট চিঠি। চিঠিতে লেখা আছে :

"তোমাদের সবাই বলে উচ্ছৃঙ্খল। আজ পর্যন্ত কোনো ভালো কাজ করনি। মনে হচ্ছে, এতদিনেই তোমরা একটা ভালো কাজে হাত দিতে চাইছো। প্রার্থনা করি : এ-কাজের মাধ্যমেই তোমাদের মনের গতি পরিবর্তিত হোক। হতাশ হবার কারণ নেই। ভালো কাজে পাড়ার সবাই তোমাদের সঙ্গে থাকবে। আমিও তোমাদের প্রাথমিক কাজের জন্য এক শ' টাকা চাঁদা দিলাম।"

ইতি—

তোমাদের মাসীমা।

আশ্চর্য! কে এই মাসীমা, এবং কোন্ বাড়ী থেকেই বা মোড়কটা হঠাৎ এসে পড়লো—তা কেউ বুঝতে পারলো না। কেবল প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ অভিভূত বিহ্বল দৃষ্টি তুলে ধরলো পর পর সাজানো বাড়ীগুলোর ওপরতলার দিকে।

খানিকবাদে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলো সভার সেই পরিচালক। সে এবার চিঠিটা নিজের হাতে নিয়েই, সবাইকে উদ্দেশ ক'রে বেশ উত্তেজিত কণ্ঠেই ব'লে উঠলো ঃ

—"আমি তো আগেই বলেছিলাম, এমন একটা ভালো কাজে পাড়ার প্রত্যেকেরই সহযোগিতা আমরা পাবো। সত্যই তো, আজ পর্যন্ত পাড়ায় কোনো ভালো কাজ আমরা করেছি কি?"

ঘটনাটা অভাবনীয়, কিন্তু সুন্দর এবং সুন্দর সেই অজানা মাসীমা—যিনি আজ আড়ালে থেকেও,সম্পূর্ণ জয় ক'রে নিলেন দুর্জয় যুবকদের।

———

অনিকেত

গলিটার গা-ঘেঁষেই বস্তির যে-বেওয়ারিশ ঘরটা দাঁড়িয়েছিল এতদিন, আজ তা ভেঙে ফেলা হয়েছে জমিদারের নির্দেশে। খোলা আকাশের নিচে কেবল প'ড়ে আছে তার উলঙ্গ ভিটেটা। মাথার ওপরে কোনো আচ্ছাদন না থাকলেও, এই ভিটেটারই বুকে উনোন জ্বেলে হাঁড়ি চড়িয়েছে একটা বুড়ি। বুড়ির পাশেই হাঁটুর ওপর হাত রেখে অকাতরে ঝিমোচ্ছে বুড়োটা। ওদের জোড়া মাথায় রুক্ষ-ধূসর চুল উত্তুরে হাওয়ায় উড়ু উড়ু। উড়ু-উড়ু চুলের মতোই উনোন বেয়ে আকাশে উঠছে ধুঁয়ো। ধুঁয়োয় দেহ ভাসিয়ে আরামে দোল খাচ্ছে শীতের রোদ। রোদটা ভারি মিষ্টি।

ভিটেটার আরেকদিকে খানিকটা জায়গা জুড়ে গোল হয়ে বসেছে একদল ছেলে-ছোকরা। অবশ্য এদের মধ্যে একটা মেয়েও আছে। দেহ প্রায় প্রত্যেকেরই উলঙ্গ। চোখে-মুখে নিদারুণ দৈন্যের ছাপ। বয়স এদের বারো থেকে পনেরোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এরা আজ সবাই মিলে জুয়ো খেলছে নিশ্চিন্তে। পুঁজি এদের বেশি নয়। প্রত্যেকের কাছেই কিছু কিছু নয়া পয়সা মাত্র সম্বল। তবু এরা খেলছে। সামান্য দিয়েই সামান্য জয়ের আশা এদের।

বেশ খানিকক্ষণ বাদে দলের মধ্য থেকে হঠাৎ একটা ছেলে খেলা ছেড়ে দেহ টান ক'রে উঠে দাঁড়ায়। সে দাঁড়াতেই ব'সে থাকা ছেলেদের একজন ব'লে ওঠে :

—"কিরে মণ্টু, তুই কি ফতুর হয়ে গেলি ?"

এই ছেলেটার নাম তাহলে মণ্টু। মণ্টু ও-কথার কোনো জবাব না দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসে রাস্তায়। তারপর একটা লাইট পোষ্টের গায়ে হেলান দিয়ে ব'সে পড়ে। মনে হয়ঃ তার কাছে যা ছিল, সবই সে দিয়ে এসেছে জুয়োর আড্ডায়। এখন সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব। বেদনায় থমথমে তার ধূলি-মলিন মুখ। চোখ ছুটো বিস্ফারিত দিগন্তের দিকে এবং এক মাথা ঝাঁকড়া চুল এলোমেলো হাওয়ায়। সে কেবল ভাবছে আর ভাবছে। কিন্তু কী ভাবছে—তা হয়তো সে নিজেও জানে না।

ওদিকে আড্ডা তখনো সমানেই চলছে। নয়া পয়সার ক্লান্ত আওয়াজেই ক্ষণে ক্ষণে চাঙ্গা হয়ে উঠছে প্রত্যেকের মন। দলের মধ্যে মেয়েটাও রয়েছে এবং জুয়োর নেশায় বুঁদ হয়ে গেছে সে'ও।

হঠাৎ এক সময় মেয়েটারই গলার আওয়াজ শোনা যায়। দলের সবাইকে সে অনুনয় ক'রে বলছেঃ

—"দেখো ভাই, আমার সব গেছে। আর এক পয়সাও নেই। দয়া ক'রে এবারের দানটা আমাকে বাকি খেলতে দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে দলের একটা ছেলে খেঁকিয়ে ওঠেঃ

—"বাকি? জুয়ো খেলায় আবার বাকি হয় নাকি? তুই উঠে যা।"

মেয়েটা তবুও বারকয়েক কাকুতি-মিনতি করে। কিন্তু প্রতিদানে ফিরে পায় কেবল কড়া কড়া ধমক। তাই সে উঠে পড়ে মুখ কালো ক'রে। তারপর ছুটে যায় ভিটেটার দক্ষিণ প্রান্তে—যেখানে ইতঃস্তত ছড়িয়ে আছে কয়েকটা বস্তা, কিছু ছেঁড়া চট এবং গোটাকয় ময়লা কাপড়ের পোঁটলা। মেয়েটা মাঝারি রকমের একটা পোঁটলা টেনে নিয়ে খোলে। তারপর বেশ খানিকক্ষণ ধ'রে হাতড়াতে হাতড়াতে পোঁটলা থেকে বের করে

একটা রূপোর বালা। বালাটা হাতের মুঠোয় চেপে পোঁটলাটা সে খোলা অবস্থাতেই সরিয়ে রাখে পাশে। তারপর সেখান থেকে উঠেই সে এক ছুটে নেমে আসে রাস্তায়। সেই ছেলেটা, অর্থাৎ মন্টু লাইট পোষ্টে হেলান দিয়েই চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে :

—"এ্যায় বুধনী, কোথায় যাচ্ছিস ?"

মেয়েটা ফিরে তাকায়। তারপর বালাটা দেখিয়ে বলে :

—"যাচ্ছি এটা বিক্রী করতে। আমার সব গেছে। এটা বিক্রী ক'রে আবার খেলবো। আমার পয়সাগুলো ফেরাতে হবে।"

এ-কথা বলেই মেয়েটা রাস্তা ধ'রে ছুটতে শুরু করে। মন্টু মুহূর্তেই কী যেন ভাবে। তারপর লাফ দিয়ে সে'ও উঠে দাঁড়ায় এবং ছুটে গিয়ে হাত ধরে মেয়েটার। মেয়েটাকে সে টানতে টানতে নিয়ে আসে লাইট পোষ্টের কাছে। তারপর বলে :

—"যা গেছে—তা যাক্। বালাটা বিক্রী করলে বালাটাও যাবে। আজ আর খেলে কাজ নেই। তুই এখানে বোস।"

মেয়েটা জোর ক'রে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে এবং বলে :—"তুই আমাকে ছেড়ে দে, ছেড়ে দে আমাকে।"

মন্টু ধমক দিয়ে বলে :—"না"।

মেয়েটা এবার উপায়-গতিক না দেখে এক হাতে এলোপাথাড়ি কিল-ঘুষি চালাতে থাকে মন্টুর বুকের ওপর এবং ওভাবেই আবার বলে :

—"তুই আমাকে ছেড়ে দে বলছি, ছেড়ে দে। বালাটা বিক্রী ক'রে আমি আবার খেলবো। ওরা আমার সব পয়সা নিয়ে নিয়েছে।"

মন্টুও এবার সজোরে একটা কিল মারে মেয়েটার পিঠে।

তারপর একহাতে তার চুলের মুঠি ধ'রে তাকে জোর ক'রে বসিয়ে দেয় লাইট পোষ্টটার পাশে। নিজেও বসে। মেয়েটা এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। মণ্টু মেয়েটার সঙ্গে আর কোনো কথা না ব'লে রক্তবর্ণ চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। এময় সময় অন্য দিক থেকে ওদের সামনে এসে দাঁড়ায় অন্য একটা ছেলে। ছেলেটা জুয়োর আড্ডার দিকে চোখ ফেরাতেই বেশ খুশি হয়ে ওঠে এবং ছেঁড়া শার্টের পকেটে হাত চালিয়ে বের করে কিছু খুচরো পয়সা। মণ্টু তা লক্ষ্য করেই চড়া গলায় ধমক দিয়ে ওঠে ছেলেটাকে :

—"ভাগ শালা এখান থেকে। পয়সা কামড়াচ্ছে বে তোকে। দেবে শালা একদম ফকির বানিয়ে। ভালো চাসতো পালা।"

মণ্টুর কথায় ছেলেটা বেশ একটু ঘাবড়ে গেলেও, পরক্ষণেই আবার নিজেকে সামলে নেয় এবং মণ্টুকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই ছুটে যায় আড্ডাটার দিকে। সেদিকে তাকিয়ে মণ্টু আরেকবার বলে :

—"তবু শালা মরতে চল্লি ? মরগে যা। আমার কী!"

ওই ছেলেটাকে জুয়োর আড্ডার দিকে যেতে দেখেই মেয়েটা আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং এক সময় মণ্টুর অলক্ষ্যেই উঠে রাস্তা ধ'রে আরেকবার দৌড় মারে প্রচণ্ডবেগে। কিন্তু বেহুঁস হয়ে দৌড়তে গিয়েই সজোরে একটা ধাক্কা খায় পথচারী একজন ভদ্রলোকের গায়ে। ভদ্রলোক বোধকরি সদ্য পাট ভাঙা জামা-কাপড় প'রে কোনো এক বিশেষ কাজে বেরিয়েছিলেন। রাস্তার ধারে জ'মে ছিল নোংরা জল। আচমকা ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ পা পিছলে তিনি প'ড়ে যান সেখানেই। ফলে তার ধোপায় কাচা জামা-কাপড়, ধুলো-কাদায় একাকার হয়ে যায়। রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি উঠে দাঁড়ান। তাঁর দিকে তাকিয়ে মেয়েটা

ভয় পায়। ভয়ে সে পিছিয়ে আসে আবার মণ্টুর কাছে। লোকটাও এগিয়ে আসে ঘুষি বাগিয়ে। মণ্টু অবস্থাটা বুঝতে পেরেই মেয়েটাকে আড়াল ক'রে দাঁড়ায়। তারপর ভদ্রলোককে হাতজোড় ক'রে বলে ঃ

—"বাবু, দয়া ক'রে মাপ করুন। হঠাৎ লেগে গিয়েছে। ও দেখতে পায়নি।"

ভদ্রলোক যেন রাগে ফেটে পড়েন। সহসা মণ্টুর গালেই একটা প্রচণ্ড চড় মেরে বলেন ঃ —"তুই কে-রে হারামজাদা ? এটা কি তোদের বাপের রাস্তা যে, ইচ্ছে মতো ছুটোছুটি করছিস ?"

হঠাৎ চড় খেয়েই মণ্টুর চোখ-মুখ যেন গরম হয়ে ওঠে। সে'ও জবাব দেয় ঃ

—"রাস্তাটা আমাদের বাপের নয়, আপনারও কেনা নয়'

আপনি যেমন হাঁটছেন, তেমনই আমরাও ছুটোছুটি করছি।"

—"তাই ব'লে অপরের গায়ে ধাক্কা দিয়ে বেড়াবি।"

—"ধাক্কা তো আর ইচ্ছে ক'রে দেয়া হয়নি। হঠাৎ লেগে গিয়েছে।"

ভদ্রলোক এবার দাঁতে-দাঁত চেপে গর্জন ক'রে ওঠেন :

—"চামচিকের বাচ্চা, এতো বড়ো স্পর্ধা তোর? রাস্তার ছেলে হয়ে মুখে মুখে তর্ক করছিস?"

মণ্টুও তেমনই দৃঢ়স্বরে বলে :

—"খবর্দার বাবু রাস্তার ছেলে হলেও আমরা আপনার ঘরের খাই না। ওভাবে গালাগাল দেবেন না।"

ভদ্রলোক যেন নিজেকে আর সামলাতে পারেন না। বিকট স্বরে আরেকবার গর্জন করেই তিনি পা' থেকে খুলে নেন এক পাটি চটি। তারপর তেড়ে ওঠেন মণ্টুর ওপর। মণ্টু এবার প্রস্তুতই ছিল। সুযোগ বুঝেই সে ভদ্রলোকের হাত থেকে ছোঁমেরে কেড়ে নেয় চটিটা এবং ছুঁড়ে ফেলে দেয় খানিকটা দূরে। তারপর বলে :

—"বাবু, আপনি ভদ্রলোক, রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে লাগতে আসবেন না।"

ভদ্রলোক হঠাৎ যেন হতভম্ব হয়ে যান। গোলমাল শুনে জুয়োর আড্ডার ছেলেরাও এসে দাঁড়িয়েছে মণ্টুর পাশে। ভদ্রলোক বার-দুই এদিক-ওদিক তাকিয়ে দূরের ছুঁড়ে ফেলা চটিটা আবার পায়ে পরেন। তারপর দারুণ রাগে গজরাতে গজরাতে উল্টোমুখে ফিরে হাঁটতে থাকেন রাস্তা ধ'রে।

ভদ্রলোক রওয়ানা হতেই দলের একটা ছেলে হঠাৎ ছুটে যায় সেইখানে—যেখানে ভদ্রলোক প'ড়ে গিয়েছিলেন পা পিছলে। ছেলেটা ওখান থেকে কুড়িয়ে নেয় একটা মনিব্যাগ। ব্যাগটা যে

ভদ্রলোকেরই, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি পা' পিছলে পড়ার সময় তাঁর পকেট থেকেই ওটা পড়ে গিয়েছিল। তিনি হয়তো খেয়াল করতে পারেননি।…

ছেলেটাকে ব্যাগটা কুড়িয়ে নিতে দেখেই মণ্টু চিৎকার ক'রে ওঠে ঃ

—"এ্যায়, ভদ্রলোকের ব্যাগটা নিলি যে!'

ছেলেটা উত্তর দেয় ঃ—"হ্যাঁ নিয়েছি। তাতে হয়েছে কি? এর মধ্যে অনেক টাকা আছে। আমরা সবাই ভাগ ক'রে নেবো।"

মণ্টু গর্জন ক'রে ওঠে ঃ—"খবর্দার। জুয়ো খেলিস ব'লে চুরিও করবি নাকি? পরের টাকায় অত লোভ কিসের? ফিরিয়ে দে ওটা।"

লেছেটাও এবার চড়া গলায় বলে ঃ—"না, দেবো না। আমি পেয়েছি। তোর কি?"

"দিবি না? তবে-রে"…

এ-কথা বলেই মণ্টু হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেটার ওপর। তার কণ্ঠনালীটা ধ'রে বার-কয়েক ঝাকানি দিয়েই হাত থেকে কেড়ে নেয় ব্যাগটা। তারপর রাস্তা ধ'রে ছুটতে থাকে সেই-দিকে—যেদিকে ভদ্রলোক যাচ্ছেন। ভদ্রলোক অবশ্য বেশি দূর এগোননি। মণ্টুর ডাক শুনেই তিনি ফিরে দাঁড়ান। মণ্টু তাঁর কাছাকাছি না গিয়ে দূর থেকেই ব্যাগটা ছুঁড়ে দিয়ে বলে ঃ—'আপনার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। আপনি ওটা নিয়ে যান।"

ভদ্রলোক চমকে উঠেই কুড়িয়ে নেন ব্যাগটা এবং কম্পিত হস্তে একবার পরীক্ষা করেন তার ভেতরের টাকা-পয়সা। সব ঠিক আছে দেখে ব্যাগটা তিনি পকেটে রাখেন নিশ্চিন্তে। তারপর অবাক চোখ তুলে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন মণ্টুর

দিকে। কিন্তু মণ্টু ওদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রেই আবার ফিরে আসে দলের মধ্যে। ছেলেরা তখনো দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে উনোন থেকে হাঁড়ি নামিয়ে বুড়িটাও এসে দাঁড়িয়েছে ছেলেদের কাছে। মণ্টুকে দেখেই সে ব'লে ওঠেঃ

—"ইস, তুই কি বোকা রে মণ্টু ?" অমন লোককে ব্যাগটা ফিরিয়ে দিতে আছে ? ওটা ফিরিয়ে না দিলে আমাদের সকলেরই কিছু কিছু হতো !"

মণ্টু এ-কথার কোনো জবাব না দিয়ে বুড়ির দিকে কটমট ক'রে একবার শুধু তাকায়। এমন সময় মেয়েটা অর্থাৎ সেই বুধনী এসে হাত ধরে মণ্টুর। তারপর বলেঃ

—"আমার পোঁটলাতে চিড়ে আর পাটালি আছে, খাবি চল !"

শীতের সারা আকাশ জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে টুকরো টুকরো মেঘ। এ-সমস্ত মেঘ বড়ো নিঃস্ব বড়ো অসহায় এবং ক্ষীণদেহী। এলোমেলো হলেও, এদের গতিবিধি অসুন্দর নয়। অথচ এরা অনিকেত, নির্বাসিত আকাশের অসীম প্রান্তরে। সমুদ্র কি এদের দিকে কোনোদিনও চোখ তুলে তাকাবে না এবং আদর ক'রে ডেকে নেবে না কোলে ?

———

কার্জন পার্কে

এক সময় বাংলাদেশকে কেটে, তার সীমা সংকোচন করেছিলেন লর্ড কার্জন। আর বর্তমান বাংলা সরকার যেন তারই প্রতিশোধ নিয়েছেন কার্জন পার্কের একটা বৃহৎ অংশ ছেঁটে ফেলে। অবশ্য ছাঁটাই অংশের এক্তিয়ার পেয়েছেন তাঁরাই—যাঁরা কার্জন সাহেবেরই উত্তরাধিকারী বা বংশধর। অর্থাৎ ইংরেজ পরিচালিত ট্রাম-কোম্পানীই আজ সে-অংশকে গ্রাস করেছে ব্যবসার খাতিরে। বাকি অংশটুকু আজও কার্জন পার্ক নামেই পরিচিত। যদিও সঙ্কুচিত এর সীমা এবং সৌন্দর্যও অনেকাংশে হতশ্রী, তবু এর আভিজাত্য আজও যায়নি। পার্কের এদিকে-ওদিকে আজও কিছু গাছ আছে—যা ছায়া বিস্তার করে এবং সকালে-সন্ধ্যায় যার ডালে ডালে দোল খায় পাখির অক্লান্ত কূজন। বিভিন্ন অংশে ফুলও ফোটে ওড়িয়া মালির কৃপায়। একদিকে স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কার মূর্তি যদিও ইংরেজ অধ্যায়কেই স্মরণ করিয়ে দেয়, তবু অন্যদিকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির প্রাণবন্ত উদ্ধত মূর্তি বর্তমানেও ঘোষণা ক'রে চলেছে স্বদেশেরই অপরাজেয় শৌর্য।

আজও বিরাম নেই। আজও সব সময় এখানে লক্ষ্য করা যায় সর্বজনের আবির্ভাব। ব্রহ্ম-মুহূর্তের বিশুদ্ধ হাওয়ার লোভে অতি ভোরে আসেন স্বাস্থ্যান্বেষী বন্ধুরা। মধ্যাহ্নে গাছের ছায়ায় এসে বিশ্রাম নেয় শহরাঞ্চলের ভিখারী, শ্রান্ত পথিক ও বেকার যুবক সম্প্রদায়। বিকেলে মরশুমী ফুলের চারাগাছগুলির

পাশে এসে খেলা করে ফুলের মতোই ফুটফুটে শিশুরা, আয়ারা দূরে ব'সে গল্প জমায় এবং সন্ধ্যায় আসেন পার্ক-বিলাসীর দল।

ভাবতে ভাবতে, হ্যাঁ, কী যেন ভাবতে ভাবতেই সেদিন আমিও এখানে এসেছিলাম। বেলা তখন তিনটে। শীতকাল বলেই রোদের তাপ নেমে এসেছে তাই ইতিমধ্যেই বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনে ভ'রে গেছে সমস্ত পার্কটা। কোথাও কোনো বেঞ্চ খালি নেই। অগত্যা আসন গ্রহণ করি রাষ্ট্রগুরুর মূর্তির তলায়। পাশেই মরশুমী ফুলের ঝাড়। ঝাড়ের পাশেই একটি হিন্দুস্থানী যুবক ও পাহাড়ী যুবতী হয়তো খোশ-আলাপে মশগুল ছিল এতক্ষণ। আমি তাদের ঠিক খেয়াল করিনি। আমাকে কাছাকাছি বসতে দেখেই তারা অন্যত্র উঠে যায়। তাদের উঠে যাওয়ার কারণ আমিই—এ-কথা ভেবে নিজেকে সত্যই খুব অপরাধী মনে হলো। তাই ভেতরে ভেতরে বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করছি—এমন সময় হাত-কয়েক দূরেই নজরে পড়ে দুটি অল্প বয়স্ক ছেলে-মেয়ে। মেয়েটির বয়স সম্ভবতঃ বছর-পাঁচেক, আর ছেলেটি হয়তো সাতের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের বেশ-ভূষা যেমন মলিন, তেমনই শতচ্ছিন্ন। খালি পা। চটি বা জুতো তারা হয়তো কোনোদিনও ব্যবহার করেনি। উভয়েরই পায়ের গোড়ালি ফেটে চৌচির হয়েছে এ-বয়সেই। চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত করুণ। অথচ তা সত্ত্বেও উভয়েরই মুখমণ্ডল অদ্ভুত লাবণ্যে উদ্ভাসিত। দেখেই একটু আদর করার ইচ্ছে হয়।······তারা হাঁটু ভেঙে মাটিতে ব'সে পড়ে পাশাপাশি। সামনে পেতে দেয় একখানা নক্সা আঁকা চারকোণা কাপড়। তারপর পাখির মতো মিহি গলায় দু'জন এক সঙ্গেই হঠাৎ গাইতে সুরু করে ঃ

"পথের ধূলোয় আসন পেতে
সাধন-ভজন করি—
শ্যামা মা তোর কালো রূপের নেশায় !
তুই যদি মা না দিস ধরা,
কেমনে তবে ধরি.
আর কতকাল রইব প'ড়ে আশায় !
মাগো আমার মা........."

গ্রামীণ যাত্রাদলের বিবেকের গান যাঁরা শোনেন নি—তাঁরা এদের এ-গান শুনলেই তার খানিকটা পরিচয় পেতেন। অবশ্য

গানের অবস্থা যাই, হোক, গলা এদের পাখির মতোই মিষ্টি। তাছাড়া অল্প বয়স বলেই হয়তো মোটামুটি মানিয়ে গিয়েছে। তাই শুনতে তেমন খারাপ লাগছে না। এদের গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আশ-পাশ থেকে অনেকেই এগিয়ে আসতে সুরু করে। তন্মধ্যে আধ-বয়সী একটা লোক আসে লাঠিতে ভর দিয়ে। দেহটা তার রোগজীর্ণ। সম্ভবতঃ হাঁপানী রোগে ভুগছে। তার পরনে হাঁটুর ওপর ধুতি এবং গায়ে কিছু নেই। পদযুগল নগ্ন। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি ও মাথার জট পাকানো চুলে যেন বিরাজ করছে একটা অনাসৃষ্টির ছবি। সে এগিয়ে এসেই ছেলে ও মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ গান শোনে। তারপর ট্যাঁক থেকে একটা সিকি বের ক'রে ছুঁড়ে দেয় ওদের সামনেই পাতা কাপড়টার মধ্যে। ছেলে ও মেয়েটি গান গাইতে গাইতেই তাকে নমস্কার জানায় এবং সে-ও মাথা ঝুঁকিয়ে বলেঃ "জয় মা, জয় মা।" তারপর অথর্ব দেহটাকে টেনে টেনে লাঠিতে ভর দিয়েই সে চ'লে যায় অন্যত্র। তার দেখাদেখি আরও অনেকেই পয়সা ছুঁড়তে সুরু করে। অবশ্য পয়সার মধ্যে ছোটো-খাটো নয়া পয়সাই বেশি। কিন্তু তা হলেও বেশ বোঝা যায়, ছেলে ও মেয়েটি খুশি হচ্ছে। তাই তারা এক গান শেষ ক'রে অন্য গান ধরে। কখনো দু'জন এক সঙ্গে, আবার কখনো একা চলে গান গাওয়ার পালা। সময়ের পর সময় কেটে যায়। তবু যেন ক্লান্তি তারা মানতে চায় না, ক্লান্তি তারা মানবে না। কিন্তু কচি কণ্ঠের তেজ বেশিক্ষণ থাকে না। ক্লান্তিকে স্বীকার করতে না চাইলেও, ক্লান্তি এসে বাধা দেয় এক সময়। ফলে গান থেমে যায়। ভীড়ও কমতে সুরু করে। খানিক বাদে ছেলে ও মেয়েটির পাশে যখন আর একটি

লোকও অবশিষ্ট থাকে না—তখন তারা উভয়ে পাতা কাপড়টার মধ্য থেকে পয়সাগুলো কুড়িয়ে নেয়। তারপর গুণতে বসে।··

আমার কেমন যেন একটু মায়া হলো। কাঁচা লাবণ্যে উদ্ভাসিত তাদের যে-মুখ দুটি আজও কেবল আদর পেতেই চায়—তা আজ প্রয়োজনের তাগিদেই ভিক্ষার গান গাইছে। আর যে কচি-কচি হাতগুলি এ-বয়সে কেবল খেলা করার জন্যেই উন্মুখ হয়ে থাকে—আজ তা পেটের জ্বালাতেই পয়সা কুড়োচ্ছে এবং দাতার উদ্দেশে জানাচ্ছে কৃত্রিম নমস্কার। তাদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে সত্যই একটু বেদনা অনুভব করি। তাই খেয়াল বশতঃই তাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করি ঃ

—"তোমরা কোথায় থাক ভাই ?"

কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে তারা যেন ঘাবড়েই যায়। হয়তো ভাবে ঃ আমি একটা অসৎ লোক, ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাদের পয়সাগুলো কেড়ে নেবো। তাই তারা পয়সাগুলো তাড়াতাড়ি কাপড়ে বেঁধে নিয়ে খানিকটা দূরে স'রে যায়। তারপর চিৎকার ক'রে ডাকে ঃ—"বাবা!"

ডাক শুনেই পার্কের অপর প্রান্ত থেকে যে-লোকটা লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে—তার দিকে তাকিয়ে আমার আর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। সব ব্যাপারটাই কেমন যেন গুলিয়ে যায়। এ সেই লোক—যে প্রথম এদের গান শুনে একটা সিকি ছুঁড়ে দিয়েছিল। সে কাছাকাছি আসতেই ছেলেটি আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে তাকে বলে ঃ

—"বাবা, আমরা যখন পয়সা গুণছিলাম, তখন ওই লোকটা আমাদের কাছে এসে কি যেন বলছিল।"

এবার ওদের বাবাও আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তারপর চড়াগলায় বলে ঃ "কি চান মশায় আপনি ?"

আমি নিচু গলায় জবাব দিই ঃ —"না, এমন কিছুই চাই না। ওদের গান শুনে খুব ভালো লেগেছিল বলেই কেবল জানতে চেয়েছিলাম—ওরা থাকে কোথায়।"

—"যেখানেই থাকুক, তাতে আপনার প্রয়োজন ? আপনার মতলবটা কী—জানতে পারি ?"

লোকটার কথা বলার ভঙ্গী অত্যন্ত রূঢ়। হয়তো সে'ও আমাকে একটা অসৎ প্রকৃতির লোক বলেই ভাবছে। তাই মুহূর্তেই রক্ত গরম হয়ে ওঠে আমারও। ভেবেছিলাম কিছু বলবো না। কিন্তু তার এ-অভদ্র আচরণ সহ্যের অতীত। অতএব আমিও শালীনতাবোধের ধারে-কাছে না এসে বেশ একটু গম্ভীর স্বরে বলি ঃ

—"কী ব্যাপার, এতো চিৎকার করছো কেন ? কে তুমি ? বাপ হয়েও বাচ্চাদের দিয়ে ভিক্ষা করাচ্ছ, করাও। কিন্তু ভিন্ন ব্যক্তি সেজে, এদের প্রতি তুমিই প্রথম পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে দয়া দেখানোর অভিনয় কর কেন ? এতে বুঝি সাধারণ লোককে ঠকিয়ে পয়সা রোজগারের সুবিধে হয় ? তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিলে তোমার কী কঠিন শাস্তি হবে জানো ?"

আমার এ-কথার পর লোকটা সত্যিই ঘাবড়ে যায়। আমি তার সব কায়দা ধরতে পেরেছি—একথা বুঝতে পেরেই সে-হয়তো দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই আর কোনো কথা না ব'লে লাঠিতে ভর রেখেই সে ব'সে পড়ে মাটিতে। তারপর বিস্ফারিত চোখ তুলে, ধীরে ধীরে অতি নিস্তেজ কণ্ঠে সে বলে ঃ

—"আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবেন ?"

তার অবস্থা লক্ষ্য ক'রে আমিও কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। তাই পরমুহূর্তে আমিও ব'সে পড়ি মাটিতেই। তারপর আস্তে আস্তে জবাব দিই :

—"না। আমি কেন তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে যাবো? তবে তুমি যা কর—তা মোটেই ভালো নয়। বিশেষ ক'রে বাপ হয়ে ছেলেমেয়েকে দিয়ে এভাবে ভিক্ষা করানো অত্যন্ত সমাজ-বিরোধী কাজ।"

এ-কথার পর সে মাথা নিচু ক'রে খানিকক্ষণ কী যেন ভাবে। তারপর যখন চোখ তুলে তাকায়—তখন দেখি : তার দু'চোখ ভেজা। এমন সময় মেয়েটি তার কাছে এসে বলে :—"বাবা, বাড়ী চলো। মা একা আছে।"

লোকটা এবার মেয়েকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ভগ্ন গলায় আমাকে উদ্দেশ ক'রে বলে :

—"আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি একটা নরাধম। আমার এ-বাচ্চারা রোজ গান গেয়ে যা ভিক্ষা করে—তা দিয়েই আমি অন্ন গিলি। আমিই এদের ভিক্ষা করাই। আর মাঝে মাঝে ভিন্ন লোক সেজে সাধারণ লোককে সত্যই আমি ধোকা দিই। এর চাইতে ঘৃণার কাজ আর নেই বাবু। ···কিন্তু কী করবো বলতে পারেন? আমি এক চির-রোগী। হাঁপানির সঙ্গে পেটের অসুখেও ভুগছি। এ-অবস্থায় কোথাও কোনো কাজ পাই না। ওদিকে আবার বউটাও কঠিন অসুখে ভুগছে। আমার তো আর কেউ নেই। এ-অবস্থায় বাচ্চারাই আমার একমাত্র সম্বল।"

—"তোমার বউ-ও অসুখে ভুগছে?"

—"হ্যাঁ, প্রায় বছরখানেক ধরেই ঝুলছে। এবার মরবে।"

—"মরবে? তার মানে?"

—"তাছাড়া আর কি ? মরতেই তো বসেছে। পাকিস্তান থেকে আসার পর আমার শরীর যখন ভেঙে পড়ে, তখন বউটাই সংসারের দায়িত্ব নিয়েছিল। পরের বাড়ী ঝি-এর কাজ ক'রে সে আমাকে এবং বাচ্চাদের খাওয়াতো। কিন্তু নিজে অনাহারেই থাকতো দিনের পর দিন। আমি আগে তা জানতে পারিনি। জানতে পারি কেবল সেদিনই—যেদিন সে অসুখে প'ড়ে বিছানা নেয়। তারও একটা শরীর তো, না খেয়ে আর কত সইবে। অসুখে পড়ার মাসখানেক পর তাকে একবার হাসপাতালে নিয়ে যাই। হাসপাতালের ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে বলেন : বুকের ফটো তুলতে হবে। অনেক চেষ্টার পর ফটোও তোলা হয়। কিন্তু ফটো দেখার পর ডাক্তার রায় দিয়ে বসেন : বউটার আমার টি বি হয়েছে। বিনা চিকিৎসায় আজ বছরখানেক ধ'রে ওই রাজরোগেই সে ভুগছে।"

—"তোমার বউয়ের টি বি? কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা করনি ?"

চিকিৎসা করার ক্ষমতা কই ? হাসপাতালে একটা বেড পাওয়ার জন্য বহুভাবে বহু চেষ্টা করেছি। কিন্তু ফল হয়নি। সরকারী অফিস থেকে কর্পোরেশন এবং কর্পোরেশন থেকে রেডক্রস অফিসে দিনে দশবার যাতায়াত করেছি এতদিন। কিন্তু সবখানেই ওই এক উত্তর : বেড খালি নেই।" —এই ব'লে সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে। তারপর আবার ধীরে ধীরে বলতে থাকে :

—"বউটা ছিল আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। যে-ঘর ভেঙেছে পাকিস্তানে—তা এখানে আবার নতুন ক'রে বাঁধার বড়ো সাধ ছিল তার। সে সাধ তার পূর্ণ হলো না! সে বুঝি আর পারলো না নতুন ঘরে প্রদীপ জ্বালাতে।"

মেয়েটি এবার লোকটার গলা জড়িয়ে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বলে ঃ

—"ও বাবা, বাড়ী চলো না! মা যে একা আছে।"

মেয়েটির কথায় লোকটা এবার সজাগ হয়ে ওঠে। লাঠিতে ভর রেখেই সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়—যেন চামড়ায় ঢাকা একটা সম্পূর্ণ কঙ্কাল!

সে আমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নেয়। তারপর মেয়েটির হাত ধ'রে ধীরে ধীরে পা বাড়ায় দক্ষিণ দিকে। ছেলেটি পেছনে পেছনে অনুসরণ করে তাদের।

ক্রমেই তারা যখন পার্ক পেরিয়ে চ'লে যায়, তখন এদিকে আমার পাশের গাছ থেকে ডানা ঝেড়ে আকাশে উড়ে যায় কয়েকটা শালিক। পর-মুহূর্তেই মনে হয় ঃ কার্জন পার্কটা যেন হায় হায় করছে! যেন এখানে কোনো প্রাণের স্বাক্ষর নেই।

———

একটি বিশেষ চরিত্র

পূর্ব এণ্টালি পেরিয়ে আরও পূর্বদিকে এগিয়ে গেলেই উত্তরে-দক্ষিণে নজরে পড়ে সুদীর্ঘ হিউজ রোড। হিউজ রোডের যে-অংশে পশ্চিমের ট্যাংরা রোড এসে মাথা ঠেকিয়েছে, ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড একটা নিষ্পত্র গাছ। গাছটা বরুণ দেবের বজ্রবাণে নিহত হয়েছে অনেকদিন। কিন্তু গোড়া শক্ত বলেই কঙ্কালসার দেহটা তার নুয়ে বা ভেঙে পড়েনি। মরেও না মরার ভান ক'রে সম্পূর্ণ গাছটাই দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে।

ওপারে ধাপার মাঠের নোংরা ঘেঁটে ঘেঁটে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে অজস্র শকুন—তখন এই শুকনো গাছটারই ডালে ডালে এসে তারা বিশ্রাম নেয়। আকাশ কালো ক'রে উড়ে আসে কাকের দল। শকুনগুলোর মুখের কাছে এসেই তারা ডানা ঝাপটায়, কলহ করে। তারপর একসময় তারাও নির্লিপ্তভাবে ব'সে পড়ে শকুনগুলোরই পাশে পাশে।

নিচে ইতস্তত চ'রে বেড়ায় পোষা শূকরের দল। অজস্র খোলা নর্দমার কটুগন্ধী কাদা ঘেঁটে ঘেঁটে হয়রান হয়ে এক সময় তারাও এসে জড়ো হয় গাছটারই তলায়। সুতরাং গাছটা মরা হলেও, নিঃস্ব নয়। কাক, শকুন ও শূকরের পরিবার নিয়ে মরা গাছটাও বেশ মুখর হয়ে থাকে সর্বক্ষণ।

গাছটার পাশেই, হিউজ রোড এবং ট্যাংরা রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যহ পাহারা দেয় একটা পুলিশ। কলকাতার অন্যান্য অংশে একই জায়গায় এক পুলিশ প্রত্যহ থাকে না। কিন্তু

এখানে দিনের পর দিন আজকাল একটা পুলিশকেই দেখা যায়। এর কারণ কী—আমরা ঠিক জানি না। এই পুলিশটার স্বভাব চরিত্র বড়ো বিচিত্র। মোড়ে দাঁড়িয়ে সে পাহারা দেয় বটে, এবং পুলিশ হিসেবে তার যা দায়িত্ব তাও সে পালন করে সঠিকভাবে, কিন্তু কার্য-কারণে পথযাত্রীদের সঙ্গে সে স্বাভাবিক ব্যবহার করে না। কেউ যদি তাকে কোনো পথের নিশানা বা কোনো বাড়ীর

ঠিকানা জিজ্ঞেস করে, তাহলে সে তা জানা সত্ত্বেও বলে না। কিংবা বললেও ভুল বলে। যারা পথের নিশানা জিজ্ঞেস করে, তাদের সে দেখিয়ে দেয় উল্টো পথ। যারা কোনো বাড়ীর ঠিকানা চায়, তাদের দেখিয়ে দেয় অন্য দিকের অন্য বাড়ী। ফলে অনেকেই বেশ হয়রান হয় অকারণে। এমন কি, মেয়েদের বেলাতেও সে একই ব্যবহার করে। কোনো মেয়ে কোনো

পথের নিশানা জিজ্ঞেস করলে, তাকেও সে উল্টো দিকের এমন পথই দেখিয়ে দেয়—যা মেয়েটির ভাগ্যে আনে বিড়ম্বনা।

যাদের সে এভাবে ভুল পথ দেখায়, তাদের মধ্যে কেউ যদি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আবার তার কাছে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করে ঃ

—"তুমি এমন ভুল পথ দেখিয়ে দিলে কেন ?"

তখন সে এ-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নেয় একটা পাথরের নুড়ি। তারপর সেই নুড়িটা শুকনো গাছটার একটা শকুনকে লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে মারে। আঘাত পেয়েই শকুনটা যখন আকাশে ওড়ে, তখন সে সেদিকে তাকিয়েই আপন মনে হাসে এবং শিস্ দেয়। পাশের লোকের দিকে ফিরেও তাকায় না।

অদ্ভুত চরিত্র এই পুলিশটার। বয়স তার বেশি নয়। কোনো কোনো সময় গাছতলা থেকে একটা শূকরের ছানা এনে রাস্তার মোড়েই আদর ক'রে খেতে দেয়। কিন্তু কোনো মানুষের বাচ্চা হঠাৎ খেলতে খেলতে তার কাছ-বরাবর এলেই সে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়।

তার এই দৈনন্দিন ব্যবহার লক্ষ্য ক'রে মনে হয় ঃ মানুষকে সে ভালোবাসেনা। মানুষ জাতটার প্রতিই তার কোনো সহানুভূতি নেই। অবশ্য অনেকেই তাকে পাগল মনে করে। কিন্তু আমি দেখেছি প্রকৃতপক্ষে সে পাগল নয়। পাগল হলে আর যাই পাক, অন্তত পুলিশের চাকুরী সে পেতো না এবং এভাবে বহাল থাকতো না দিনের পর দিন।

এই পুলিশটার এ-ধরণের ব্যবহার আমি নিজে অনেকদিন লক্ষ্য

করেছি। তাই তার প্রতি আমি কৌতূহলী হই বিশেষভাবেই এবং মানুষের প্রতি কেন সে এ-ধরণের ব্যবহার করে, তার সঠিক কারণও অনুসন্ধান করার চেষ্টা করি। প্রথমতঃ চেষ্টা করি পুলিশটারই সান্নিধ্যে এসে তার ঘনিষ্ঠ হবার, কিন্তু এ-প্রচেষ্টায় সার্থক হতে পারিনি। শেষে দিনের পর দিন একইভাবে অপেক্ষা করার পর, হঠাৎ একদিন ঘটনাচক্রেই আবিষ্কার করি তার বৃদ্ধ মাকে কোনো এক বস্তির বাড়ীতে। আমার ঐকান্তিক অনুরোধে তার এই বৃদ্ধা মা'ই তার পুলিশ ছেলের এ-অদ্ভুত ব্যবহার বা চরিত্রের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে-ইতিহাস বলেন, তা হলো এই ঃ

পুলিশটার নাম ধীরেন। কলকাতা শহর থেকে অনেক, অনেক দূরের গ্রামে ছিল তার বাড়ী। একমাত্র বর্তমানের এই বিধবা মা ছাড়া আর তার কেউ ছিল না। বাড়ীর পাশে ছিল সামান্য একটু জমি। তখন এই জমিটুকুই ছিল তাদের মা-ছেলের জীবন ধারণের একমাত্র উপায়।

ধীরেন তখন নাবালক। তাই তার বিধবা মাকেই তদারক করতে হতো জমির এবং জমিতে ফসল ফলিয়ে ব্যয়ভার বহন করতে হতো সংসারের। অবস্থা খুব সচ্ছল না হলেও, মায়ের ইচ্ছে ছিল ধীরেন লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক। তাই তাকে সে ভর্তি করিয়ে দেয় বাড়ী থেকে প্রায় পাঁচমাইল দূরের এক স্কুলে। লেখাপড়ার প্রতি ধীরেনেরও অনুরাগ ছিল গভীর। তাই মায়ের এ ব্যবস্থায় সে খুশি হয় এবং বেশ মনোযোগ দিয়েই সুরু করে লেখাপড়া।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ধীরেনদের গ্রামের অধিবাসী প্রায় প্রত্যেকেই গরীব কৃষক এবং গরীব কৃষক বলেই তাদের কারুরই কোনো আক্ষরিক জ্ঞান নেই। ধীরেনও তাদেরই দলের। অথচ

আর কিছুদিন পরেই সে লেখাপড়া শিখে সকলের মাথার ওপর উঠবে—এটা ঠিক ভালো মনে তারা গ্রহণ করতে পারলো না। খানিকটা ঈর্ষাবশতই তারা ধীরেনের এই লেখাপড়া শেখাকে বিদ্রূপ বরতে লাগলো প্রকাশ্যে।

তাছাড়া গ্রামের যিনি জোতদার তিনি ভাবলেন ঃ ধীরেন যদি লেখাপড়া শিখে বড়ো হয়, তাহলে তাঁর নানা কাজের বিরুদ্ধে ধীরেন হয়তো একদিন রুখে দাঁড়াবে এবং বংশ পরম্পরায় জোতদার হিসেবে তিনি যা সম্মান ভোগ ক'রে আসছেন, তাও হয়তো একদিন সে হরণ ক'রে বসবে শিক্ষার গুণে। অতএব তিনিও পরোক্ষে এবং প্রত্যক্ষে ধীরেনের এই লেখাপড়া শেখার বিরোধিতা স্মুরু করলেন।

ধীরেন এবং ধীরেনের মা কিন্তু কিছুতেই দমলো না। সমস্ত গ্রামবাসীর বিদ্রূপ ও বিরোধিতা সত্ত্বেও ধীরেনের সাধনা এগিয়ে চললো আগের মতোই। এতে আরও বেশি ক্ষেপে গেলেন জোতদার। সহজ উপায়ে ধীরেনকে রোধ করা যখন সম্ভব হলো না, তখন তিনি অন্য একটি কঠিন পথ ধ'রে এগিয়ে এলেন তাকে জব্দ করার জন্য। অর্থাৎ মিথ্যা খাজনার দায়ে তিনি কেড়ে নিলেন তাদের জীবন ধারণের জমিটুকু। তারপর গ্রামবাসীদেরও তিনি দলে ভেড়ালেন। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই ধীরেনদের পক্ষে আর কেউ রইলোনা এবং কেউ রইলো না ব'লে কেবল যে জমিটুকুই তাদের হারাতে হলো তা নয়, বছর-খানেক পর একই মিথ্যা দায়ে একদিন ভিটে বাড়ীটাও তাদের হারাতে হলো, সম্পূর্ণ নিঃস্ব হতে হলো তাদের।

সব কিছু হারিয়েও, আরও বছর-কয়েক গ্রামেই টিকে রইলো ধীরেন এবং ধীরেনের মা। দেখতে দেখতে ধীরেনের বয়সও বেশ

বেড়ে উঠলো। অর্থাৎ সাবালক হয়ে উঠলো সে। কিন্তু সাবালক হওয়ার পর জোতদার ও গ্রামবাসীদের বিদ্রূপ এবং অসহযোগিতা আরও যেন তীব্র হয়ে উঠলো তাদের প্রতি। শুধু তাই নয়, তাদের সংসারেও দেখা দিল অচলাবস্থা। যা জমানো ছিল, তা এতদিনে তো নিঃশেষ হয়েছেই, সেই সঙ্গে থালা-বাসন, ঘটি-বাটি ইত্যাদিও আর অবশিষ্ট নেই। তাই নিরূপায় হয়ে ধীরেন এবার বৃদ্ধা মায়ের হাত ধ'রে বেরিয়ে এলো গ্রাম ছেড়ে।

অনেক পথ পায়ে-পায়ে মাড়িয়ে, অবশেষে একদিন কলকাতার কঠিন পাথরে এসে তারা পা রাখে। অনাহার-অনিদ্রায় কিছুদিন ফুটপাথেই কেটে যায়। তারপর ফুটপাথ থেকে কোনো এক সম্ভ্রান্ত বাড়ীতে উঠে আসে ধীরেনের মা। সেখানে সে বহাল হয় ঝি-এর কাজে। ধীরেনও ব'সে থাকে না। খবরের কাগজের অফিস থেকে কাগজ সংগ্রহ ক'রে অন্যান্য ফেরীওয়ালাদের মতো সে-ও পথে পথে ঘুরে কাগজ বিক্রী করতে সুরু করে এবং মনে মনে ভাবেঃ এভাবেই সে তার পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে এনে আবার একদিন লেখাপড়া সুরু করবে।

কিন্তু তা আর সম্ভব হলো না। কারণ ফেরিওয়ালাদের মতো এ-কাজে সে তেমন পটু নয়। তাই সাধারণের দৃষ্টি বা মন আকর্ষণ করতে সে পারে না। লোকজন সাধারণতঃ পুরোনো ফেরীওয়ালাদের কাছ থেকেই কাগজ কেনে, তার কাছ থেকে কেনে না। ফলে দিনান্তেও তার হাতের কাগজ হাতেই থেকে যায়। তবু এভাবেই সে আরও দিন-কয়েক চালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু লাভ হয় না, কেবল ক্ষতির পরিমাণ বাড়ে।

অন্যদিকে ঝি-এর কাজে আসন্ধ্যাসকাল অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয় তার মাকে। বৃদ্ধ বয়সে এ-ধরণের পরিশ্রম করার ফলে

দিন-কয়েক পর উক্ত সম্ভ্রান্ত বাড়ীতেই সে হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাড়ীর মালিক তাকে আর ঝি-এর কাজে বহাল না রেখে বরখাস্ত করেন। তাই মা আবার ফিরে আসে ফুটপাথে এবং

ছেলেও এসে দাঁড়ায় তার মাথার কাছে। এবার তাদের উভয়ের কাছেই মনে হয়ঃ সমস্ত দুনিয়াটাই মিথ্যা এবং দুনিয়ার মানুষগুলো যেন মানুষ নয়।

ফুটপাথে মায়ের অসুখ বেড়ে যায়; দিশেহারা হয়ে পড়ে ধীরেন। সে ছুটে যায় হাসপাতালে, কিন্তু মায়ের জন্য কোনো সিট পায় না, তাদের জন্য কোনো সিট নেই।

অবশেষে কেবল প্রাণের মমতা দিয়েই সে সুরু করে মায়ের শুশ্রূষা এবং ওভাবেই তাকে সে অনেকটা সুস্থ ক'রে তোলে প্রায় মাস-খানেক পর।

তারপর ঠিক এমনই সময়ে খবরের কাগজের একটা বিজ্ঞাপনের সূত্র ধ'রে সে লালবাজারের একজন অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্খা জলাঞ্জলি দিয়ে নাম লেখায় পুলিশে।

সে তার জীবনে মানুষের কাছ থেকে কোনো সাহায্য বা বা সহানুভূতি পায়নি, পেয়েছে কেবল অবজ্ঞা, উপেক্ষা ও অবহেলা তাই মানুষকে সে আজও ভালোবাসতে পারছে না। অনেকদিনের অনেক অভিমান আজ প্রতিশোধের রূপ নিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে রাস্তার মোড়ে মোড়ে। সে আজ নিজেও মানুষ নয়।

কিন্তু মানুষের মতো মানুষ কি তার পাশে এসে দাঁড়াবে না কোনোদিন? কোনোদিন কি কোনো প্রকৃত মানুষের উত্তাপ পেয়ে তার অভিমানের গভীর তলদেশ থেকে উর্ধ্বমুখী হয়ে ফুটে উঠবে না সুন্দরের ক্ষমাস্নিগ্ধ পারিজাত!!

———

আউট্রাম ঘাটের জ্যোতিষী

গড়ের মাঠে নেমেছে ফাল্গুনের প্রথম বিকেল। যেদিকে তাকাই, মনে হয় সবই রমণীয়। বিশেষ ক'রে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পেছন দিকটা যেন আরও ছন্দসী। ওদিকে যৌবনোচ্ছ্বাসী গাছে-গাছে দোল খাচ্ছে দক্ষিণের হাওয়া। মাঝে মাঝে পাখি ডাকছে বিচিত্র সুরে। যেন সুরেরেই সুতোয় বাঁধা পড়েছে প্রতিটি মুহূর্ত। তাই হয়তো অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ ভ্রমণ-বিলাসীদের সমাগম ঘটেছে অনেক বেশি।

আজ আমিও এদিকে এসেছি আমার এক আর্টিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে। বন্ধুর উদ্দেশ্য অবশ্য বেড়ানো নয়, ছবি আঁকা। সে আউট-ডোরের বৈকালিক দৃশ্য আঁকবে ব'লে রঙ, তুলি ও ড্রইং-পেপার সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আমি যদিও বেড়াতেই এসেছি, তবু প্রকৃতপক্ষে সঙ্গী আমি তারই। আমরা উভয়ে এদিক-সেদিক ঘুরছি। আমার বিবেচনায় আজ গড়ের মাঠের সমস্ত দৃশ্যই ছবি আঁকার অনুকূলে। কিন্তু বন্ধুর দৃষ্টি আমার মতো স্থূল নয় বলেই হয়তো কোনো দৃশ্যই তার মনের মতো হচ্ছে না। তাই গড়ের মাঠ ছেড়ে, শেষে আউট্রাম ঘাটের দিকে পা' বাড়াতে হয় দৃশ্যের সন্ধানে। আঁকার মতো উপযুক্ত বিষয়বস্তু না পেয়ে, বন্ধুকে বেশ বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। কিন্তু আউট্রাম ঘাটের কাছাকাছি আসতেই এবার, তার মুখেও হাসি ফোটে। সে গঙ্গার দিকে আঙুল দেখিয়ে আমায় বলে: "আঁকার পক্ষে এই হলো উপযুক্ত বিষয়-বস্তু"

তার কথায় আমিও পশ্চিমদিকে দৃষ্টি ফেরাতেই দেখি: মন্দগতি গঙ্গার বুকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গুটিকয় জাহাজের মাস্তুল।

মাস্তুলের মাথার ওপর বিদায়ী সূর্যের ম্লান অস্তিত্ব—যেন সৌন্দর্যের তৃতীয় নয়ন। এদিকে রাস্তার পাশে আদিকালের কল্পতরুর মতোই একটি অশ্বত্থ গাছ। তারই তলায় ব'সে আছে এক জ্যোতিষী। সব মিলিয়ে পরিবেশটি সত্যই খুব উপভোগ্য।…বন্ধু আবার বলে ঃ

—"আজকের মতো এ-দৃশ্যই আমি আঁকবো"—এই ব'লে সে রঙ, তুলি ও ড্রইং-পেপার নিয়ে, প্রায় এক ফার্লং দূরে রাস্তার পাশেই ব'সে পড়ে এবং আমাকে বলে জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে হাত দেখাতে।

হাত দেখা বা ভাগ্য গণনার প্রতি আমি চিরকাল অবিশ্বাসী। যারা হাত দেখে বা ভাগ্য গণনা করে—তাদের প্রতি আমার যেমন কোনো শ্রদ্ধা নেই, তেমনই তাদেরও আমি অশ্রদ্ধার চোখেই দেখি—যারা হাত দেখায় বা ভাগ্য গণনা করায়। অথচ বন্ধু আমাকেই বলছে জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে হাত দেখাতে। আমি এ-কথার প্রতিবাদ করতে যাবো—এমন সময় বন্ধুই আবার বলে ঃ

—"এখানে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোনো প্রশ্ন নেই। আমি তোমাকে জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে হাত দেখাতে বলছি কেবল আমার ছবির খাতিরেই। হাত দেখাতে না চাও, অন্ততঃ তার সঙ্গে ব'সে খানিকক্ষণ গল্প কর। তাতে আমার ছবি আঁকার সুবিধে হবে।"

অগত্যা বন্ধুর নির্দেশে তাই করতে হয়। আমি বন্ধুকে পেছনে রেখে জ্যোতিষীর কাছে এগিয়ে আসি। জ্যোতিষী গঙ্গার দিকে তাকিয়ে কী-যেন ভাবছেন। পরনে তাঁর শতচ্ছিন্ন গেরুয়া বসন। মাথায় কাকের বাসার মতো জট পাকানো রুক্ষ চুল। মুখে লম্বা দাড়ি এবং চোখে সাবেকী আমলের চশমা। তাঁকে দেখেই মনে হয় ঃ তিনি এ-যুগের সব চাইতে হতভাগ্য ব্যক্তি।

অথচ তিনিই করেন অপরের ভাগ্য গণনা। তাঁর দুর্গত চেহারার দিকে তাকিয়ে মনে মনে এ-কথাই ভাবছি—এমন সময় গঙ্গার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে জ্যোতিষী মহারাজ আমার দিকে তাকান। তাঁর তাকানোর ভাব-ভঙ্গী দেখে মনে হয়ঃ তিনি যেন আমাকে চেনেন। চোখ থেকে চশমা খুলে বার-কয়েক নানাভাবে তিনি লক্ষ্য করেন আমার সর্বাঙ্গ। তারপর হঠাৎ এক সময় ব'লে ওঠেনঃ

—"তুমি অমুক না? এদিকে কি মনে ক'রে?"

আমি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেই চমকে উঠি। এ-কণ্ঠ যেন সত্যই খুব পরিচিত ঠেকছে। তাই তাড়াতাড়ি তাঁর মুখোমুখি ব'সে জবাব দিইঃ

—"হ্যাঁ, আমিই সে। কিন্তু আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো? আমি যেন ঠিক বুঝতে পারছি না"...

—"বুঝতে পারছো না? মাত্র বছর-তিনেকের ব্যবধানেই ভুলে গেলে বাবা। বালিগঞ্জে আমার বাসার পশেই তো থাকতে।"

এ-কথার পর আর সন্দেহ রইলো না। লম্বা দাড়ি-গোঁফের আড়ালে যে-মুখ লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ—তা' এ-কথার পর আকস্মিকভাবেই আত্মপ্রকাশ করে আমার চোখের সামনে। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে বলিঃ

—"রাজুকাকা? আপনি?"

—"হ্যাঁ বাবা, আমিই। চিনতে পেরেছ তাহলে?"

—"কিন্তু আপনাকে তো ঠিক এদিকে এমন বেশে আশা করিনি? কী আশ্চর্য! এও কি সম্ভব?"

—"এ-যুগে সবই সম্ভব। বরং কোনো কিছু অসম্ভব থাকাটাই আশ্চর্যের।"

—"এ-বেশ কবে থেকে নিলেন?"

—"প্রায় বছর-খানেক হলো।"

এই ব'লে তিনি তাঁর উদাস দৃষ্টি আবার ফিরিয়ে নিলেন গঙ্গার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো অতীতের একটি বিশেষ অধ্যায়ঃ

রাজুকাকা বালিগঞ্জের বাসিন্দা। আমিও তাঁর বাসার পাশেই এককালে থাকতাম। তখন তাঁর এতবড়ো দাড়িগোঁফ ছিল না এবং চেহারার মধ্যেও এ-দীনতা কোনোদিন লক্ষ্য করিনি। পাড়ার মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র হিতৈষী ব্যক্তি। তাই পাড়ার সব ব্যাপারে তাঁকে জড়িত থাকতে দেখা যেতো। তাঁর বাসার পেছনেই ছিল বৃহৎ একটা বস্তি। বিশেষ ক'রে এই বস্তির দরিদ্র সাধারণের জন্যে তাঁর দরদের অন্ত ছিল না। তাই নিজ ব্যয়ে বস্তির মধ্যেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন একটি নাইট স্কুল এবং সেই সঙ্গে একটি ছোটোখাটো দাতব্য চিকিৎসালয়। তাছাড়া পাড়ার পূজো-পার্বণ, খেলা-ধূলা এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজনাদি হতো তাঁরই উদ্যমে। তবে অনুষ্ঠানাদির চাইতে সমাজ-সেবার প্রতিই নজর তাঁর বেশি ছিল। তাই তিনি নাইট স্কুল ও ক্ষুদ্র দাতব্য চিকিৎসালয়টির ব্যাপারেই সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন এবং মনে মনে স্বপ্ন দেখতেনঃ এ-ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানদ্বয় এভাবেই একদিন সর্বজনীন রূপ নিয়ে আদায় করবে জনসাধারণের ব্যাপক স্বীকৃতি। এ-ব্যাপারে পাড়ার নবীন বা প্রবীণদের কোনো সাহায্য পাওয়া যেতো না। তাই যাবতীয় ব্যয়ভার তাঁকে নিজের পকেট থেকেই চালাতে হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি অর্থশালী ছিলেন না। একমাত্র সরকারী চাকুরীর মাইনেই ছিল তাঁর সম্বল। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই চাকুরীর মেয়াদ শেষ হওয়ায় তিনি যখন

অবসর গ্রহণ করেন, তখন স্বাভাবিক কারণেই অর্থ-কড়ির দিকটা আর স্বচ্ছল থাকে না। অবসর গ্রহণের পর তিনি পেন্সনের যে-টাকা পেতে স্বুরু করেন—তা'দিয়ে তাঁর সংসার চালানোই দায় হয়ে পড়ে। কারণ সংসারে তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং সেই সঙ্গে তিন-তিনটে আইবুড়ো মেয়ে বর্তমান। অথচ ওদিকে বস্তির নাইট স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয়টি বাঁচিয়ে রাখতে হলে অর্থের প্রয়োজন। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে, শেষ পর্যন্ত তিনি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা স্বুরু করেন! উদ্দেশ্য: এভাবেই অর্থ উপায় ক'রে উক্ত নাইট স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয়টির ব্যয়ভার তিনি কোনোমতে চালিয়ে যাবেন। কিন্তু চালাতে ঠিক পেরেছিলেন কিনা জানি না। কারণ তার দিন-কয়েক পরেই আমি বালিগঞ্জের বাসা ছেড়ে অন্যত্র চ'লে আসি। তারপর তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি।...

আজ দীর্ঘ তিন বৎসর পর আউট্রাম ঘাটের গাছতলায় হঠাৎ তাঁকে এ-ভাবেই দেখতে পাবো—সত্যিই কল্পনা করতে পারিনি। গঙ্গার দিকে তাঁর উদাস দৃষ্টির অনুসরণ ক'রে ধীরে ধীরে আমি তাঁকে বলি:

—"রাজুকাকা, আপনার সেই নাইট স্কুল আর দাতব্য চিকিৎসালয়টি আজও আছে তো?"

—"না, ও-সব অনেকদিন আগেই উঠে গেছে। অর্থাভাবে চালাতে পারিনি।"

—"কেন? এ-জন্য আপনি তো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা স্বুরু করেছিলেন। ও-চিকিৎসা কি ঠিক জ'মে ওঠেনি?"

—"জমে উঠেছিল ঠিকই। ও-চিকিৎসা মাঝে মাঝে আজও

ক'রে থাকি। কিন্তু পয়সা আগেও পাইনি, আজও পাই না। আমার কাছে চিকিৎসা করতে কেবল তারাই আসে—যাদের হাতে কোনোদিন পয়সা থাকে না।"

—"আজ হঠাৎ জ্যোতিষীর বেশ নিলেন কেন ?"

—"সংসারের তাগিদে। কিছুদিন আগে বড়ো মেয়েটার বিয়ে দিয়েছি। তাতে বেশ কিছু ধার হয়েছে। তাই পেন্সনের যে-টাকা পাই—তা' প্রতিমাসে ধার শোধ করতেই চ'লে যায়। সংসার খরচের জন্য কিছুই বাকি থাকে না। অথচ এ-বয়সে অন্য কোনো কাজ ক'রে পয়সা রোজগার করবো—তারও কোনো উপায় নেই। তাই আজ বাধ্য হয়েই ধারণ করেছি জ্যোতিষীর বেশ।"

—"এতে কি সংসার চলে ?"

—"চলে না। তবু চালাতে হয়।"

—"এ-বয়সে পরিশ্রম ক'রে এতদূর আসেন কেন ? এ-কাজ তো পাড়াতে বসেও করতে পারেন।"

এ-কথার পর ঠোঁটের কোণে একটু ম্লান হাসি টেনে তিনি বলেন ঃ

—"পাড়ায় আমি অন্যভাবে পরিচিত। আজ হঠাৎ জ্যোতিষী হ'য়ে বসলে পাড়ার লোক সহজে বিশ্বাস করতে চাইবে কেন ? তার চেয়ে এই ভালো। এদিকে কেউ আমাকে চেনে না। এখানে যারা আমার কাছে আসে—তারা সবাই মনে করে আমি একজন জ্যোতিষী।"

—"কিন্তু জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রতি আপনার কোনো অনুরাগ আছে—আগেতো তা' জানতাম না। বর্তমানে কি সত্যই আপনি এ-শাস্ত্র বিশ্বাস করেন ?"

—"আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু আসে যায় না। যারা হাত দেখায় বা ভাগ্য গণনা করায়—তারা তা' মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে বলেই এ-পেশা আমি সহজভাবেই গ্রহণ করেছি। আমি না থাকলে, তারাতো অন্যের কাছে যেতোই। সুতরাং আমার কাছে আসলেই বা ক্ষতি কি?"

এ-কথা বলেই তিনি হাসিমুখে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে আবার এক সময় বলেন :

—"এবার তুমি যাও। এ-সময়টিতেই কিছু কিছু লোকজন আমার কাছে এসে থাকে। তুমি পাশে ব'সে থাকলে তারা হয়তো না আসতেও পারে।"

রাজুকাকাব নির্দেশ মতো আমি ফিরে আসি বন্ধুর কাছে। ইতিমধ্যে বন্ধুরও ছবি আঁকা শেষ হয়েছে। আমি আসতেই সে হাসিমুখে সদ্য-আঁকা ছবিটি তুলে ধরে আমার চোখের সামনে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি : ছবির মধ্যে সব চাইতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে গাছতলার সেই জ্যোতিষী।

———

একটি মৃত্যু

পার্কের পাশের ফুটপাথেই ম'রে আছে লোকটা, দেহটা তার চিৎ হয়ে প'ড়ে আছে। কিন্তু চোখ দুটো তার মরেনি, ও-দুটো এখনো তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে এবং মুখটাও তার হাঁ-করা। যেন ম'রে গিয়েও আজ ওই হাঁ-মুখ দিয়েই সে আস্বাদন করতে চায় গোটা দুনিয়াটাকে।

লোকটা এ-অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকের কাছেই পরিচিত ছিল। অবশ্য পাগলা হিসেবে। নাম তার সুরেন শিকদার। অজস্র তালি মারা একটা ফুলপ্যাণ্ট প'রে এবং তদ্রূপ তেল-চিটচিটে একটা কালো কোট গায়ে চাপিয়ে, খালি পায়ে সে দিন-মান ঘুরে বেড়াতো রাস্তায়-রাস্তায়, পার্কে-পার্কে এবং কখনো কখনো অফিস পাড়ায়। অনেক সময় সে পার্ক ও রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিতো পোড়া বিড়ি ও সিগারেটের অজস্র টুকরো। তার পকেটে থাকতো একটা বহুদিনের জরাজীর্ণ পাইপ। ফুটপাথের কোনো এক নিরিবিলি জায়গায় ব'সে ওই সব পোড়া বিড়ি-সিগারেটের টুকরো থেকেই সে তামাক বের ক'রে পাইপে ভরতো। তারপর তাতে অগ্নি-সংযোগ ক'রে বেশ আরামেই নেশা মেটাতো ধোঁয়ার।

ক্ষিধে পেলে ঠিক কী খেতো তা জানা যেতো না বিশেষ। দিনান্তে তাকে দেখা যেতো কোনো এক খৃষ্টান কবর-খানায়। কোনো একটি বিশেষ কবরের পাশে সে ব'সে থাকতো। ঘুম

পেলেই সে তার একটা হাত আলতোভাবে উক্ত কবরটির বুকে রেখে পাশেই শুয়ে পড়তো এবং রাত কাটাতো ও-ভাবেই।

তার এ-সমস্ত আচরণ লক্ষ্য ক'রেই তাকে সবাই ভাবতো পাগল এবং আমিও তাকে তা'ই ভাবতাম। কিন্তু আবার এমনও দু'একজন আছেন—যাঁরা তাকে পাগল ভাবতেন না। কারণ তাঁরা তার জীবনের ইতিহাস খানিকটা জানতেন। যে-কবরখানায় সে দিনান্তে যেতো এবং রাত কাটাতো, ঘটনাচক্রে একদিন সেই

কবরখানারই দারোয়ান ও মালীর মুখে আমিও তার পূর্ব-কাহিনী কিছুটা জানতে পারি। তাই তার সম্বন্ধে আমারও ধারণা একদিন পাল্টে যায়। অবশ্য সে যে পুরোপুরিই বিভ্রান্ত ছিল—সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে একেবারেই বদ্ধ পাগল যে সে ছিল না—তার প্রমাণ পেয়েছিলাম যথেষ্ট।

আগেই বলেছি লোকটার নাম স্মরেন শিকদার। আজ থেকে

প্রায় বিশ বছর আগে সে কোনো এক জাহাজে খালাসীর কাজ করতো। খালাসীর পদ থেকে সে সারেঙের পদেও উন্নীত হয়েছিল শোনা যায়। কর্মচারী হিসেবে জাহাজের মধ্যেই তাকে থাকতে হতো ব'লে জাহাজ যেবার আমেরিকায় যায়, সেবার সে-ও গিয়েছিল সঙ্গে। কিছুদিন পর জাহাজ আবার ভারতবর্ষে ফিরে আসে যথারীতি। কিন্তু স্থরেন ফেরে না। আমেরিকা দেশটা তার ভালো লাগে। তাই ওখানেই সে থেকে যায়। কারণ স্বদেশে তার আপনজন কেউ নেই। অতএব একা জীবন যেখানে হোক কাটিয়ে দিলেই হলো—এই ভেবে সে সংসার পাতে আমেরিকাতেই এবং আমেরিকারই একটি গরীব মেয়েকে সে বিয়ে করে ভালোবেসে।

কিন্তু আমেরিকায় তার চিরকাল থাকা হলো না। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ও-দেশের নাগরিক অধিকার সে পেলো না বলেই বছর-তিনেক পর আবার তাকে ফিরে আসতে হলো ভারতবর্ষে। অবশ্য সঙ্গে তার আমেরিকান বউটিও এলো। তারা এসে নতুন সংসার পাতলো কলকাতায়। তারপর জীবনের নতুন যাত্রা স্থরু হলো তাদের এখানেই।

স্থরেন সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো তার আমেরিকান বউটিকে। তারই স্থখের জন্য সে কলকাতার সম্ভ্রান্ত পাড়ায় একটি সাজানো বাড়ী ভাড়া নেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ-বাড়ীর ব্যয়ভার বহন করা ও সেই সঙ্গে নিজেদের উচ্চ মান বজায় রাখা তার পক্ষে বেশি দিন সম্ভব হলো না। কারণ জাহাজের কাজ তার নেই। এখানে কোনো নতুন কাজও সে সংগ্রহ করতে পারেনি। স্থতরাং আমেরিকা থেকে যে-পরিমাণ অর্থ সে আনতে পেরেছিল—তা

এভাবে চলতে গিয়ে নিঃশেষ হলো অল্পদিনেই। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তার অবস্থা উঠলো চরমে। নিদারুণ দারিদ্র্যই তাকে টেনে আনলো সম্ভ্রান্ত পাড়ার বাড়ী থেকে বস্তির নোংরা ঘরে।

তার বউটি বিদেশী হলেও, স্বামীপরায়ণা। সে-ও সুরেনকে ভালোবাসতো সমস্ত অন্তর দিয়ে। অতএব সুরেনের সমতলে সে-ও নেমে এলো, হাসিমুখেই গ্রহণ করলো এই চরম দুর্দশাকে। কিছুতেই সে হার মানতে চাইলো না।

কৃতজ্ঞ, অভিভূত সুরেন বউটির আকাশের মতো উদার, অপার দৃষ্টির নিচে দাঁড়িয়ে সাদরেই বরণ ক'রে নিল সামনের অনিশ্চিত দিনগুলিকে। অভাবের এক ঝাঁক তীরে বিদ্ধ হলো তার অভিলাষ, স্বপ্ন তার আর্তনাদ ক'রে উঠলো আহত পাখির মতো, কুটিল হয়ে নেচে উঠলো বাতাস, সামনের পথ হলো জটিল, তবু সে পা বাড়ালো নির্বিঘ্নে। কারণ হার মানতে চায় না সে-ও।

বস্তিতে এসেই অনেক চেষ্টার পর সুরেন কোনো এক কারখানায় একটি শ্রমিকের কাজ পায় এবং তার বউটিও বিভিন্ন জায়গায় সেলাই-এর কাজ শিখিয়ে কিছু উপায় করার চেষ্টা করে। অবশ্য তা-সত্ত্বেও দারিদ্র্য ঘোচে না। দিনের শেষে উভয়ে যা রোজগার ক'রে আনে, তাতে বস্তির ঘরের ভাড়া দিয়ে নিজেদের খাওয়া খরচ চালানো দায় হয়ে পড়ে প্রায়দিনেই। তবু পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে জটিল দিনগুলিকে ঠেলে ঠেলে তারা এগিয়ে যেতে থাকে কোনোমতে।

কিন্তু বস্তির নোংরা আবহাওয়া বা তার পরিবেশ বউটির স্বাস্থ্যের পক্ষে সম্ভবতঃ অনুকূল ছিল না। তাই বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই বউটির সুঠাম-সুন্দর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং তারপর হঠাৎ

একদিন সে আক্রান্ত হয় কঠিন অস্থুখে।

সুরেন প্রথমতঃ তার কারখানা থেকে এবং তারপর একজন কাবলিওয়ালার কাছ থেকে চড়া সুদে ধার নিয়ে বউয়ের চিকিৎসা সুরু করে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। কোনো ডাক্তারই বউয়ের সঠিক অসুখ ধরতে পারে না, বুঝতে পারে না কোন্

পদ্ধতিতে তাঁরা চিকিৎসা চালাবেন। অবশ্য তা সত্ত্বেও চিকিৎসা চলে, কিন্তু ভুল চিকিৎসা। এই ভুল চিকিৎসার ফলে অবস্থার অবনতিই ঘটতে থাকে দিনের পর দিন এবং একদিন আমেরিকার একটি জ্বলন্ত শিখা ভারতবর্ষের কোনো এক বস্তির ঘরে হঠাৎ নিভে যায়। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার নেমে আসে সুরেনের সমস্ত জীবনে।

বউটিকে কবর দেয়া হয় কোনো এক খৃষ্টান কবরখানায়। বউটিকে হারিয়ে সুরেনের দুর্বল মন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ। সে ঘর ছাড়ে। চাকুরী ছাড়ে। তারপর দিনমান ঘুরতে থাকে রাস্তায়-রাস্তায়। রাত্রে এসে নিয়মিত ঠাঁই নিতে থাকে কবরের

পাশে। কথায়-কথায় কবরখানার মালী ও দারোয়ানকে সে জানিয়ে রাখে: সে মরলে তারও কবর হবে বউয়ের কবরের ঠিক পাশেই।

তারপর? তারপর বছরের পর বছর কেটে গেছে। তবু সুরেনের জীবনে কোনো পরিবর্তন ছিল না। লোকচক্ষে প্রকৃত পাগলের মতোই সে পথে পথে দিনমান ঘুরতো এবং সন্ধ্যা ঘনালেই যথারীতি এসে ঠাঁই নিতো কবরের পাশে এবং সেখানে ব'সেই সে হয়তো চিন্তা করতো পরপারের কথা।

পরপার তার ডাক শুনেছে এতদিনে, এতদিনে সে পেয়েছে মৃত্যুর সুশীতল শান্তি। কিন্তু এ-শান্তি এসেছে তার অজান্তে। আগে যদি সে জানতে পারতো, তাহলে কবরখানা থেকে সে হয়তো আজ বাইরে আসতো না এবং ওভাবে প'ড়ে থাকতো না পার্কের পাশের ফুটপাথে—যেখানে পাথরের কর্কশ কাঠিন্যে তার এই অন্তিম শান্তিও আজ নিষ্ঠুর হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ধারণ করেছে একটা বিকৃত রূপ।

খানিকবাদেই পৌরসভার লোক এসে সুরেনের শীতল দেহটাকে নিয়ে যাবে এবং তাঁর অবাঞ্ছিত সংকার হবে অন্যত্র। বউয়ের কবরের পাশে স্থান পাবার তার একান্ত ইচ্ছা কবরখানার মালী ও দারোয়ান হয়তো ভুলে গেছে এতদিনে; কিংবা না ভুললেও তার এই ইচ্ছাটি পূরণ করার ক্ষমতা তাদের নেই। তাই তারা আজ

ভুলেও এদিকে আসবে না। অতএব, ম'রেও স্থরেন আজ একা এবং আজ থেকে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হলো কবরখানার সেই বিশেষ কবরটি।

হাওয়া এসে আছড়ে পড়বে কবরটির বুকে, স্থরেনকে পাবে না। স্থন্দর সূর্য উঠবে প্রতিদিনের ললিত দিগন্তে, অথচ কবরটির বুকে হাত রেখে সেদিকে আর কেউ তাকিয়ে দেখবে না। কেবল মাঝে মাঝে কবরটির বুকে নেমে আসবে একটা উদ্‌ভ্রান্ত ছায়া—যার দিকে তাকিয়ে দু'এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে অনেক দূরের আকাশ।

———